গঙ্গারিডি ও বঙ্গভূমি

প্রভাত কুমার ঘোষ,

এম. এ. বি. এল. পি এইচ. ডি (কলিকাতা)

জে. এস. প্রকাশনী

৩এ, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫
১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৮৮

পরিবেশক ঃ
জ্যোতি প্রকাশনী
এ ১৮, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—৭০০ ০০৭

সুবর্ণরেখা
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

বাঁধাই ঃ
ইন্টেন্ড ট্রেডার্স
২০, কেশব সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অন্য প্রাপ্তিস্থান ঃ কথা ও কাহিনী
এবং বইপাড়ার অন্যান্য দোকান

প্রচ্ছদ ও মানচিত্র ঃ শ্রী প্রভাত কুমার কর্মকার

প্রকাশক ঃ
মীরা ঘোষ
জে. এস. প্রকাশনী
৩এ, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক ঃ
শ্রী শিশির কুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

গ্রন্থ-পরিচয়

পশ্চিমবঙ্গ নামে যে ভূখণ্ডটি অধুনা পরিচিত এবং যার সামগ্রিক পরিচয় বহন করে বঙ্গভূমি, ভৌগোলিক বিচারেই হোক, কিম্বা প্রশাসনিক দিক থেকেই হোক, তার অদৃষ্টে যতো রাজনৈতিক পালাবদল এবং অদলবদল ঘটেছে, ভারতবর্ষের অপর কোন ভূখণ্ডের ভাগ্যে ততোখানি হয় নি। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে সঙ্গতি না রেখেও এই ভূখণ্ডটির নাম-পরিচয়ের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে বার বার পরিবর্তন। প্রাকৃতিক অথবা ভৌগোলিক কারণে আদিতে কোনও বিশেষ নামে চিহ্নিত একটি ভূখণ্ডের আয়তন এবং প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশেও এমনি ধরণের পরিবর্তন ঘটতে দেখা গিয়েছে।

প্রাকৃতিক অথবা ভৌগোলিক কারণে দেশ-পরিচয়ের বিভিন্নতা সম্পর্কে প্রশ্ন কুতূহলপ্রদ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তা নিয়ে অভিযোগ করা চলে না। কিন্তু রাজনৈতিক ভাগ্য-পরিবর্তনের সঙ্গে দেশ-পরিচয়ের আকৃতিগত বিভিন্নতা শুধু কুতূহলপ্রদই নয়। এ সম্পর্কে জবাবদিহির প্রশ্নও প্রাসঙ্গিক। পূর্বতন আমলের কোন একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন অথচ স্বাধীন রাজ্য পরবর্তীকালে নতুন বৃহত্তর একটি রাজ্য অথবা সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হল, অথবা এক যুগের বৃহত্তর রাজ্যের পরিচয় অপর যুগে পর্যবসিত হল ক্ষুদ্রায়তন একটি রাজ্যে অথবা রাজ্যাংশে—এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। সম্প্রতিকালে প্রশাসনিক প্রয়োজনের অজুহাতে অথবা কোন একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক অভিসন্ধি পূরণের জন্য রাজ্য-বিশেষের সীমা ও আয়তনের পরিবর্তন ঘটেছে—এমনি দৃষ্টান্ত বাস্তব সত্য। কিন্তু শাসকশ্রেণী কর্তৃক সম্পাদিত এই পরিবর্তন দীর্ঘকাল ধরে জনমানসে এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে বহুকাল ধরে স্বীকৃতিধন্যও হয় না—এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। রাজনৈতিক অথবা প্রশাসনিক কারণে যে ধরণের পরিবর্তন ঘটে তার ফলে অনেক সময় বিভ্রান্তি দেখা দেয়। 'বঙ্গ' এবং 'গৌড়'—এই দুটি নামের প্রয়োগক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সম্পূর্ণভাবে এড়ানো সম্ভব হয় নি।

এই বিভ্রান্তির মূলে আরও একটি বিষয় উপাদান জুগিয়েছে। নাম-পরিচয় এবং দেশ-পরিচয়ের মধ্যে সব ক'টি ক্ষেত্রে সমতা রক্ষিত হয়েছে—এ দাবি করা চলে না। পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ—এই দুটি ভাগের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু বাংলাদেশ এবং বাংলা—এ দুটির মধ্যে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও আভিধানিক অর্থে স্বাতন্ত্র্য সুপরিস্ফুট নয়।

প্রাচীন যুগের 'বঙ্গভূমি' পরিচয় প্রসঙ্গটি বহু বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁরা বিভিন্ন গ্রন্থ এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধের মাধ্যমে তাঁদের অভিমত সাধারণের কাছে উপস্থাপিতও করেছেন। তা সত্ত্বেও সকল প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে গিয়েছে—এমনি দাবি এখনও অচল। প্রাচীন বঙ্গভূমি এবং 'প্রাচ্য' দেশ পরিচয় প্রসঙ্গে

'গঙ্গারিডির' উল্লেখ অনিবার্য। এ বিষয়ে 'গঙ্গারিডি ও বঙ্গভূমি' গ্রন্থের লেখক ডক্টর প্রভাত কুমার ঘোষ একটি গ্রন্থাকারে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করেছেন। আমি পাণ্ডুলিপিখানি আদ্যন্ত পড়েছি। বহু শ্রম ও অধ্যবসায়ের বিনিময়ে ডক্টর ঘোষ স্ব-মনোনীত এই দুরূহ কর্তব্যটি সম্পাদন করেছেন। এ বিষয়ে একদিকে যাবতীয় তথ্য-প্রমাণ, অপরদিকে এই সব তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিভিন্ন পণ্ডিতজনেরা যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সেইসব সিদ্ধান্ত সব কিছুই গ্রন্থকারের আলোচনার বিষয় বস্তু। বলাবাহুল্য, আপাতঃ গৃহীত অথবা প্রতিপাদ্য প্রতিটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে তিনি একমত নন। বহু প্রামাণ্য সূত্রসহকারে এই মতানৈক্যের কারণ তিনি সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। সুতরাং প্রাচীন বঙ্গভূমি এবং গঙ্গারিডির একটি যথাসম্ভব সামগ্রিক ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক পরিচয় পেতে যারা আগ্রহী তাঁরা ডক্টর ঘোষের বইটি পড়ে নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন। প্রাচীন বঙ্গ-পরিচয় সম্পর্কিত ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বইটি এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। গ্রন্থকারের প্রয়াস সিদ্ধান্ত-সংক্রান্ত সকল বিরোধের অবসান না ঘটালেও বিরোধের পরিধি হ্রাস করবে এবং সংশ্লিষ্ট বহু বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করবে। শুধু বাংলাভাষী পাঠক নন, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অনুশীলনে যাঁরা আগ্রহী, এবং বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা সকলেই গ্রন্থটির প্রকাশনাকে অভিনন্দন জানাবেন—এই আমার বিশ্বাস।

ইনষ্টিটিউট অব হিস্টরিক্যাল ষ্টাডিজ
কলকাতা

নিশীথরঞ্জন রায়

সবিনয় নিবেদন

বাঙ্গালী হিসেবে নিজের দেশ এবং দেশবাসীর সম্বন্ধে নতুন পুরানো সব তথ্যই মনে কৌতূহল এবং আগ্রহের সঞ্চার করে। আমি নিজে ইতিহাসের ছাত্র ছিলাম, কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগও সেই ছাত্রাবস্থা থেকেই। ব্যবসায়িক জগতে দীর্ঘ চাকুরীজীবনের শেষের দিকে একটু অব্যবসায়িক প্রেরণা মনকে অধিকার করতে আরম্ভ করে।

যাই হোক, ১৯৮৫ সালে আমি অবসর গ্রহণ করি এবং তার অল্প আগে সেই বছরেই বাংলা সাহিত্যে পিএইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। শ্রী নরোত্তম হালদার পরিচালিত 'গঙ্গারিডি অনুসন্ধান সমিতি'র কার্য-কলাপের বিষয়ে অবহিত হতে থাকি এবং ১৯৮৬ সালে এই গঙ্গারিডি চিন্তায় যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করি। অবশ্য, আমার পুঁথিগত অনুসন্ধানের কাজ আগেই শুরু হয়েছে।

বলতে বাধা নেই, ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমি অত্যন্ত প্রখ্যাত কয়েকজন প্রথম সারির ইতিহাসবেত্তার গঙ্গারিডি সম্বন্ধে তাঁদের সিদ্ধান্ত এবং তার কারণ সম্বন্ধে সন্দিহান হই। এই সংশয় আরও এই জন্য যে তঁদের সিদ্ধান্তগুলি যথার্থ ইতিহাস-চিন্তার পথ বেয়ে আসে নি। এই সব দিকপাল ঐতিহাসিকেরা, যাঁদের কথা এই গ্রন্থের মধ্যে বার বার উল্লিখিত হয়েছে, এই গঙ্গারিডি ও প্রাসী জাতি এবং দেশ সম্বন্ধে বিদেশী লেখকগণ কর্তৃক বিবৃত প্রাথমিক সূত্রগুলিই অবজ্ঞা অথবা অগ্রাহ্য করে অনায়াসে তাঁদের মনের মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

আমি সামান্য মানুষ, এঁদের সম্বন্ধে কোন অশ্রদ্ধেয় মন্তব্য আমার মনের কোণেও স্থান পায় না। কিন্তু যখন লক্ষ্য করি যে এই সব তদানীন্তন কৃতবিদ্য, প্রতিষ্ঠাবান এবং পাণ্ডিত্যে অদ্বিতীয় গবেষক ও ঐতিহাসিকেরা প্রাচীন ভৌগোলিক, ভূতাত্ত্বিক পরিস্থিতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ব্যতীত যুক্তিশূন্য, অনৈতিহাসিক এবং অবাস্তব অনুমান ও সিদ্ধান্তের আশ্রয় নিয়েছেন, তখন ইহিতাসের ছাত্র হিসেবে মনে দুঃখ ও ক্ষোভের উদয় হয়। কারণ, তাঁরা বাঙ্গালীর পূর্বগরিমার অতি অল্প বিদেশী সাক্ষ্যকেও ইচ্ছাকৃত ভাবে বিকৃত করে ভবিষ্যৎ ছাত্র, গবেষক ও অনুসন্ধিৎসুদের মনে বিভ্রান্তির সঞ্চার করেছেন!

প্রথম থেকেই আমি এই গঙ্গারিডি চিহ্নিতকরণে এবং সত্যান্বেষণে অত্যন্ত সচেতন-ভাবে এবং দৃঢ় পদবিক্ষেপে অগ্রসর হবার চেষ্টা করি। ১৯৮৬ সাল থেকে এই বিষয়ে আমার কয়েকটি নিবন্ধ স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পুঁথিগত অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রসঙ্গে আমি যে সব অতি শ্রদ্ধেয় এবং সর্বজনমান্য পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ, অধ্যাপক প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ অথবা পত্রের দ্বারা যোগাযোগ করি, তাঁদের মধ্যে আছেন ডঃ অতুল সুর, ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডঃ অশোক ভট্টাচার্য ডঃ নরেন্দ্রনাথ

ভট্টাচার্য, ডঃ সনৎকুমার মিত্র, ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীদেবেশ দাশ, শ্রীসুধীরকুমার মিত্র বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় এবং পত্রালাপে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হলেও, এই গ্রন্থে যে সব অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে আমার নিজস্ব। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ, গবেষক এবং বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে অতি পরিচিত চিন্তানায়ক অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায় তাঁর এই প্রবীণ বয়সেও নিজের অতি মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমার পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে এবং একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ পরিচয় লিখে দিয়ে আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। আমি এঁদের সকলকেই আমার গভীর শ্রদ্ধা এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এঁদের কাছে আমার ব্যক্তিগত ঋণের শেষ নেই।

এই অবসরে আমি অকৃত্রিম আন্তরিকতা এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি যে আমি এই কাজে অসামান্য নৈতিক সহায়তা, সহযোগিতা এবং উৎসাহ লাভ করেছি কয়েকজন বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনের কাছে। তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীদিলীপকুমার ঘোষ (এ, ডি, পি, আই, পশ্চিমবঙ্গ সরকার), অধ্যাপক ডঃ প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রী রামশরণ মুখোপাধ্যায়, কবি/সাহিত্যিক শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, ইতিহাসবিদ এবং সাহিত্যানুরাগী শ্রী সত্যশিবপাল দেব মহান্ত (ডবল এম, এ,), বঙ্গীয় থিওজফিক্যাল সোসাইটির কর্ণধার শ্রীবিশ্বনাথ দে সরকার, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাসের ছাত্র হলেও আমি প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলনে এবং ব্যাখ্যায় কোন দিনই মনোযোগ দেবার সুযোগ পাই নি। এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও সাক্ষ্যের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করি নি, যদিও কোন অঞ্চলের প্রাচীনত্ব এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি সত্যের আলোকে স্থাপনের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যসম্বলিত গ্রন্থের আলোচনা, মন্তব্য এবং সিদ্ধান্তের প্রতি নির্দেশ করেছি। আমি মনে করি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় প্রত্নতত্ত্বের যে ভূমিকাই থাকুক, ভূগোল, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি ও দর্শন প্রভৃতির সাক্ষ্য ইতিহাসের লুপ্ত ধারাকে সন্ধান করার পক্ষে কম উপযোগী নয়, বরং অনেক বেশী যোগ্যতাসম্পন্ন। অবশ্য যাঁরা 'পাথুরে' প্রমাণ ছাড়া কিছুই স্বীকার করেন না, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

গঙ্গারিডি এবং প্রাসীকে আমাদের দেশের ইতিহাসের অঙ্গীভূত করার বিষয়ে বিদেশী গ্রীক ও লাতিন লেখকদের বিবরণগুলি নিঃসন্দেহে প্রধান সূত্র। কারণ, দেশীয় সূত্রে কোথায়ও এদের উল্লেখ নেই। এই বৈদেশিক সাক্ষ্যকে দেশের পুরাণ, ইতিহাস, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতির সঙ্গে সমন্বয় করে নিয়ে প্রাচীন ইতিহাসের ধারাটিকে অনুসন্ধান করার প্রচেষ্টার মধ্যে ইতিহাসসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার লক্ষ্য পথেই এগিয়ে চলেছি। হয়তো এখনও গঙ্গারিডি বা গঙ্গে সম্বন্ধে শেষ কথা বলার সময় হয় নি।

একটি কথা এই প্রসঙ্গে না বলে পারছি না। যে সব ঐতিহাসিক, পণ্ডিত এবং গবেষকরা টলেমির ভারত সম্পর্কীয় ভূগোল এবং বিশেষভাবে তাঁর আন্তর্গাঙ্গেয় এবং বাহির্গাঙ্গেয় মানচিত্রের উপর কিছুমাত্রও গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে টলেমির সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ জেনেও, নেহাতই উদ্দেশ্যমূলকভাবেই তা

করেছেন। টলেমি গঙ্গার পাঁচটি সাগর মোহনার কথা বলেছেন, এবং তার মধ্যে শেষের দুটি হলো পূর্ববঙ্গের। অথচ টলেমির মানচিত্রে গঙ্গারিডি দেশের যে ত্রিভুজ প্রদর্শিত হয়েছে, বাহির্গাঙ্গেয় মানচিত্রে, সেই ত্রিভুজের শীর্ষে যে স্থান দুটির নাম পাওয়া যায় তা হলো Aganagora এবং তার নীচে Talarga, যেগুলিকে যথাক্রমে অগ্রদ্বীপ বা কাটোয়া, এবং সম্ভবতঃ ত্রিবেণী বা কাছাকাছি হুগলী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে (Ancient India as described by Ptolemy—J. W. McCrindle.) সুতরাং টলেমির মানচিত্রে যে ত্রিভুজ, তা কোন ক্রমেই বৃহত্তর বঙ্গীয় বদ্বীপের ছায়া ও কায়া কিছুই নয়! আমাদের অনুমানে টলেমির যুগে তখনও এই বদ্বীপের পূর্ণ আকৃতি 'দূর অস্ত' ছিল, এবং মূল গঙ্গানদীও সেই যুগে পূর্ববঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে আদৌ প্রবাহিত হয় নি।

আমার এই প্রয়াস বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপ্রেরণার কথা মনে রেখেও বাঙ্গালী বা বাঙলার ইতিহাস নতুন করে প্রণয়ন করার প্রয়াস অবশ্যই নয়। আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটিকে হয়তো গঙ্গারিডি সম্পর্কীয় অনুসন্ধানগ্রন্থ হিসেবেই গ্রহণ করা যেতে পারে। আশাকরি বাঙালী তথা বৃহত্তর বঙ্গভূমির অধিবাসীরা রাজনৈতিক সীমানা নির্বিশেষে এই পুঁথিগত গবেষণার সামান্য কাজকে ব্যর্থ হতে দেবেন না এবং আমার ত্রুটি বিচ্যুতিকে মার্জনা করবেন। আমি আচার্য স্যর যদুনাথ সরকারের সেই অবিনশ্বর ও অবিস্মরণীয় উক্তিটি স্মরণ করে, বৃহত্তর বাঙালী জাতির অতীত এবং বর্তমান সকল মনীষীদের এবং সর্বসাধারণের উদ্দেশে আমার এই শ্রদ্ধার্ঘ্য উপস্থাপিত করছি :—

"সত্য প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, তাহা ভাবিব না।······সত্য প্রচার করিবার জন্য সমাজে বা বন্ধুবর্গের মধ্যে উপহাস ও গঞ্জনা সহিতে হয়, সহিব, কিন্তু তবুও সত্যকে খুঁজিব, বুঝিব, গ্রহণ করিব।······"

৩এ. মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

বিনীত
গ্রন্থকার

॥ প্রকাশকের কথা ॥

ডঃ প্রভাত কুমার ঘোষের দীর্ঘদিন পরিশ্রমলব্ধ গবেষণামূলক কাজটি (গঙ্গারিডি ও বঙ্গভূমি) এক অনুসন্ধান গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ করতে পেরে আমরা বিশেষ আনন্দ অনুভব করছি। দেশের প্রাচীন ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সংযোজনের ভূমিকা পালন করবে, এই বিশ্বাস আমাদের আছে। বাঙলা ভাষা-ভাষী পাঠক সমাজের কাছে এই গ্রন্থটি আদরণীয় হলে, লেখকের এবং আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে বলে মনে করি। সহৃদয় পাঠকবৃন্দ বানানে ভুল এবং অন্যান্য অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য মার্জনা করলে বাধিত হবো।

প্রেস, প্রচ্ছদ ও মানচিত্র শিল্পী এবং অন্যান্য সহযোগীদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

মীরা ঘোষ

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫ — জে. এস প্রকাশনী

সূচীপত্র

ভ্রম সংশোধন

গঙ্গারিডি ও প্রাসী—নির্দেশিকা

৩১। ২৪ পৃঃ "রাঢ়দেশ উত্তরে রাজমহল............ পূর্বে ভাগীরথী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।"

৩২। মুদ্রিত ৩১শের স্থানে ৩২ পড়তে হবে।

৪৯। এইটি সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করতে হবে।

উৎসর্গ

পিতৃপ্রতিম, হিতৈষী, উৎসাহী, বিদগ্ধ পুরুষ-

পরম শ্রদ্ধেয়

শ্রী ধনেশচন্দ্র মিত্রের

করকমলে।

জে. এস. প্রকাশনীর অন্য গ্রন্থ :—

কর্ণ—ডঃ প্রভাত কুমার ঘোষ

বিভীষণ সত্যদর্শী—ডঃ প্রভাত কুমার ঘোষ

রাজ-প্রেয়সী রাজবধূ—শ্যামলী বসু

৮৫০
ইমোদাস পর্বত
৩০°
মিথিলা
পাটলিপুত্র
প্রয়াগ
চম্পা
বর্দ্ধমান
তাম্রলিপ্ত
কামরূপ
ব্রহ্মপুত্র নদ
২০°
প্রাচীন
প্রাচ্যদেশ
৮৫°

প্রাচীন
অঙ্গ-পুণ্ড্র-গৌড়-রাঢ়-বঙ্গ
মুদগগিরি
অঙ্গ
চম্পা
কোটীবর্ষ
পাণ্ডুনগর
লক্ষ্মণাবতী
গৌড়
পুণ্ড্রবর্দ্ধন
কর্ণসুবর্ণ
(রাঙ্গামাটি)
উত্তর রাঢ়
দক্ষিণ রাঢ়
নবদ্বীপ
বর্দ্ধমান
সুহ্মনিয়া
অপরমন্দার
সপ্তগ্রাম
তাম্রলিপ্ত
বঙ্গ
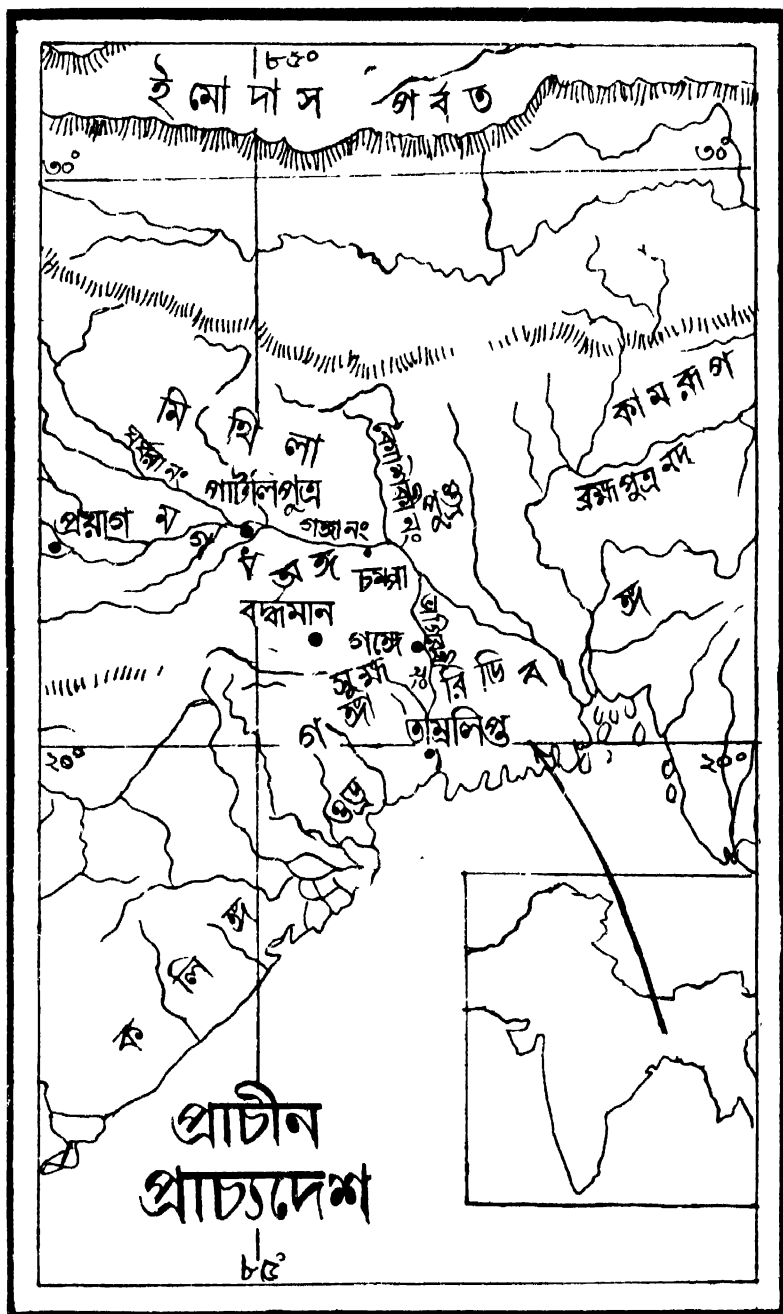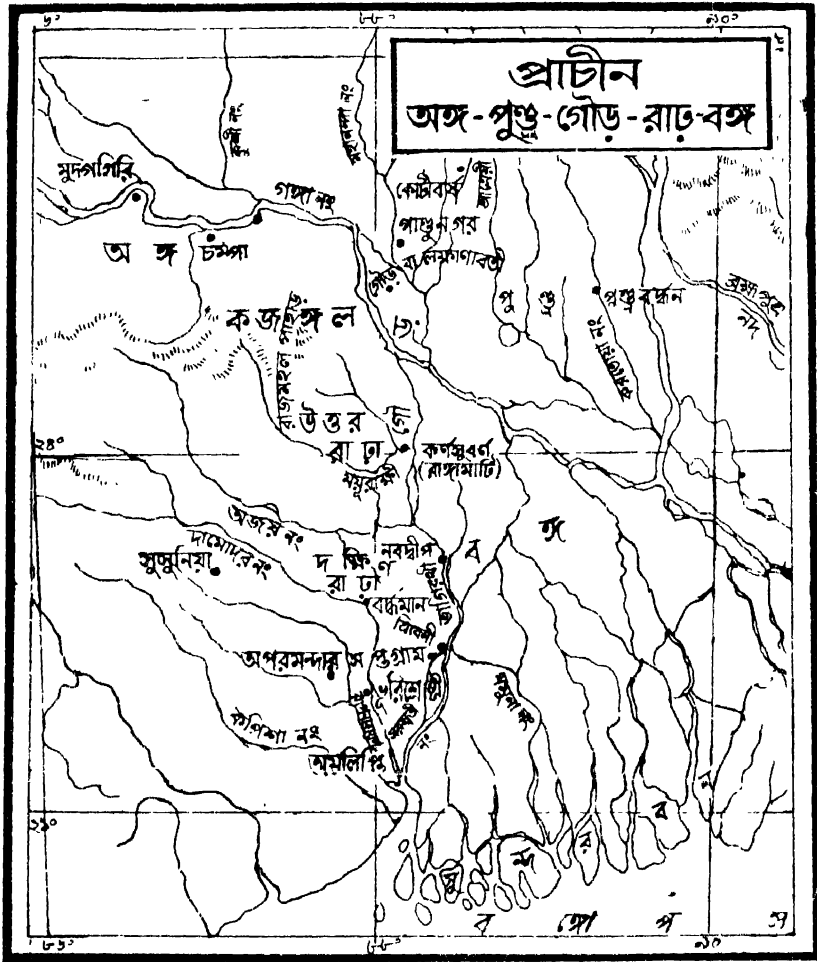
অবতরণিকা

বর্তমান ভারতের এক অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। ভাগীরথী-গঙ্গার পবিত্র সলিলে বিধৌত এই পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে গঙ্গার পশ্চিম এবং পূর্ব, দুই কূলেরই অঞ্চল আছে। সাগরমুখী ভাগীরথী-গঙ্গা (যাকে আধুনিক যুগে হুগলী বলা হয়েছে) দক্ষিণে সুন্দরবনের সীমায় এসে কতগুলি ছোট ছোট শাখায় বিভক্ত হয়ে এখনকার সাগর সঙ্গমের উপরে একটি ক্ষুদ্র বদ্বীপের সৃষ্টি করেছে। এটিও পশ্চিমবঙ্গেরই অন্তর্গত।

প্রাচীন যুগ থেকে বিদেশী পর্যটকগণ গঙ্গার মূল নদী ও শাখা, প্রশাখাকে গঙ্গা বলেই মনে করেছিলেন। তখন ছিল গঙ্গার বিশাল রূপ ও তুলনাহীন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ বলেন যে এখনকার পদ্মা সেই যুগে গঙ্গারই একটি অপ্রধান শাখা ছিল এবং খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর আগে পদ্মা নদীর (পদ্মাবতী) স্বতন্ত্র নামও হয় নি। গঙ্গার এবং পদ্মার অববাহিকায় বৃহত্তর বদ্বীপ (উপবঙ্গসহ) সম্পূর্ণরূপে গঠিত হয়েছিল খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীরও পরে (হিউয়েন-সাঙের সাক্ষ্য অনুযায়ী)।

পশ্চিম অংশের মালভূমি-সম্প্রসারিত প্রস্তরময় ভূভাগ এবং উত্তরাংশের পার্বত্যভূমি ব্যতীত বঙ্গদেশ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলিমাটিতে গঠিত। যেমনভাবে ভূভাগ আত্মপ্রকাশ করেছে, সমুদ্রও সেইভাবে ক্রমশঃ দক্ষিণে ও পূর্বে অপসৃত হয়েছে। সুতরাং গঙ্গা নদীর প্রবাহ এখন পশ্চিবঙ্গেও আছে, পূর্ববঙ্গেও (বাংলাদেশে) আছে।

যাঁরা এই মত পোষণ করেন যে পদ্মাই গঙ্গার প্রধানতম প্রবাহ এবং ভাগীরথী শাখা মাত্র,—তাঁদের সিদ্ধান্ত সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত নয়। বাস্তব অবস্থাটি তাঁদের ধারণার ঠিক বিপরীত।

প্রথমতঃ, এই মর্মে (অর্থাৎ, পদ্মা-প্রবাহ ভাগীরথী-প্রবাহ অপেক্ষা প্রাচীনতর) কোন ভূতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক অথবা লিপিগত (শিলালিপি, মুদ্রালিপি, তাম্রলিপি) সাক্ষ্য নেই। দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীর জলভাগ সম্বন্ধীয় গবেষণার দ্বারা এই সত্যই প্রতীয়মান হয় যে গঙ্গার ভাগীরথী প্রবাহই প্রথম সৃষ্ট হয়।[১]

ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রমুখ কোন কোন পণ্ডিত গঙ্গার ভাগীরথী মোহনাকে দু'হাজার বছর আগেই পলির দ্বারা রুদ্ধ এবং পদ্মাকে সেই সময় থেকেই গঙ্গার প্রধান পথ বলে গ্রহণ করেছেন। টলেমির গঙ্গানদীর পাঁচটি সাগরমুখের বর্ণনার ভিত্তিতে ডঃ ভট্টশালী এমনও দাবী করেছেন যে গাঙ্গেয় বদ্বীপ সেই দু'হাজার বছর আগেও সম্পূর্ণভাবে গঠিত হয়েছিল (N. K. Bhattasali—'Antiquity of the Lower Ganges and its courses'-Science and Culture, Nov. 1941)

পূর্বে কথিত দৃঢ় ঘোষণাটি যে নিতান্তই যুক্তিহীন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পদ্মা নামক শাখাটি ষোড়শ শতাব্দীর আগে যে গঙ্গার প্রধান জলধারায় পরিণত হয় নি, সে কথা বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভৌগোলিক এবং ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ সহ সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রথমতঃ, বাংলার মানচিত্রটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে বদ্বীপটি পশ্চিমপ্রান্তে অর্থাৎ হুগলী মোহনার প্রান্তে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রলম্বিত হয়েছে। মেঘনা মোহনার প্রান্তটি তিব্বতের সাম্পো নদীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সময় থেকে গঙ্গার জলবন্যা অপেক্ষা ব্রহ্মপুত্রের অধিকতর প্রবল জলবন্যা ধারণ করা সত্ত্বেও, পূর্বপ্রান্তে গঠন কম হওয়ায় সুস্পষ্টভাবে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে গঙ্গার জলধারা, যা প্রধানতঃ এই বদ্বীপটি সৃষ্টি করেছে, তা অনেক বেশী কাল ধরে বর্তমান হুগলী মোহনা দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে। অর্থাৎ, ভাগীরথীই গঙ্গার অংশ হিসেবে পদ্মা অপেক্ষা অনেক প্রাচীন।

দ্বিতীয়তঃ, ঐতিহাসিকভাবেও এই সত্য প্রমাণিত হয় যে ভাগীরথীই বাঙলায় প্রাচীন গঙ্গাপ্রবাহ। ধর্মপালের (খৃঃ ৭৮০-৮২০) খালিমপুর তাম্রশাসন অনুযায়ী, রাজমহলের উপরেও গঙ্গা, ভাগীরথী নামে অভিহিত হতো এবং এর থেকে প্রমাণ হয় যে ভাগীরথীই গঙ্গার প্রধান প্রবাহপথ ছিল, পদ্মা নয়। পদ্মার অস্তিত্ব প্রাচীন কালে ছিল কিনা সন্দেহ, থাকলেও গঙ্গার সঙ্গে সেই কালে পদ্মার সংযোগ ছিলই না। তা ছাড়া, গৌড়নগরী (যা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত বাংলার রাজধানী ছিল) গঙ্গার তীরে অবস্থিত ছিল। পদ্মা সেই কালে গঙ্গার শাখা হিসেবে বিদ্যমান থাকলে, পদ্মার দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে মূল গঙ্গাধারার উপরের এবং নীচের দুটি বাহুই ভাগীরথী নাম ধারণ করতে পারতো না, এবং এই দুটি বাহুর ঢাল এমন কখনই হতো না যে এদের সঙ্গে পদ্মা এসে মিশলেও, এই দুই বাহু সংযুক্ত হয়ে নদীর একই গতিপথে প্রবাহিত হতো।

গৌড়নগরী যতদিন পর্যন্ত না ভাগীরথীর গতিপথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত, ততদিন পদ্মানদী একটি প্রধান নদী আদৌ ছিল না। মেজর হার্স্টের (নদীয়ার নদী—১৯১৫) প্রতিবেদন অনুসারে ১৫১৫ খৃঃ এক দারুণ ভূমিকম্পের ফলে গঙ্গা গৌড়ের পাশের গতিপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে দক্ষিণ দিকে অপসৃত হয়, এবং মালদার প্রাচীন পাললিক ভূভাগ এবং ছোটনাগপুরের মধ্যে প্রবল ভূমি আন্দোলনের ফলে গঙ্গার গতিপথের এই বিরাট পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ, ভাগীরথীর উপরের বাহু থেকে জলরাশি ভাগীরথীর নীচের বাহুতে আগের মতো প্রবাহিত না হয়ে পদ্মার খাতে বিক্ষিপ্ত হতে থাকে। সুতরাং সন্দেহের কোন অবকাশই নেই যে পদ্মা ভাগীরথী অপেক্ষা আধুনিক। (Rivers of Bengal Delta—S. C. Mazumdar).

অতএব ভাগীরথীই (দক্ষিণমুখী) গঙ্গানদীর প্রাচীনতম ও প্রধানতম প্রবাহ এবং পদ্মা শুধু শাখা। পদ্মা গঙ্গার প্রধান প্রবাহ হয়েছে খুব বেশী হলেও চার/পাঁচ শত বছর। কিন্তু আমরা যে কালের আলোচনা করবো, সেই কাল দুই থেকে

আড়াই হাজার বছর পুরানো। সেই কালে পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ অনেকটা সুগঠিত, এবং মধ্য ও পূর্ববঙ্গ, বিশেষভাবে যে অংশ পরে সমতট হিসেবে পরিচিত হয়েছিল, তখন অনেকটাই অগঠিত। সুতরাং সেই সুপ্রাচীন যুগে সাগর সঙ্গম পর্যন্ত নিম্ন-গাঙ্গেয় উপত্যকা বলতে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অবস্থানই সমধিক প্রাসঙ্গিক।

তাই, (অর্ধ-প্রস্তরময়, অর্ধ-পলিমাটি সমৃদ্ধ রাঢ়দেশ এবং গৌড়দেশ, দক্ষিণ পুণ্ড্র এবং সাগর বেলার তাম্রলিপ্ত সমন্বিত পশ্চিমবঙ্গই প্রকৃতপক্ষে গঙ্গা-হৃদয় বা গঙ্গা-হৃদ।) পদ্মা গঙ্গা নদী থেকেই উদ্ভূত, কিন্তু সেই প্রাচীন যুগে আকারে ও প্রকারে পদ্মা নিষ্প্রভ। সেই কারণে, সেই যুগে পদ্মা-সমৃদ্ধ নবগঠিত অঞ্চলকে গঙ্গা-হৃদয় বা গঙ্গা-হৃদ অভিহিত করা যায় না। গঙ্গা-হৃদয় / গঙ্গা-হৃদ শব্দের মধ্য দিয়ে ভাগীরথীকেই গঙ্গার মূল ও আদিযুগীয় প্রবাহ বলে ধরা হয়েছে। পদ্মা ভাগীরথীর মতো পবিত্র ও পুণ্যতোয়া বলেও বিবেচিত হয় না। যখন গঙ্গারিডি কথাটির প্রথম প্রচলন হয়েছিল, তখন পদ্মানদীর হয়তো কোন অস্তিত্বই ছিল না, অথবা থাকলেও পদ্মা ছিল ক্ষীণ-স্রোতা (বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়)। সেই ভূভাগ যা পরে উপবঙ্গসহ বৃহত্তর বদ্বীপের আকার পেয়েছে, তা তখন অধিকাংশই সমুদ্রের অতলে।

বঙ্গভূমি গঠিত হবার পরে গঙ্গা দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে। এই তথ্য আমরা পাই "ভূতাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিম বাংলা" (সংকর্ষণ রায়) গ্রন্থে। তাই, যে দেশ / জাতিকে বিদেশী লেখকদের বর্ণনায় খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে গঙ্গারিডি বলে জানা গেছে, তাদের অভ্যুত্থান, সমৃদ্ধি, সম্প্রসারণ, পতন প্রভৃতির ইতিবৃত্ত আমরা মূলতঃ বর্তমান পশ্চিম-বঙ্গের পটভূমিতেই বিচার করবো। এই পটভূমি নির্ধারণের আরও একটা কারণ এই যে পশ্চিমবঙ্গ গঙ্গা নদীর উভয় তীরেই প্রসারিত।

প্রাচীনকালে বঙ্গ বলতে বোঝাতো শুধু মধ্য-পূর্ববঙ্গ। পরে সমগ্র বাংলাই বঙ্গদেশ। সেই হিসেবে, পশ্চিমবঙ্গ বলতে উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত সমগ্র বাংলারই পশ্চিম ভাগ। গৌড়-বঙ্গের গৌড় বলতেই বোধহয় এখনকার পশ্চিমবঙ্গের কাছাকাছি ভৌগোলিক আকৃতিটা কল্পনা করা যায়। এই সব কথা বলার এই অর্থ নয় যে প্রাচীনকালে বঙ্গ বলতে যে ভূভাগ বোঝাতো, তার কোন অংশই গঙ্গারিডির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু অনেক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যে মনে করেছিলেন যে গঙ্গারিডি গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত, তা একেবারেই তথ্যনির্ভর নয়, ইতিহাসসম্মতও নয়।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের কালে (৩২৬ খৃঃপূর্বাব্দ) বঙ্গদেশের অর্থাৎ সমগ্র বঙ্গভূমির তিনটি প্রাচীন ভূভাগ তিনটি স্বতন্ত্র নামে পরিচিত ছিল। সেই নামগুলি যথাক্রমে বঙ্গ (মধ্য-পূর্ব বঙ্গ) পুণ্ড্র (উত্তর বঙ্গ), তাম্রলিপ্ত ও সুহ্ম অথবা রাঢ় (পশ্চিম বঙ্গ)। উত্তরপশ্চিম ভারতের আর্যেরা খুব ঘনিষ্ঠভাবে না হলেও এই নামগুলি যথা বঙ্গ এবং পুণ্ড্র প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত ছিল। কারণ, এই নামগুলি মহাভারতের যুগ অথবা তার আগে থেকেই বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রতি নির্দিষ্ট হয়েছিল। সুতরাং সেই যুগে উত্তরপশ্চিম ভারতের আর্যেরা গ্রীকদের

কাছে গঙ্গাহৃদ (সংস্কৃত) এবং গঙ্গারিদ (প্রাকৃত) বলে যে দেশ / জাতির পরিচয় দিয়েছিল, তার দ্বারা বঙ্গ ও পুণ্ড্রকে না বুঝিয়ে তারা, হয়তো, সেই সময়ে অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত রাঢ়দেশসহ গঙ্গাহৃদি পশ্চিমবঙ্গকেই বুঝিয়েছিল, এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয়। গঙ্গারিডি শব্দটি গঙ্গার, গঙ্গাহৃদ অথবা গঙ্গারিদ যে নাম থেকেই গ্রীকেরা বিকৃত করে থাকুন, মুখ্যতঃ এই নামের দ্বারা নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায়[২] ভাগীরথী নদী কেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গকেই বুঝিয়েছে। কিন্তু গঙ্গাহৃদ অথবা গঙ্গারিদ কোন শব্দই আমাদের দেশীয় ধর্মশাস্ত্র অথবা সাহিত্যে নেই, যদিও কেউ কেউ অনুমান করেছিলেন যে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের কাছে নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকার শেষপ্রান্তের লোকেদের এই নামেই পরিচয় দেওয়া হয়েছিল।

প্রাসী (প্রাসাই) এবং গঙ্গারিডি (গঙ্গারিডেই), এই দুটি নামই দেশীয় সূত্রে পাওয়া নাম নয়। নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় সাগর মোহনা পর্যন্ত ভুভাগ এই দুই জাতির নিবাসভূমি ছিল এ'কথা আমরা গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সমসাময়িক এবং পরবর্তী যুগের গ্রীক ও লাতিন লেখকদের বিবরণ থেকে জানতে পারি। বৈদেশিক গ্রন্থকারদের রচনাগুলি আলেকজাণ্ডারের পরবর্তী এবং অন্যতম গ্রীক শাসক সেলুকাস নিকোটর কর্তৃক চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের দরবারে প্রেরিত গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণগুলির উপর নির্ভরশীল। মেগাস্থিনিস প্রাসীর (প্রাসাই) রাজা চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রে বেশ কয়েক বছর ছিলেন এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতাগুলি গ্রীক ভাষায় রচিত তাঁর **'Indika'** গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' নামক মূল গ্রন্থটি অখণ্ডভাবে উত্তরকালের হস্তগত হয় নি। কিন্তু এই মৌলিক গ্রন্থটি নষ্ট হয়ে গেলেও, ডিওডোরাস, ষ্ট্রাবো, কুইণ্টাস কার্টিয়াস, প্লুটার্ক, প্লিনী প্রভৃতি গ্রীক ও রোমান পণ্ডিতদের লেখনীর মাধ্যমে খণ্ডিতভাবে এবং বিক্ষিপ্তভাবে আমাদের গোচরীভূত হয়েছে। জার্মান পণ্ডিত সোয়ানবেক বিচ্ছিন্ন বিবরণগুলি সংগ্রহ করেছিলেন এবং পাটনা গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যক্ষ জে, ডবলিউ, ম্যাকক্রিণ্ডল এগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন।

বিদেশী পণ্ডিতদের বর্ণনা অনুসারে প্রাসী ও গঙ্গারিডি—এই দুটি নামই বৃহত্তর রাষ্ট্রবাচক অর্থে এবং জাতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাসী অর্থাৎ প্রাচ্যদেশ বলতে আর্যশাস্ত্রে ও সাহিত্যে আর্যাবর্তের গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম (প্রয়াগ) থেকে গঙ্গানদীর পূর্বসাগরের সঙ্গম পর্যন্ত সমগ্র ভুভাগকেই বোঝাতো। এর মধ্যে গঙ্গারিডিরা ছিল প্রাসীর পূর্বদিকে অবস্থিত এবং সাগর মোহনার নিকটবর্তী পর্যন্ত সমস্ত ভুভাগের অধিবাসী। সাগর তখন ছিল অনেক উত্তরে এবং বঙ্গভূমির পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের এখনকার অনেকটা অংশই ছিল জলমগ্ন। যাই হোক, সাধারণভাবে বলতে গেলে বিদেশী লেখকেরা প্রাসী বলতে বৃহত্তর মগধ অর্থাৎ বিহারের (পাটলিপুত্র যার রাজধানী) এবং গঙ্গারিডি বলতে প্রধানতঃ পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গের অধিবাসীদের নির্দেশ করেছিলেন।

বাঙ্গালী হিসেবে আমরা বিশেষভাবে গঙ্গারিডিদের সনাক্তকরণে আগ্রহী, কারণ

গঙ্গারিডি এবং বাঙ্গালী / বঙ্গভূমি অভিন্ন! ভারতবর্ষের প্রাচীন কাহিনী ও নিজস্ব ইতিহাস এই বিষয়ে নির্বাক। আর্য ঋষিগণ রচিত বৈদিক শাস্ত্রে, ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থসমূহে এবং পরবর্তী যুগের পুরাণগুলিতে আলেকজাণ্ডারের হৃদয়ে ত্রাস উৎপাদনকারী এবং গ্রীকদের বর্ণিত গঙ্গারিডি এবং প্রাসী রাজ্য তথা জাতির কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু বৈদেশিকসূত্রে আমরা জানতে পারি যে গঙ্গারিডি খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল।

বলাই বাহুল্য, গঙ্গারিডি এবং প্রাসী উপাদানগতভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের অঙ্গীভূত হয়েছে। ভারততত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা মনে করেন যে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় থেকেই আমাদের দেশের বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস রচিত হয়েছে। যে সমস্ত উপাদান-সম্ভারে সমৃদ্ধ হলে কোন দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতির ইতিহাস রচনা করা যায়, এই সন্ধিক্ষণ থেকেই সে সব উপাদান মোটামুটি পাওয়া গেছে। অবশ্য আমাদের আলোচ্য বিষয়টির প্রত্যক্ষ উৎপত্তিস্থল হচ্ছে কেবল মাত্র বিদেশী লেখকদের বিবরণ।

গঙ্গারিডি ও প্রাসী দুটি শব্দই ওতঃপ্রোতভাবে সংযুক্ত। বিদেশী (গ্রীক ও লাতিন) বর্ণনা অনুযায়ী গঙ্গা উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে এবং এই নদীর শেষভাগ গঙ্গারিডি দেশের মধ্য দিয়ে গিয়ে সমুদ্রে লীন হয়েছে।[৩] এই বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের বিদেশীদের বক্তব্যের মূল ও প্রাসঙ্গিক তাৎপর্য ও সূত্র বিশ্লেষণ করতে হবে। একটি নিরপেক্ষ এবং ইতিহাসগ্রাহ্য বিশ্লেষণ এই সত্যই প্রতিপন্ন করবে যে গ্রীক ও লাতিন লেখকেরা প্রধানতঃ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গভিত্তিক এক বৃহত্তর দেশকেই গঙ্গারিডি আখ্যা প্রদান করেছিলেন। কারণ,

(ক) উৎসমুখ থেকেই উত্তর থেকে দক্ষিণে গঙ্গানদী প্রবাহিত ছিল না অবশ্যই। কিন্তু উত্তর থেকে দক্ষিণে গঙ্গা পশ্চিম বঙ্গেই প্রবাহিত হয়েছে—দক্ষিণ পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ় (তাম্রলিপ্তসহ) প্রভৃতি সকল অঞ্চলই গঙ্গা-বিধৌত। সম্ভবতঃ সেই যুগের বিদেশী আগন্তুকেরা এবং পরবর্তী লেখকেরা মনে করতেন যে গঙ্গানদী তার উৎপত্তি-স্থল থেকেই উত্তর থেকে দক্ষিণে বইছে।

(খ) সেই যুগে ভাগীরথীই (সরস্বতী সহ) গঙ্গার একমাত্র প্রবল প্রবাহ ছিল। পদ্মানদীর উৎপত্তিই প্রায় তখন হয় নি। যাকে আমরা উপবঙ্গ বলি তার বেশী ভাগই তখন বঙ্গোপসাগরের আওতায় ছিল।

(গ) (গঙ্গা) ভাগীরথীর শেষভাগ পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়েই সাগরে লীন হয়েছে। তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী, পাণ্ডুয়া, বর্ধমান, পূর্বস্থলী, গৌড় প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়দেশেই অবস্থিত। টলেমি এবং 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থকার কর্তৃক বর্ণিত 'গঙ্গে' বন্দরও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গেই ছিল।

বৈদেশিক বিবরণের সাহায্য গ্রহণ ছাড়াও, গঙ্গারিডিদের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি নির্ধারণে আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। প্রত্নতত্ত্ব বিলুপ্ত কাহিনীর ক্ষয়িষ্ণু প্রবাহ সঞ্জীবিত করতে পারে,

ইতিহাসের রচনাকে সম্ভব ও সমৃদ্ধ করতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের ধারাকে এককভাবে সমন্বিত করতে পারে না। সেই কারণে, গঙ্গারিডির অনুসন্ধান-প্রচেষ্টার মধ্যে ঐতিহাসিক সচেতনতা, নিয়মনিষ্ঠা এবং সত্যান্বেষণের একাগ্রতা ও সততা একান্তভাবে প্রয়োজন। দেশের ইতিহাসই নয়, ভূগোল, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি-এ সবের মধ্যেই গঙ্গারিডির চিহ্নিতকরণের উত্তর নিহিত আছে। গঙ্গানদীর গতিপথের অনুসরণ এবং নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকার সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণও আমাদের বিবেচনার অন্তর্গত।

গঙ্গারিডিকে বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সম্মুখে উপস্থাপিত করতে হবে, তার যথার্থ এবং যথাযোগ্য পরিচয়ে। গঙ্গারিডি যে তদানীন্তন বাঙ্গালীদেরই অভিধা, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রাসী যে তদানীন্তন মাগধী অথবা বিহারীরা, সে সম্বন্ধেও সংশয় নেই। কিন্তু গঙ্গারিডি সম্বন্ধেই আমাদের কৌতূহল সমধিক, কারণ বহু শতাব্দীর ব্যবধান হলেও, তারাই আমাদের পূর্বপুরুষ। কিন্তু ঠিক কোথায় ছিল তাদের বাস, কি তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা ছিল সেই যুগে? তাদের উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা, বাণিজ্যিক সম্পদ ও সামরিক শক্তির দীর্ঘদিনব্যাপী স্থায়িত্বের উৎসই বা কি? তাদের সভ্যতা সংস্কৃতি এবং কৃষ্টিই বা কি? কেন আর্যশাস্ত্রে এবং সাহিত্যে তাদের নামগন্ধও নেই!

এই সব প্রশ্নের সমাধানে, আত্মবিশ্বাসী ও অপক্ষপাত মানসিকতায় এবং ঐতিহাসিকের আদর্শবান এবং অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায় ইতিহাসের অন্ধকারময় গলিপথে অনুসন্ধানে ব্রতী হতে হবে। কোন বিষয়ের তথ্য আহরণে সেই বিষয়ের উৎসস্থল থেকে পাওয়া ক্ষুদ্রতম সূত্রগুলির উপর নির্ভর করতে হবে। কোনটিকেই উপেক্ষা করা চলবে না, চলবে না কোনটিকে ভুলে যাওয়া অথবা অর্বাচীন বলে অগ্রাহ্য করা। পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে করতেই বিশ্লেষণের পথে ঐতিহাসিককে অগ্রসর হতে হবে, পুরানো পুঁথিপত্রের ধূলি সরাতে সরাতে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন দুঃখ করে, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস নেই, সুতরাং ইতিহাস রচনা করা আমার কাজ, তোমার কাজ, সকলের কাজ।' তিনি গঙ্গারিডি সম্বন্ধেও তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্য উত্তরসাধকদের জানিয়ে গেছেন। এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্রই আধুনিক যুগে গঙ্গারিডি চিন্তার পথিকৃৎ। গঙ্গারাঢ়ী থেকে গঙ্গারিডি কথাটি গ্রীকদের দ্বারা প্রচলিত হয়েছিল—বঙ্কিমচন্দ্র সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। খৃষ্টীয় ১ম/২য় শতাব্দীতে 'পেরিপ্লাস অফ দি এরিথ্রিয়ান সি'র নাবিক গ্রন্থকার এবং টলেমি গঙ্গার মোহনার কাছে যে বন্দর রাজধানী 'গঙ্গে'র উল্লেখ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই গঙ্গেকে সপ্তগ্রাম বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক ছিলেন না। ঐতিহাসিকের দায়িত্ব আরও গভীর। অনেক বিজ্ঞানসম্মতভাবে এবং সুশৃঙ্খলভাবে তাকে অগ্রসর হতে হবে। সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এই কথা বলার অর্থ এই নয় যে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুমান নির্ভুল নয়।

নির্দেশিকা

১। Historical Geography of Ancient and Medieval Bengal —Dr. Amitabha Bhattacharya

২। Lower Ganges Plain—In real sense it includes the whole of West Bengal and the Kishenganj tehsil of Purnea District of Bihar. The region extends from the foot of the Darjeeling Himalaya in the north to the Bay of Bengal in the south. In the west it is delimited by the edge of the Chotenagpur plateau and in the east by the borders of East Pakistan and Assam. The Ganges Civilisation Introduction—Dr. T. N. Roy.

৩। …"Now this river,……flows from north to south forming the eastern boundary of the Gangaridai……" (Diodorous) Ancient India as described by Megasthenes and Arrian, (Revised Second Edition) P. 32.

"‥ Others assert that it issues forth …… ……… in the final part of its course, which is through the Country of the Gangarides. ……" (Pliny) Classical Accounts of India (Reprint 1981) P. 341.—Dr. R. C. Majumdar

গঙ্গারিডি

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সমসাময়িক গ্রীক লেখকেরা, যাঁদের মধ্যে অনেকেই এদেশে এসেছিলেন সেই সময়ে, এবং পরবর্তীকালে মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের কাছে প্রেরিত গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসের ভারত সম্বন্ধে বিবরণ—আমাদের দেশ সম্বন্ধে আগ্রহশীল গ্রীক ও লাতিন পণ্ডিতদের লেখনী ধারণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিদেশী লেখকদের এই বিবরণগুলি থেকে এই কথাই মনে হয় যে তাঁরা গঙ্গারিডই, অথবা গন্দারিডই অথবা গঙ্গারিডি বলে যাদের বর্ণনা করেছেন, তারা সকলেই প্রায় অভিন্ন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের অভিমত অনুযায়ী—'গন্দারিদৈ নিঃসন্দেহে গান্ধার জাতি। সুতরাং বিদেশী লেখকগণ পাঞ্জাববাসী গান্ধারদের সঙ্গে দক্ষিণ বাংলার জাতি বিশেষকে গুলিয়ে ফেলেছেন।' ("গঙ্গারিডি—ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ" গ্রন্থে সংযোজিত প্রবন্ধ দ্রঃ)। ডঃ সরকার যা বলেছেন, সেই সম্পর্কে বলা যায় যে 'গন্দারিদৈ' অভিধাটি শুধু নামের ভ্রান্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে যাঁরা এই নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁরা প্রকৃত পক্ষে গঙ্গারিডাই অথবা গন্দারিদৈ বলতে নিম্ন গাঙ্গেয় সমতলভূমি / সাগরকূলের অধিবাসীদেরই নির্দেশ করেছেন। কারণ, যে প্রসঙ্গে করেছেন, সেখানে গান্ধারদের কথা বলার কোন অবকাশ নেই। একথা কেউই সত্য বলে স্বীকার করেন না যে, আলেকজাণ্ডার পঞ্চনদবাসী গান্ধারদের ভয়ে তাঁর সৈন্য নিয়ে বিপাশা নদীর পূর্বে আর অগ্রসর হন নি। সুতরাং বিদেশী লেখকেরা গুলিয়ে ফেলেন নি, অনেক দেশী লেখকই নিজেদের ভ্রান্ত ধারণাকে লোকের মনে সঞ্চারিত করার উদ্দেশ্যে গোলমাল করেছেন!

অনেক ভারততত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক বলেছেন যে গঙ্গারিডই জাতি দক্ষিণবঙ্গে বাস করতো। তারা যে নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় বসবাসকারী বাঙ্গালী একথা সকলেই প্রায় বলেছেন। কিন্তু গোলমাল হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের অধিবাসী বলাতে।

নগেন্দ্রনাথ বসু ('বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', ব্রাহ্মণ খণ্ড) এই মত প্রকাশ করেছেন যে 'গঙ্গারিডি রাজ্য গঠিত হয়েছিল গঙ্গাতীরের একটি প্রাচীন দুর্ধর্ষ জনগোষ্ঠী এবং তাদের নগর 'গঙ্গা'কে কেন্দ্র করে, তার পরে তাদের প্রভাব ক্রমশঃ সমস্ত উপবঙ্গে বিস্তার লাভ করেছিল।'

গঙ্গা নগরের অস্তিত্বের কথা মেগাস্থিনিসের বিবরণে নেই। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ বসুর উপর্যুক্ত বক্তব্যটি আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের প্রায় পাঁচশ বছর পরে ভৌগোলিক টলেমির গঙ্গার মোহনাগুলিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী বা জাতির গঙ্গারিডি বলে বর্ণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে এবং শুধুমাত্র দক্ষিণবঙ্গের লোকেরাই যে গঙ্গারিডি বলে নির্দিষ্ট হয়েছে, সে যুক্তিও সমর্থন করে না।

প্রাক মৌর্য ও মৌর্য যুগে এবং টলেমির লেখার সময়ে (Outline of Geography) অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে শুধুমাত্র দক্ষিণবঙ্গই গঙ্গারিডি বলে উল্লিখিত হয়েছিল বলে তর্ক করলে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। বিদেশী লেখকদের বিবরণের এবং টলেমির ভারত সংক্রান্ত মানচিত্র অনুযায়ী বঙ্গভূমির দক্ষিণে ও পূর্বে সমুদ্রের অবস্থিতি সেই খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এবং তার ৫।৬ শত বছর পরে কোথায় ছিল এবং গঙ্গা-ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী বদ্বীপ সেই সময় কতদূর গঠিত হয়েছিল, এইসব বিষয়ে পরিষ্কারভাবে অবহিত হওয়া আবশ্যক।

ডঃ নীহার রঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব) গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে গঙ্গারিডিই নামটি গঙ্গারাষ্ট্র কথা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অবশ্য, গঙ্গারাষ্ট্র বলে কোন রাজ্যের/রাষ্ট্রের অস্তিত্ব দেশীয় ইতিহাস অথবা সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্র থেকে জানা যায় না। অনেকে এই মত পোষণ করেন যে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর চৈনিক সূত্র থেকে বঙ্গ ও গঙ্গার অভিন্নতা সম্বন্ধে জানা যায়।[১] এর থেকে একমাত্র এই অনুমান করা যায় যে বঙ্গের মতো গঙ্গা নামেও কোন দেশ অথবা রাষ্ট্র সে সময়ে থাকতে পারে।

কোন কোন সূত্রে গঙ্গা দেশটিকে কলিঙ্গ এবং মগধের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে, এবং বলা হয়েছে যে গঙ্গাভিত্তিক গঙ্গারাজ্য এবং বিদেশীগণ কর্তৃক (টলেমি এবং পেরিপ্লাস গ্রন্থকার) বর্ণিত গঙ্গা রাজধানীশহর ও বন্দর, যথাক্রমে রাঢ় দেশ এবং সপ্তগ্রাম (The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India—N. L. Dey দ্রষ্টব্য)। গঙ্গা নদী, গঙ্গা রাষ্ট্র এবং গঙ্গা বা গঙ্গে নগর বন্দর সেই যুগের প্রেক্ষাপটে গঙ্গা নামটির গুরুত্ব, তাৎপর্য ও খ্যাতির কথাই ঘোষণা করে।

ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বলেছেন (History of Bengal Vol. I Dacca University Publication) গঙ্গারিডি বা গঙ্গারাষ্ট্র ভাগীরথীর পূর্বতীরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু আমাদের কাছে এই অভিমত যুক্তিগ্রাহ্য নয়। তার কারণ, গঙ্গারিডি বলে বর্ণিত মানবগোষ্ঠীর বাসভূমির সীমারেখা সম্বন্ধে বিদেশী লেখকদের বিবরণ থেকে যা জানা যায়, তার সঙ্গে ডঃ রায়চৌধুরীর মন্তব্য সঙ্গতি রক্ষা করে না। তবে মেগাস্থিনিস ও পরবর্তী বিদেশী লেখকদের বিবরণ থেকে যা জানা যায়, টলেমির ভূগোল থেকে যা বোঝা যায় এবং 'পেরিপ্লাস অফ দি এরিথিয়ান সী'র নাবিক গ্রন্থকারের বর্ণনা থেকে যা প্রতিভাত হয়, তাতে গঙ্গার উপকূলবর্তী অঞ্চলে গঙ্গাকে কেন্দ্র করে এক গঙ্গা-রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কথা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। অনেকেই মনে করেন, এই গঙ্গা রাষ্ট্রকেই দেশের উত্তরপশ্চিম প্রান্তের আর্যেরা গঙ্গাহৃদ (সংস্কৃত), গঙ্গারিদ (প্রাকৃত) বলে অভিহিত করেছিলেন এবং বিদেশীরা গঙ্গারিডি বলেছিলেন।

এই কারণেই আমাদের পক্ষে ডঃ নীহার রঞ্জন রায় (বাঙ্গালীর ইতিহাস) ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার (The History of Ancient Bengal) কর্তৃক লিপিবদ্ধ অভিমত যে

গঙ্গারিডি রাজ্য গঙ্গার পূর্বকূলে অবস্থিত ছিল এবং গঙ্গার পশ্চিমতীর থেকে তাম্রলিপ্ত-সহ সমুদয় রাঢ়বঙ্গ প্রভৃতি গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ বঙ্গভূমির অংশ প্রাসী রাজ্যের অন্তর্গত ছিল—এ' কথা স্বীকার করা সম্ভব নয়। এই সিদ্ধান্তগুলি অযৌক্তিক এবং অনৈতিহাসিক এবং গ্রীক এবং লাতিন লেখকদের বিবরণের উপর বিশ্বস্তভাবে নির্ভরশীল নয়। কোন ক্ষেত্রেই ডিওডোরাস, প্লুটার্ক, কার্টিয়াস, সলিনাস, প্লিনী প্রভৃতি লিপিকারেরা গঙ্গারিডিকে গঙ্গার পূর্ব উপকূলে বলে বর্ণনা করেন নি।

"পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি" (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে বিনয় ঘোষ বলেছেন যে গঙ্গারিডি নাম সংস্কৃত গঙ্গারাষ্ট্র, গঙ্গারাঢ়া, গঙ্গাহৃদয় নামের গ্রীক বিকৃতি। বিনয় ঘোষের এই অনুমান হয়তো বাস্তবের কাছাকাছি পৌঁছানোর প্রচেষ্টা, যদিও জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে এবং সাহিত্যে অথবা বৈদিক গ্রন্থাদিতে গঙ্গারাষ্ট্র বলে কোন রাষ্ট্রের উল্লেখ নেই এবং গঙ্গারাঢ়া অথবা গঙ্গাহৃদয় বলে কোন দেশ অথবা কোন জাতির উল্লেখ নেই। তথাপি, মনে হয় বিনয় ঘোষের উক্তিটি বিশেষ অর্থপূর্ণ।

রাঢ় নামের প্রাচীনত্ব একটি গভীর অনুসন্ধানের বিষয়। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রাঢ় শব্দটি যে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, এমন অনুমান করারও যথেষ্ট কারণ আছে। "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি" (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে বিনয় ঘোষ বলেছেন, "জৈন আচারাঙ্গ সূত্রে (খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতক) লাঢ় দেশের নাম পাওয়া যায়।" অন্যান্য পণ্ডিতবর্গের মধ্যে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুও রাঢ় শব্দের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ছিলেন। সুতরাং আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ে যে গঙ্গারাঢ় বা গঙ্গারাঢ়ী শব্দ একেবারেই অজ্ঞাত ছিল, এমন অনমনীয় মনোভাবের বশবর্তী হওয়া যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয় না।

কিন্তু ডঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর "বাঙ্গলার ইতিহাস" (আর্যযুগ) গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'গঙ্গারাঢ়ী বলে গ্রীক লেখকেরা কোন জাতির উল্লেখ করে যান নি। এ শব্দটি কয়েকজন বঙ্গভাষী লোকের স্বকপোলকল্পিত শব্দ'। ডঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্তের এই অভিমত চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা কঠিন।

তথাপি, এ'কথা বলা অসঙ্গত নয় যে গঙ্গারিডি নামটি রাঢ়বঙ্গকে ভিত্তি করেই উদ্ভূত হয়েছিল। সুতরাং এই বক্তব্যের বিপরীত ধারণাকে প্রশ্রয় দেওয়া আদৌ যুক্তিযুক্ত এবং ইতিহাস-সম্মত নয়। এই কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে সেই যুগে রাঢ় বা পশ্চিমবঙ্গ বর্তমান বিহারের পূর্বাংশের অনেকখানি নিয়েই গঠিত ছিল। ১৯১২ সালে ব্রিটিশ ভারতে বিহার প্রদেশ গঠিত হবার আগে পর্যন্ত সিংভুম, মানভুম, পূর্ণিয়া প্রভৃতি অঞ্চল বঙ্গদেশেরই অন্তর্গত ছিল।

গঙ্গারিডি বা গঙ্গারিডাই বলতে গ্রীক ও অন্যান্য বিদেশী লেখক যে গঙ্গারাঢ়ী বোঝাতে চেয়েছিলেন, এই বক্তব্যের সমর্থনে অন্য আর একটি শক্তিশালী যুক্তি বর্তমান। মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণের অনুসরণকারী ডিওডোরাসের প্রতিবেদন অনুযায়ী আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের সময় প্রাসাই ও গঙ্গারিডইদের রাজাকে জান্দ্রামেস (Xandrames) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কুইণ্টাস কার্টিয়াসের

বিবরণ অনুসারে আলেকজাণ্ডারের ভারতে আগমনের সমসাময়িক প্রাসিয়াই ও গঙ্গারিডেইদের রাজা ছিলেন অগ্রাম্মেস (Agrammes)। এই দুটি নামই এবং বিশেষভাবে অগ্রাম্মেস শব্দটি ঔগ্রসেন শব্দটির বিকৃতি। মহাপদ্ম নন্দকে সিংহলীয় পালি গ্রন্থ 'দীপবংশে' উগ্রসেন বলা হয়েছে। পুরাণের বর্ণনায় তিনি সর্বক্ষত্রান্তক, অর্থাৎ যিনি সকল ক্ষত্রিয়কে (নরপতিকে) পরাজিত ও নিহত করেছিলেন। সুতরাং মহাপদ্ম নন্দের পুত্র ধননন্দকেই (সিংহলীয় প্রাচীন কাহিনী অনুযায়ী) সংস্কৃত গ্রন্থে ঔগ্রসেন্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। পাটলিপুত্রে অবস্থানকালে মেগাস্থিনিস স্থানীয় রাজকর্মচারীদের কাছে এই নাম শুনেছিলেন। অতএব গঙ্গারিডি শব্দটিও মেগাস্থিনিসের শোনা গঙ্গারাঢ়ী থেকে আসা বিচিত্র নয়। পাটলিপুত্র তথা মগধের লোকেদের কাছে পাশের দেশ 'রাঢ়' নামটি হয়তো অজ্ঞাত ছিল না।

গঙ্গারিডিদের সঠিক অবস্থান কোথায় ছিল এই সম্পর্কে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত ডিওডোরাস সিকিউলাসের (জন্ম খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী) একটি মন্তব্যের মধ্যে নিহিত আছে। বলাই বাহুল্য, এই উক্তিটি আলেকজাণ্ডার অথবা আলেকজাণ্ডারের পরবর্তী সময়ের কোন উৎপত্তিস্থলের সঙ্গে জড়িত। উক্তিটি এই রকম ঃ—

"Now this river which (at its source) is 30 stadia broad, flows from north to south and empties its water into the ocean forming the eastern boundary of the Gangaridai, a nation which possesses a vast force of largest sized elephants. Owing to this, their country has never been conquered by any foreign king ; for all other nations dread the overwhelming number and strength of these animals......"[২]

এখানে যেমন গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের অথবা জাতির একটা অস্পষ্ট ভৌগোলিক সীমা নির্দেশ করা হয়েছে, তেমনই তাদের সামরিক শক্তির গোপন সূত্রটির কথা বলা হয়েছে। ডিওডোরাসের একই জবানিতে আমরা অন্য একটি বিষয়েও অবগত হই, যেমন ঃ—

"Alexander the Makedonian, after conquering all Asia, did not make war upon the Gangaridai, as he did on all others ; for when he arrived with all his troops at the river Ganges, and had subdued all the other Indians, he abandoned as hopeless an invasion of the Gangaridai when he learned that they possessed four thousand elephants well trained and equipped for war."[৩]

উল্লিখিত উক্তি দুটি থেকে আলেকজাণ্ডারের গঙ্গানদীর ধারে আসার কথা বাদ দিলেও, গঙ্গারিডিদের যে স্বল্প ভৌগোলিক রূপরেখা আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়, সেইটিই এখন আমাদের প্রধান বিবেচনার বিষয়। ডিওডোরাসের সীমা নির্দেশক মন্তব্যটি উপেক্ষা করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। ভাগীরথীর

পশ্চিমে যে ভূভাগ প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্ত, সুহ্ম অথবা রাঢ় বলে অভিহিত হতো, সেই অংশ গঙ্গারিডিদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রাচীনকালে কলিঙ্গ বলে পরিচিত বর্তমান উড়িষ্যা এবং দক্ষিণদিকে গোদাবরী পর্যন্ত ভূভাগ, এই রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' (হিন্দুরাজত্ব-তাম্রলিপ্ত রাজ্য)—যোগেশচন্দ্র বসু।

গঙ্গানদী গঙ্গারিডিদের পূর্বসীমা—ঢাকার ইতিহাস লেখক যতীন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি অনেকেই এই উক্তিটির যথার্থতা গ্রহণ করতে অক্ষম হয়ে ইতিহাসকে বিকৃত-করণের প্রবণতা দেখিয়েছেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় ইতিহাসবেত্তারাও মনে হয় এই প্রবণতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। এই সম্পর্কে, রমাপ্রসাদ চন্দ তাঁর 'গৌড় রাজমালা' পুস্তকে যা মন্তব্য করেছেন তা অত্যন্ত সুযুক্তিপূর্ণ। তাঁর বক্তব্য এই ছিল যে গঙ্গারিডই রাজ্য শুধু রাঢ়দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। যদি ধরে নিতে হয় যে গঙ্গারিডি রাঢ়দেশে তথা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা হলে এ'কথাও স্বীকার করতে হয় যে গঙ্গারিডি রাজ্য রাঢ় দেশকে বাদ দিয়েও কোন সময়ে ছিল না।

এইসব ইতিহাসবিদ পণ্ডিতেরা অনেকেই রাঢ়দেশের সঙ্গে উৎকল / উড্র দেশের জাতিগত, কৃষ্টিগত, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন নি। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মনে করতেন যে তাম্রলিপ্তসহ রাঢ়দেশ প্রাসীর মধ্যে ছিল। কিন্তু তাঁর এই অনুমান যথার্থ নয়। যেহেতু মহাপদ্ম নন্দ কলিঙ্গদেশের একটি অংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন বলে আমরা জানতে পারি[৪], তাঁর পক্ষে কলিঙ্গ ও রাঢ়দেশের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে যে মহাপদ্ম নন্দের পুত্রকে বৈদেশিক সাক্ষ্যে গঙ্গারিডিদেরও রাজা বলা হয়েছে। সেই হিসেবেও গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত তাম্রলিপ্ত এবং রাঢ়দেশ গঙ্গারিডিরই অধীন ছিল।

গঙ্গানদী গঙ্গারিডির পূর্বসীমা হয়ে সাগরে মিলিত হয়েছে। এই উক্তিকে অমান্য করার অথবা এই উক্তিকে ভুল প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দন জানাতে পারি না। এই বর্ণনার মধ্যে সীমানা নির্দেশক যে ইঙ্গিত রয়েছে তা গঙ্গারিডিকে শুধুমাত্র সমুদ্রের মোহনায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী বলে দাবী করাকে সমর্থন করে না এবং সেই জনগোষ্ঠীর শুধু দক্ষিণবঙ্গে তথা পূর্ব ও পশ্চিম সুন্দরবন অঞ্চলে অবস্থিতির কথাও প্রমাণ করে না। অবশ্য এই বিষয়ে এই অঞ্চলের আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলির গুরুত্বও উপেক্ষণীয় নয়। তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে টলেমির যুগ এবং মেগাস্থিনিসের যুগের মধ্যে পাঁচ / ছ'শ বছরের ব্যবধান এবং মেগাস্থিনিসের বিবরণের ভিত্তিতে রচিত বিদেশীদের বর্ণনায় গঙ্গা অথবা গঙ্গে বলে কোন গঞ্জ-বন্দর বা রাজধানীর উল্লেখ নেই।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাভিত্তিক সমন্বিত ভূভাগটি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কর্ণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্কের গৌড়রাজ্য বলে পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

জৈন আচারাঙ্গসূত্রে বর্ণিত বজ্জভূমি ও সুম্ভভূমি, যা একত্রিতভাবে রাঢ়বঙ্গকে গঠন করেছিল, তা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ ও পূর্বাংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গৌড়পতি শশাঙ্কের কর্তৃত্বাধীন হয়েছিল। মহারাজ শশাঙ্কের রাজ্যসীমার মধ্যে পুণ্ড্র ও বঙ্গের গাঙ্গেয় অঞ্চল নিশ্চিতভাবেই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সম্পূর্ণ রাজ্যটিই মেগাস্থিনিস বর্ণিত গঙ্গারিডির সঙ্গে সমার্থক বলেই মনে হয়।

গঙ্গারিডিকে বোধ হয় 'tribe' বলে বর্ণনা করা ঠিক নয়। কয়েকটি tribe বা উপজাতি নিয়েই গঙ্গারিডি মানবগোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল, যাকে আমরা জাতি বলে অভিহিত করেছি। রাষ্ট্রশাসন-বিদ্যর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে গঙ্গারিডি হয়তো তখনও পূর্ণ জাতিত্ব অর্জন করে নি। কিন্তু ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী জাতির বীজ এই গঙ্গারিডির মধ্যেই নিহিত ছিল সন্দেহ নেই, যদিও সেই যুগে অর্থাৎ মৌর্যযুগের অবসানের আগে পর্যন্ত গঙ্গারিডিকে সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র বলা যায় কিনা তা বিবেচ্য। অবশ্য মহাপদ্ম নন্দ যদি গঙ্গারিডি থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকেন অথবা গঙ্গারিডি দেশ অধিকার করার পরে মগধ অধিকার করেন, তবে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের কালে গঙ্গারিডির সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ বিশেষ থাকে না। এই বিষয়ে পরে আরও আলোকপাত করা যাবে।

গঙ্গারিডি শব্দটিকে কেউ কেউ ইন্দো-এরিয়ান বলেছেন। উত্তরপশ্চিম ভারতের আর্যেরা গঙ্গাহ্রদ বা গঙ্গারিদ যাইই বলে থাকুক এই মানবগোষ্ঠীকে, সেই ক্ষেত্রে সেই শব্দগুলি আর্যভাষা বা তার অপভ্রংশ থেকে উৎপন্ন। গঙ্গারিডি সেই শব্দের বা শব্দদুটির গ্রীক বিকৃতি।

এই গঙ্গারিডি শব্দটির অন্য আর একটি উৎস আছে। পাঞ্জাব অঞ্চলের অধিবাসীরা গঙ্গার উপকূলের জনগোষ্ঠীকে গঙ্গার (গঙ্গাল?) বলে অভিহিত করতো। গ্রীকেরা তাদের কাছ থেকে গঙ্গার শব্দটি নিঃসন্দেহে নিয়েছিল।[৫] ভাষাতত্ত্ববিদ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত অনুযায়ী গঙ্গার শব্দের সঙ্গে ইড প্রত্যয় যোগ করে একবচনে গঙ্গারিডেস এবং বহুবচনে ইডাই যোগ করে গঙ্গারিডাই শব্দটি গ্রীকেরা প্রথমে ব্যবহার করেছিলেন। রোমানদের বানান অনুসারে শব্দটি দাঁড়ায় 'গঙ্গারিডি' (Gangaridae)।

এই প্রসঙ্গে অন্য একটি বিষয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। পূর্বে উল্লিখিত গ্রীক বিবরণ থেকে জানা যায় যে আলেকজাণ্ডারের সময়ে গঙ্গারিডিদের অধিকারে চার হাজার সুশিক্ষিত এবং সজ্জিত রণহস্তী ছিল (ডিওডোরাস)।[৬] এই বর্ণনা প্লিনী (খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) কর্তৃক কথিত গঙ্গারিডি—কালিঙ্গেয়দের অধিকারে ৭০০ (সাতশ) রণহস্তী[৭] থাকার সঙ্গে কালগত রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন ভিন্ন সম্পূর্ণ সঙ্গীত রক্ষা করে না। অবশ্য ডিওডোরাস (Diodorus) যেহেতু তাঁর বিবরণে গঙ্গারিডি এবং প্রাসীর মধ্যে গঙ্গারিডির শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত প্রদান করেছেন, এই চার হাজার রণহস্তী আলেকজাণ্ডারের অভিযানের সময়ে গঙ্গারিডি ও প্রাসীর যৌথভাবে ছিল বলে অনুমান করা যায়।

নির্দেশিকা

১। Historical Geography of Ancient and Early Mediaeval Bengal—Dr. Amitabha Bhattacharjee P. 39.

২। Ancient India as described by Megasthenes and Arrian —J. W. Mccrindle. Revised Second Edition P. 32.

Classical Accounts of India—Dr. R. C. Majumdar P. 234.

৩। Ancient India as described by Megasthenes and Arrian J. W. Mccrindle. Revised Second Edition P. 32-33.

Classical Accounts of India—Dr. R. C. Majumdar P. 234

৪। কলিঙ্গরাজ খারবেলের হাতিগুম্ফা শিলালিপি।

৫। Studies in Indian Languistics—Dr. S. K. Chatterjee.

৬। Ancient India as described by Megasthenes and Arrian— J. W. Mccrindle. Revised Second Edition. P. 32-33.

৭। Classical Accounts of India (Pliny)—Dr. R. C. Majumdar P. 341.

গঙ্গারিডি ও প্রাসী

খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দী থেকে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত সুহ্ম তথা রাঢ় দেশে এবং পুণ্ড্র দেশে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব আমরা অন্যত্র লক্ষ্য করেছি। আমাদের দেশীয় সূত্র, যথা জৈন ধর্মগ্রন্থ, পুরাণ এবং বিদেশী সূত্র, যথা গ্রীক ও ল্যাতিন লেখকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণকালের প্রায় একশ বছরের মধ্যে বঙ্গভূমিরর খণ্ড খণ্ড রাজ্যগুলি এক পরাক্রমশালী নৃপতির অধিকারভুক্ত হয়েছিল।[১]

এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নরপতির বংশধরকে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সমসাময়িক এবং পরবর্তী গ্রীক কাহিনীকারগণ গঙ্গারিডির এবং প্রাসীর রাজা বলে বর্ণনা করেছিলেন। এই ক্ষমতাসম্পন্ন সুবিখ্যাত নরপতি নিঃসন্দেহে 'সর্বক্ষত্রান্তক' এবং 'একরাট' মহাপদ্ম নন্দ—যিনি নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি যে পুণ্ড্রদেশের অধিপতি ছিলেন এবং পুণ্ড্রবর্ধন তাঁর রাজধানী ছিল, এ কথাও কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন।[২]

মনে হয়, মহাপদ্ম নন্দ উত্তর ভারতের আর্য-ক্ষত্রিয় রাজাদের উৎখাত করার আগে মগধের সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। তারপরে ক্ষত্রিয় বিজয়ের পরে, রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল স্বরূপ মগধের অন্তর্গত পাটলিপুত্রে তাঁর রাজধানী স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত করেছিলেন। সুতরাং এই অনুমানই ইতিহাসগতভাবে নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় যে গঙ্গারিডি জাতিই তখন প্রবলতর ছিল এবং তাদের দেশও তখন বৈষয়িক উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধির উচ্চ শিখরে অবস্থিত ছিল।[৩] "বৃহত্তর বাঙ্গালী" পুস্তকে (দেবেশ দাস রচিত) এই বক্তব্যেরই সমর্থন রয়েছে।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ে মহাপদ্ম নন্দের পুত্র ধননন্দের বিপুল ঐশ্বর্য এবং প্রতিপত্তি দেখে সমসাময়িক গ্রীক ঐতিহাসিকেরা এবং তার অব্যবহিত পরেই মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের দরবারে প্রেরিত দূত মেগাস্থিনিস ধননন্দকেই পাটলিপুত্রে রাজত্বকারী প্রাসী এবং গঙ্গারিডিদের নরপতি বলে বর্ণনা করেছেন। এই সব গ্রীক বিবরণগুলির উপর নির্ভর করে পরবর্তীকালে গ্রীক ও লাতিন লেখকগণ তাঁদের রচনায় মহাপদ্ম নন্দ, তথা উগ্রসেনের (সিংহলীয় দীপবংশে বর্ণিত) পুত্র ঔগ্রসেন্যকে বিকৃতভাবে জান্দ্রামেস (ডিওডোরাস) অগ্রাম্মেস (কুইণ্টাস কার্টিয়াস) বলে অভিহিত করে তাঁকেই আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ে মগধের সিংহাসনে আসীন বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই সব লেখকগণ হয়তো রাজধানী পাটলিপুত্রের বিশালত্ব, সৌন্দর্য এবং বৈভব চিন্তা করে, অনেক সময়ে ধননন্দকে (মহাপদ্ম নন্দের পুত্র) শুধু প্রাসীদেশের রাজা বলে আখ্যা দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে এঁরা প্রাসীর রাজাকে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী এবং সহায়সম্পদসম্পন্ন বলে ধার্য করেছেন।[৫]

পুনরায়, ডিওডোরাস প্রমুখ লেখকেরা ঔগ্রসেন্য বা ধননন্দকে গঙ্গারিডির রাজা বলে মন্তব্য করেছেন যে গঙ্গারিডিইএর শাসনকর্তার রাজ্য বিস্তৃত ছিল পাঞ্জাবের পঞ্চনদের প্রান্তদেশ পর্যন্ত। প্রাসী এবং গঙ্গারিডির এই দুটি নামেরই আপেক্ষিক গুরুত্ব সেই সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। এই কারণে, এই অনুমান যুগপৎ ঐতিহাসিক এবং যুক্তিসঙ্গত যে মহাপদ্ম নন্দ গঙ্গারিডির রাজা ছিলেন এবং তিনি পাটলিপুত্রসহ মগধ রাজ্য অধিকার করে, মগধ তথা প্রাসী রাজ্যের সঙ্গে যুগ্ম রাষ্ট্র-শাসনের ব্যবস্থায় আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ছিল পলিবোথরা অর্থাৎ, পাটলিপুত্র।[৬] এখানে এই কথা স্মরণ করা কর্তব্য যে বৈদেশিক বিবরণে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে কখনও গঙ্গারিডির রাজা বলা হয় নি।

খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে দক্ষিণবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ (রাঢ়-গৌড়-পুণ্ড্র) একত্রিত হয়ে একটি অবিচ্ছিন্ন রাজ্য গঠনে সক্রিয় এবং সফল হয়েছিল। এই দেশ ও জাতিই আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান এবং তারপরে পাঞ্জাবে গ্রীকদের প্রতিপত্তি অর্জনের সময়ে গঙ্গারিডি নামে পরিচিত ছিল। মেগাস্থিনিস এই রাজ্যকে বিশাল এবং জনসংখ্যাকে বিপুল বলে বর্ণনা করেছিলেন।[৭] নিম্নবঙ্গের গঙ্গার দুই তীরবর্তী অঞ্চল এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সন্দেহ নেই, এবং হয়তো (পূর্ব) বঙ্গের প্রাচীন ভূভাগগুলিও এই গঙ্গারিডি রাজ্যের অধীনে ছিল।[৮]

"গঙ্গারিডই রাজ্য যে রাঢ় দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, এমন মনে হয় না। কারণ, কেবল রাঢ়দেশের অধিপতির পক্ষে পরাক্রান্ত মগধরাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হইত না। বাংলার অপর দুটি বিভাগ পুণ্ড্র (বরেন্দ্র), এবং বঙ্গ, নিশ্চয়ই 'গঙ্গারিডই' রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; এবং কলিঙ্গও একসময়ে এই রাজ্যের সহিত সংলগ্ন ছিল।..." (গৌড় রাজমালা—রমাপ্রসাদ চন্দ)

উপযুক্ত অভিমতটি বিশ্লেষণ করলে আমারা সেই সময়কার একটি ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রনৈতিক রূপরেখার ধারণা করতে পারি। গঙ্গার পশ্চিমদিকে রাঢ়দেশ প্রাসীদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, বরং প্রাথমিকভাবে গঙ্গারিডি দেশ এই প্রাচীন রাঢ় দেশ নির্ভর ছিল, এমন ধারণাই মনে উদয় হয়। রাঢ়দেশ তথা তাম্রলিপ্ত তদানীন্তন কলিঙ্গদেশের সন্নিহিত ছিল এবং এই দুটি দেশের মধ্যে অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্কই বিদ্যমান ছিল। বঙ্গদেশের তিনটি প্রধান অংশই 'গঙ্গারিডির' অন্তর্গত হওয়া ইতিহাসসম্মত বলেই মনে হয়।

পঞ্চনদের দেশ, অর্থাৎ, পাঞ্জাব জয় করা সত্ত্বেও দিগ্বিজয়ী গ্রীক বীর আলেক-জাণ্ডারের ভারত আক্রমণ কার্যতঃ ব্যর্থ হয়েছিল। আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের ফল অন্যভাবে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু আলেকজাণ্ডার অথবা সেলুকাস প্রমুখ গ্রীকরণনায়কগণ অথবা সেনাপতিদের শৌর্য ও বীর্যের প্রভাবে ভারতবর্ষ সেই সময় অতি অল্পকালের জন্যও গ্রীক উপনিবেশে পরিণত হয় নি।

আলেকজাণ্ডার সিন্ধুনদের তীরে পেঁছেই ভারতীয়দের প্রতিরোধশক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে সেই বিশাল নদীর এপার থেকে ওপার

পর্যন্ত শত শত যুদ্ধ জাহাজ (man-of-war) দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করেছে এবং অধীর আগ্রহে বিদেশী শত্রুর প্রতীক্ষা করছে।[৯]

তবুও গাঙ্গেয় উপত্যকার ঐশ্বর্য ও সম্পদ তাঁকে হয়তো ভারত বিজয়ে প্রলুব্ধ করেছিল এবং তিনি শেষ পর্যন্ত গাঙ্গেয়ভূমিকে নিজের অধিকারভুক্ত করতে সক্ষম হবেন—এই আশাই পোষণ করেছিলেন। তিনি নিজের অনুচরদের দেশীয় রাজন্য-বর্গের, বিশেষভাবে প্রাচ্যদেশীয় নরপতিদের, সামরিক শক্তির গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করতে আদেশ দিয়েছিলেন।

সিন্ধু নদীর পরপারে অর্থাৎ সিন্ধুর অববাহিকায় পঞ্চনদের দেশ অতিক্রম করে ভারতের অভ্যন্তরে যাবার স্বপ্ন তাঁর মধ্যে জাগরিত হয়েছিল, নানা কারণেই। প্রথম কারণ ছিল, প্রতীচ্যের এবং নিজের দেশের সম্বন্ধে তাঁর উচ্চ ধারণা ও অহমিকা এবং সেইজন্য সুদূর প্রাচ্যের এই বিখ্যাত দেশটিকে জানবার আগ্রহ ও অত্যুগ্র বাসনা। দ্বিতীয় কারণ এই ছিল যে, পারস্য সাম্রাজ্যকে হীনবল করে সুদূর ভারতভূমি পর্যন্ত অভিযান পরিচালনার দ্বারা তিনি সিন্ধু উপত্যকায় সামরিক জয়ের স্বাদ গ্রহণে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন। কিন্তু যে শেষ ও তৃতীয় কারণটি তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল ভারত আক্রমণে এবং পরে প্রায় তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রবেশ করতে, তা হলো গঙ্গারিডি এবং প্রাসীদেশের সমৃদ্ধির কাহিনী যা তাঁর ভালো-ভাবেই কর্ণগোচর হয়েছিল।

তক্ষশীলার রাজা অম্ভী পরাজিত হয়ে শুধু যে প্রবল বৈদেশিক আক্রমণকারী আলেকজাণ্ডারের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলেন, তাইই নয়, তক্ষশীলারাজ, আলেকজাণ্ডার ও তাঁর প্রত্যেক সেনাপতিকে সোনার মুকুট এবং ভারী ওজনের হাজার রৌপ্য মুদ্রা উপঢৌকন দিয়েছিলেন।[১০] ধীসম্পন্ন এবং প্রতিভাবান আলেকজাণ্ডারের মানসচক্ষে বিশাল ভারতের বিপুল ধনরত্ন ও বৈভবের লোভনীয় চিত্র যথার্থভাবেই উদ্ভাসিত হয়েছিল।

দেশীয় রাজন্যদের হাত থেকে পাঞ্জাব অধিকার করেও, বীরপুঙ্গব আলেকজাণ্ডার শেষ পর্যন্ত আর্যাবর্তের আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হতে সাহসী হন নি। বস্তুতঃ ভারত বিজয়ের আশা পরিত্যাগ করে, তিনি পুনরায় সিন্ধুনদের পথে সমুদ্রে উপনীত হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু কেন, কি কারণে বা কিসের ভয়ে ভীত হয়ে আলেকজাণ্ডার ভগ্নোদ্যম হয়ে ভারতবর্ষ থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন!

এই প্রশ্নের উত্তরগুলি পাওয়া যায় আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক ও পরবর্তী-কালের গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও ভারত সম্বন্ধে আগ্রহী পণ্ডিতদের বৃত্তান্তগুলি অনুসরণ করলে। দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষের নিজস্ব ইতিহাস এই বিষয়ে নির্বাক। আর্যঋষিগণ কর্তৃক রচিত বৈদিক শাস্ত্রে এবং ব্রাহ্মণ্য যুগের অভ্যুদয়ে পৌরাণিক গ্রন্থসমূহে (যে সকল গ্রন্থ প্রায় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী অবধি রচিত হয়েছিল), আলেকজাণ্ডারের হৃদয়ে ত্রাস উৎপাদনকারী এবং গ্রীক বর্ণিত গঙ্গারিডি রাজ্যের (এবং প্রাসী রাজ্যেরও) কোন উল্লেখ নেই।

এই গঙ্গারিডিদের দীর্ঘ দিনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিদেশীদের সাক্ষ্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। এই প্রসঙ্গে এক ভারতবিখ্যাত ঐতিহাসিকের নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয় ঃ—

"আলেকজাণ্ডারের অভিযানের চারি পাঁচ শত বৎসর পরে লিখিত পেরিপ্লাস গ্রন্থ ও টলেমির বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে বাংলায় স্বাধীন গঙ্গারিডি রাজ্য বেশ প্রবল ছিল এবং গঙ্গাতীরবর্তী গঙ্গে নামক নগরী ইহার রাজধানী ছিল। এই গঙ্গে নগরী একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল এবং বাংলার সূক্ষ্ম মসলিন কাপড় এখান হইতে পাশ্চাত্যদেশে রপ্তানী হইত। এই সংবাদটুকু ছাড়া খৃষ্টজন্মের পূর্বে তিনশত ও পরের তিনশত মোট ছয়শত বৎসর বাংলার ইতিহাস নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন!......"[১১]

আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান পরিত্যক্ত হবার সঙ্গে এই গঙ্গারিডি জাতির কি সম্পর্ক, তাই আমাদের বিবেচনার বিষয়। গ্রীক ঐতিহাসিক ডিওডোরাস (খৃঃ পূঃ ৪৯—খৃষ্টাব্দ ১৪) তাঁর গ্রীক ভাষায় রচিত 'Bibliotheke" নামক বিশাল ঐতিহাসিক গ্রন্থে বলেছেন যে আলেকজাণ্ডার হাইফ্যাসিস অর্থাৎ বিপাশা নদীর তীরে উপনীত হয়ে জানতে পারেন যে পঞ্চনদের পূর্ব প্রান্তে গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রাসিওই এবং গঙ্গারিডই নামে দুটি রাজ্য ছিল, যাদের রাজার অধীনে বিশ সহস্র অশ্বারোহী, দু লক্ষ পদাতিক, দু সহস্র রথ এবং চার হাজার হস্তী যুদ্ধার্থে শিক্ষিত এবং সজ্জিত ছিল। রাজা পুরু আলেকজাণ্ডারের কাছে এই সংবাদের সত্যতা সমর্থন করেছিলেন।

আলেকজাণ্ডার পুরুর কাছে আরও সংবাদ পেয়েছিলেন যে গঙ্গারিডইদের রাজা নাপিতবংশসম্ভূত হওয়ায় জনসাধারণের চোখে শ্রদ্ধার্হ ছিলেন না। ডিওডোরাস (Diodorus) এই রাজার নাম জান্দ্রামেস বলে উল্লেখ করেছেন।[১২]

ডিওডোরাস তাঁর সাধারণ বিবরণে আরও মন্তব্য করেছেন যে গঙ্গার উপত্যকায় গঙ্গারিডিই শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল এবং তাদের হস্তীবলের ভয়ে ভীত হয়েই আলেকজাণ্ডার গাঙ্গেয় ভূমিতে পদার্পণ করেন নি।[১৩]

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন যে ডিওডোরাস তাঁর বিবরণের একস্থানে এই কথা লিপিবদ্ধ করেছেন যে গঙ্গারিডি অঞ্চলটি ভারত ভূখণ্ডের অবশিষ্ট অংশ থেকে সেই দিকের বৃহত্তম নদীর (যার প্রস্থ ত্রিশ ষ্টাডিয়া) দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে।[১৪] ডিওডোরাসের জবানীতে এই বর্ণনাটি প্রকৃতপক্ষে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দৃষ্টিপাত করলে, গঙ্গারিডি দেশটির গঙ্গার নিম্নভাগে তথা পশ্চিমভাগে অবস্থিত হবার কথাই সমর্থন করে, এই কথা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। এই অনুমিতিকে সমর্থনের আরও একটি কারণ এই যে গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রাচীনতম ধারা নিম্ন উপত্যকায় এবং সমভূমিতে প্রাসী এবং গঙ্গারিডি দেশ দুটিকে পশ্চিমে রেখে পূর্ব সমুদ্রে (বঙ্গোপসাগরে) মিলিত হয়েছে।

বলাই বাহুল্য, ডিওডোরাস তাঁর বিবরণের অন্য এক স্থানে ব্যক্ত করেছেন যে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত এই নদী এই দেশের পূর্ব সীমা গঠন করে সাগরে

গিয়ে তার সব জল নিঃশেষ করে দিয়েছে। এই বৈদেশিক সাক্ষ্যের সঙ্গে এই কথাও স্মরণীয় যে মগধরাজ্য দক্ষিণ বিহারে অবস্থিত। অর্থাৎ, উত্তর পশ্চিম প্রান্ত থেকে লক্ষ্য করলে বলা যায় গঙ্গার দক্ষিণ অর্থাৎ পশ্চিম তীরে অবস্থিত—যে কারণে, প্রাচীন মানচিত্রে পাটলিপুত্র, চম্পা, রাজমহল (কজঙ্গল), গৌড় প্রভৃতি সবই গঙ্গার পশ্চিম তীরে।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর গ্রীক ঐতিহাসিক প্লুটার্ক (Plutarch) বলেছেন যে বিয়স অথবা বিপাশা নদীর পূর্ব দিকে অগ্রসর হবার সম্বন্ধে আলেকজাণ্ডারের দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তনের কারণ এই ছিল যে পুরুকে অত্যন্ত আয়াস সহকারে পরাজিত করার পরে, তাঁর সঙ্গে মাত্র বিশ সহস্র পদাতিক এবং দু সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য অবশিষ্ট ছিল। অপরপক্ষে, গঙ্গার সুদূর তীরগুলি (further banks) অস্ত্রসজ্জিত সৈন্য, অশ্ব এবং হস্তীতে পরিপূর্ণ ছিল। গণ্ডারিটাই এবং প্রাইসিওইদের নৃপতিরা আশি সহস্র অশ্বারোহী, দু লক্ষ পদাতিক, আট সহস্র রথ এবং ছ সহস্র হস্তী নিয়ে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।[১৫]

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে এই সম্মিলিত শক্তির নৌবলের কথা কোথাও উল্লিখিত হয় নি। সুতরাং এক জলপ্লাবিত বিচ্ছিন্ন ভূভাগে গঙ্গারিডি দেশ / জাতি সীমাবদ্ধ ছিল না, যদিও সামুদ্রিক জাতি বলে তাদের পরিচয় সর্বত্র স্বীকৃত ছিল।

আলেকজাণ্ডারের জীবনীলেখক কুইণ্টাস কার্টিয়াস রুফাস (আনুমানিক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) বর্ণনা করেছেন যে আলেকজাণ্ডার হাইফাসিস (বিয়াস অথবা বিপাশা) নদীর উপকূলে উপনীত হয়ে ফেগিয়াস নামে এক স্থানীয় সর্দারের (রাজার) কাছে শুনেছিলেন যে বিপাশা নদী অতিক্রম করে বিস্তীর্ণ মরু অঞ্চল এবং এগারো দিনের পথ সেই মরু অঞ্চল উত্তীর্ণ হয়ে ভারতের বৃহত্তম নদী গঙ্গা, যার সুদূর তীরে (further bank) দুটি শক্তিশালী জাতির বাস—গঙ্গারিডাই এবং ফারাসাই, যাদের রাজা অগ্রাম্মেস বিশ সহস্র অশ্বারোহী, দু লক্ষ পদাতিক, দু সহস্র চার অশ্ববাহিত রথ এবং তিন সহস্র হস্তী, তাঁর দেশে অগ্রসর হবার মুখগুলিকে রক্ষা করার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত রেখেছিলেন।[১৬]

রোমান ঐতিহাসিক প্লিনী (খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) লাতিন ভাষায় রচিত তাঁর "Naturalis Historia" গ্রন্থে বলেছেন যে সেই সময়ে ভারতবর্ষে প্রাসীই (Prasii) জাতিই ক্ষমতায় এবং গৌরবে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। তাদের রাজধানী ছিল পালিবোথরা (পাটলিপুত্র—বর্তমান পাটনা) নামে এক সম্পদশালী এবং বিশাল নগরী যার নাম অনুসারে কেউ কেউ এই নগরের অধিবাসীদের এবং সমগ্র গাঙ্গেয় সন্নিহিত ভূখণ্ডকে পালিবোথরী বলে চিহ্নিত করতো এবং তাদের রাজার অধীনে বেতনভুক ছ' লক্ষ পদাতিক, ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী এবং নয় সহস্র হস্তীবাহী সৈন্য ছিল।[১৭]

প্রাসাইদের প্রসঙ্গে আসবার আগে প্লিনী (Pliny) গঙ্গা নদীর সম্বন্ধে আলোচনায় বলেছেন যে কালিঙ্গেয়ী নামধারী জাতি সমুদ্রের সবচেয়ে নিকটে বাস করে ; এবং তাদের উত্তরে আছে মান্দেয়ী এবং মাল্লাই, যাদের দেশে 'মল্লস' পর্বত, এবং এই সব অঞ্চলের

সীমা হচ্ছে গঙ্গা নদী।[১৮] গঙ্গা নদীকে নীলনদের সঙ্গে তুলনা করে, এবং গঙ্গা নদীর শান্ত গতিপথে উনিশটি উপনদীর কথা উল্লেখ করে প্লিনী জানিয়েছেন যে এই নদীর শেষভাগ গঙ্গারিডিদের দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। কালিঙ্গেয়ীদের রাজধানীর নাম পার্থালিস এবং ষাট সহস্র পদাতিক, এক সহস্র ঘোড়সওয়ার ও সাত শত হস্তী তাদের রাজাকে সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করে।[১৯]

গঙ্গারিডিদের রাজ্যের মধ্য দিয়েই গঙ্গানদীর শেষভাগ প্রবাহিত হয়েছে—এই কথা বলার পরেই প্লিনী বলেছেন যে কালিঙ্গেয়ীদের রাজকীয় শহর (অর্থাৎ রাজা যেখানে বাস করে, অর্থাৎ রাজধানী) পার্থালিস নামে পরিচিত। গঙ্গারিডি দেশের মধ্য দিয়ে গঙ্গার শেষভাগ প্রবাহিত হওয়া, কালিঙ্গেয়ীদের অস্তিত্ব, কালিঙ্গেয়ীদের রাজধানীর নাম এবং তাদের সৈন্যবলের কথা প্লিনী বলেছেন একসঙ্গে, পর পর যেন এক নিঃশ্বাসে!

এর তাৎপর্য কি, তিনি কেনই বা এইভাবে বর্ণনা দিয়েছেন? নিশ্চয়ই গঙ্গারিডি ও কালিঙ্গেয়ীদের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক ছিল। অন্যথায় তিনি গঙ্গারিডিদের রাজধানীর কথা উল্লেখ করতেন, কিন্তু তা করেন নি। এর একমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য কারণ হচ্ছে এই যে গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ীরা পরস্পরের সঙ্গে জাতিগত সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। অনুবাদক ও টীকাকার জে, ডব্লিউ, ম্যাকক্রিণ্ডল এদের রাজধানীকে 'গঙ্গারিডাম কালিঙ্গারাম রেজিয়া' (Gangaridum Calingarum Regia) বলে বর্ণনা করেছেন, যার থেকে অনুমান করা যায় যে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ী জাতির একটি রাজধানী ছিল এবং নিজেদের একটি সৈন্যদল ছিল।

গ্রীক ভৌগোলিক ষ্ট্রাবো (খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) তাঁর বিবরণে গঙ্গার তীরবর্তী এবং বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী নগরী হিসেবে পলিবোথরার (Polibothra) উল্লেখ করেছেন। ষ্ট্রাবো (Strabo) লিখেছেন যে এই নগরীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভারতীয় দুটি বৃহত্তম নদীর মধ্যে অন্যতম গঙ্গা সেই দিকে সমুদ্রাভিমুখী হয়েছে এবং একটি মুখের সাহায্যে সমুদ্রে জল ঢেলেছে।[২০] গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ান (Arrian) তাঁর গ্রীক ভাষায় রচিত বিবরণে (Indika) প্রাসাইদের রাজ্যে গঙ্গা এবং শোন নদীর (এরান্নোবোয়াস) সঙ্গমে অবস্থিত ভারতবর্ষের বৃহত্তম নগরী 'পালিমবোথরা'র (Polimbothra) কথা উল্লেখ করেছেন।[২১]

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভায় প্রেরিত গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণের উপর নির্ভরশীল পরবর্তী বৈদেশিক লেখকগণের রচনাবলীতে সেই সময়ে প্রাসাই সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য এবং 'পলিবোথরা' শ্রেষ্ঠ নগরী রূপে বর্ণিত হয়েছে। মেগাস্থিনিস মৌর্যদের শক্তি, সম্পদ, শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে অতি মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থ লুপ্ত হয়ে গেলেও পরবর্তী লেখকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে গঙ্গারিডি জাতি / দেশ প্রাসীর অধীনে ছিল। মগধ ছিল তদানীন্তন আর্যাবর্তে সার্বভৌম শক্তির কেন্দ্ররাজ্য এবং পাটলিপুত্র ছিল মগধ তথা

সেই সার্বভৌম সাম্রাজ্যের রাজধানী। সুতরাং এই কথা মনে করা অসঙ্গত নয় যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়ে মগধ তথা পাটলিপুত্রের মর্যাদা এবং গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল, এবং সেই অনুপাতে গঙ্গারিডিদের প্রাধান্য হ্রাস পেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে তদানীন্তন বিহারে মগধের রাজশক্তি বিদেহ ও অঙ্গদেশকে গ্রাস করে এবং আর্যাবর্তের অনেক অংশে ও দাক্ষিণাত্যের কিছু অংশে বিস্তৃত হয়ে, বঙ্গভূমির রাজশক্তি অপেক্ষা অনেক সুসংবদ্ধ এবং কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।[২২]

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থিতিতে অনুসন্ধিৎসু গ্রীক ভৌগোলিক টলেমি তাঁর গ্রন্থে (Outline of Geography) গঙ্গারিডিদের সম্বন্ধে বলেছেন যে গঙ্গার মোহনার সমস্ত ভূভাগই এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং রাজকীয় শহর (অর্থাৎ যেখানে রাজা বাস করতেন) 'গঙ্গে' তাদের দেশের মধ্যে ছিল।[২৩] সুতরাং গঙ্গার মোহনা ও সন্নিহিত অঞ্চলগুলির উপর তাদের আধিপত্য ছিল এ'কথা সহজেই অনুমেয়। টলেমির বক্তব্যের আরও একটি তাৎপর্য এই যে সেই সময়ে গঙ্গারিডিদের রাজধানী ছিল 'গঙ্গে', যার সঙ্গে কলিঙ্গীদের কোন সম্পর্ক ছিল না।

'পেরিপ্লাস' (Periplus of the Erythrean Sea) গ্রন্থকার (এক অজ্ঞাত-নামা গ্রীক নাবিক) গঙ্গার মুখে 'গঙ্গে' বন্দরের উল্লেখ করেছেন। এই বন্দরের মধ্য দিয়ে সূক্ষ্ম গাঙ্গেয় মসলিন, মুক্তা এবং অন্যান্য পণ্য রপ্তানী হতো (Classical Accounts of India P. 308)। এই উক্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই বন্দরটি সাগর বন্দর ছিল না। ছিল সাগর থেকে অনতিদূরে। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি হলো এই যে গঙ্গানদীর মোহনা কোন স্থানে ছিল এবং কোন স্থানে তদানীন্তন এই সুবিখ্যাত বন্দরটি সম্ভাব্যভাবে গড়ে উঠেছিল, এবং কেনই বা আর পরে 'গঙ্গে' বন্দরের নাম পাওয়া যায় না। এই সব বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান প্রয়োজন। সাগরের কূলে বন্দরটি অবস্থিত হলে, বন্দরটি আরও দীর্ঘস্থায়ী হতো। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থকার গঙ্গারিডিদের সম্বন্ধে আদৌ উল্লেখ করেন নি।

এই অবকাশে এ' কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে টলেমি অথবা পেরিপ্লাস গ্রন্থকার, কেউ তেমনভাবে প্রাসীদের অথবা প্রাসাইদের রাজনৈতিক আধিপত্যের উল্লেখ করেন নি। টলেমি তাঁর আন্তর্গাঙ্গেয় ভারতের মানচিত্রে 'পলিবোথরা'র অনেক উপরের দিকে 'প্রেসিয়াকা' (Prasiaca) বলে এক রাজ্যের নির্দেশ করেছেন। এঁরা কেউই গঙ্গারিডি—কালিঙ্গেয়ীদের কথা বলেন নি। প্লিনীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে (ক) এই নদীর (গঙ্গা) শেষ অংশ গঙ্গারিডিদের দেশের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে, (খ) কালিঙ্গেয়ীরা সমুদ্রের সবচেয়ে নিকটে বাস করে, (গ) কালিঙ্গেয়ীদের রাজা বাস করেন যে নগরে, তার নাম পার্থালিস। ম্যাকক্রিণ্ডল এবং বোস্টক (Bostock) এই বিবরণের উপর মন্তব্য করে বলেছেন যে এখানে গঙ্গারিডি—কালিঙ্গেয়ীদের কথা বলা হয়েছে।[২৪]

টলেমি কলিঙ্গীদের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন নি। বঙ্গদেশ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে কালিগা বলে একটি স্থানের উল্লেখ করেছেন, তাঁর মানচিত্রে। প্লিনী 'গঙ্গে'

বন্দর / নগরের উল্লেখ করেন নি। দুটি ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে এই দুটি তথ্যের সমর্থন অথবা বাদ দেওয়ার ব্যাপারটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে হয়। এর থেকে অন্ততঃ একটি বিষয় পরিষ্কার হয় যে মেগাস্থিনিসের সময়ে এই 'গঙ্গে' বন্দরের অস্তিত্ব ছিল না। হয়তো অশোক বা তার পরের সময়েও ছিল না। অবশ্য তখন গঙ্গার সাগর সঙ্গম ছিল আরও অনেক উত্তরে।

প্লিনী পাঁচশ বছর পরে (খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) লিখেও কেন 'গঙ্গে' বন্দরের উল্লেখ করেন নি, তা নিশ্চয়ই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক সূত্রগুলি থেকে অথবা মেগাস্থিনিসের সূত্রেও প্লিনী হয়তো এই বন্দরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সংবাদই পান নি।

পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল গঙ্গারিডি রাজ্যের অন্তর্গত ছিল—এই তথ্যের উপর ভিত্তি রচনা করে অনুমান করা যায় যে গঙ্গারিডই এবং কালিঙ্গেয়ী এই দুই জাতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। প্লিনী এই সংযুক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এফ, জে, মোনাহানের অভিমতে প্লিনী তাম্রলিপ্তকে প্রাসাইদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করতেন (The Early History of Bengal)। কারণ, প্রাসাইদের দেশ থেকে সিংহল সাতদিনের পথ।[২৫] অনুমান করা হয়েছে যে তাম্রলিপ্ত থেকে সিংহল সাতদিনের সমুদ্র-যাত্রা, পাটলিপুত্র থেকে নয়। এ সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে।

প্লিনী এ'কথা মনে করলেও, তাম্রলিপ্ত থেকে সাতদিনে সমুদ্রপথে সিংহল পৌঁছানো যেত ধরে নেওয়া সঙ্গত নয়, এবং তাম্রলিপ্ত যে প্রাসীর মধ্যে ছিল, তাও চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় না। গ্রীক ভৌগোলিক ষ্ট্রাবোর বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে প্রাসী থেকে সিংহল প্রায় কুড়ি দিনের সমুদ্র ভ্রমণ।[২৬]

হয়তো প্লিনীর এই অনুমানের উপর নির্ভর করেই ডঃ নীহাররঞ্জন রায় (বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব), ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী (History of Bengal, Dacca University Publication P. 47) ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের (History of Ancient Bengal) মতো প্রতিভাসম্পন্ন এবং প্রখ্যাত ঐতিহাসিকেরা তাম্রলিপ্তসহ গঙ্গার তীরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র ভূভাগকেই প্রাসী রাজ্যের অন্তর্গত বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে এইসব প্রথম সারির ভারততত্ত্ববিদ এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিকেরা সমসাময়িক (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী—খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) বিদেশী লেখকদের (যাঁরা তখনকার দিনে অনেকেই ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন) বিবরণের প্রধান সূত্রগুলি উপেক্ষা করেই ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে এই অনৈতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন এবং উত্তরকালের ছাত্র, গবেষক, ইতিহাস-অনুসন্ধানকারীদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিলেন।

এখন দেখা দরকার যে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা কেমনভাবে বা কোন সূত্রে মনে করলেন যে গঙ্গারিডিরা গঙ্গার পূর্বদিকে বাস করেন। কুইণ্টাস

কার্টিয়াস (Quintus Curtius), প্লুটার্ক, সলিনাস বলেছেন, 'The Gangaradai and the Prasii dwelt on the further bank of the Ganges', যার অর্থ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার করলেন i.e. the eastern bank[২৭]। এই eastern bank ধরে নেওয়ার ব্যাখ্যা এইসব সুপ্রসিদ্ধ এবং যশস্বী ঐতিহাসিকগণই সম্ভবতঃ করে থাকবেন।

Further bank of the Ganges বলতে কিভাবে eastern bank (পূর্ব উপকূল) বোঝায় তা বোধগম্য হয় না। তাহলে প্রাসী এবং গঙ্গারিড়ি দু'দেশই গঙ্গার পূর্ব দিকে ছিল, বলতে হয়। তা যদি হয়, অর্থাৎ গঙ্গা নদী যদি প্রাসী ও গঙ্গারিড়ির পশ্চিম সীমা হয় তবে গঙ্গা তীরবর্তী রাঢ়দেশে ও তাম্রলিপ্ত কিভাবে প্রাসী রাজ্যের মধ্যে হয়! ডিওডোরাস, প্লুটার্ক, কার্টিয়াস প্রভৃতির ভাষ্যের ইচ্ছামূলক বিশ্লেষণ করে, এই সব ঐতিহাসিকেরা রাঢ়সমেত বঙ্গভূমির গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী অংশকে প্রাসী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং গঙ্গার পূর্ব তীর থেকে সমুদ্র পর্যন্ত অঞ্চলকে গঙ্গারিড়ি বলেছিলেন।

কিন্তু মনে হয় বিদেশী রচয়িতারা আসলে বলতে চেয়েছিলেন যে এই দুটি রাষ্ট্রই গঙ্গানদীর সুদূর প্রান্তে অবস্থিত এবং এই দুই রাষ্ট্রকেই গঙ্গানদী ভারতের অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। (Diodorus—the region where the Gangaridai lived is separated from further India by the greatest river in these parts for it has breadth of 30 stadia)।[২৮] এই রকম বর্ণনা কিন্তু "Classical Accounts of India" (Dr. R. C. Majumdar) নামক সংকলিত গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ডিওডোরাসের অন্য একটি উক্তির (Ganges which is 30 stadia broad, flows from north to south forming the boundary towards the east of the tribe of the Gangaridai) ভিত্তিতে স্বীকার করেছেন যে এই নির্দেশ মানলে গঙ্গারিড়িদের রাঢ়ের অধিবাসী বলতে হয়।[২৯] কিন্তু বিদেশী লেখকদের বিভিন্ন বিবরণ (যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে) বিশ্লেষণ করে তিনি শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে গঙ্গারিড়িরা রাঢ় দেশে বাস করতো বলে মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়।[৩০] কেন নয়, তা তিনি বলেন নি! এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ডিওডোরাসের বর্ণনার মধ্যে towards the east of the tribe প্রভৃতি শব্দগুলি আদৌ নেই। (Classical Accounts of India—Dr. R. C. Majumdar, Page 234)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কতগুলি স্বকল্পিত ধারণার বশবর্তী হয়েই এই সব দিকপাল ঐতিহাসিকেরা যে কোন ভাবেই গঙ্গারিড়িকে রাঢ় দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। তাই পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলি, বিশেষভাবে পাণ্ডুরাজার ঢিবি / মঙ্গলকোটের উৎখনন, নির্ভুলভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে যে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি রাঢ়দেশ

গঙ্গারিডিদের আদি বাসস্থান ছিল। এই প্রসঙ্গে "গৌড় রাজমালা" পুস্তকে লিপিবদ্ধ রমাপ্রসাদ চন্দের মন্তব্যগুলি (যা আগেই বলা হয়েছে) স্মরণীয়।

সম্পূর্ণ পুণ্ড্র এবং বঙ্গ গঙ্গারিডির অন্তর্ভুক্ত ছিল হয়তো। কিন্তু তৎকালীন রাঢ় দেশের প্রাচীন সীমা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী এই বিশাল ভূখণ্ড (যা প্রাসী দেশের সীমানা স্পর্শ করেছিল) তা যে ধনে, ধান্যে, খনিজ পদার্থে, শিল্পে, ব্যবসায়ে, বাণিজ্যে, কত প্রভূত সম্পদশালী এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জাতির বাসভূমি ছিল, তা অন্যত্র সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। রাঢ়দেশ, উত্তরে রাজমহল, দক্ষিণে সমুদ্র এবং উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, পশ্চিমে বিহারের মানভূম, সিংভূম প্রভৃতি অঞ্চল এবং পূর্বে ভাগীরথী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

"বাঙ্গালীর ইতিহাস" (আদি পর্ব) গ্রন্থে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় গ্রীক ও লাতিন সাক্ষ্যগুলি বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেছেন……"বিপাশা নদীর পূর্ব তীরে দুইটি পরাক্রান্ত রাষ্ট্র বিস্তৃত ছিল। একটি প্রাচ্য, (প্রাসীয়াই) এবং অপরটি গঙ্গারাষ্ট্র (গঙ্গারিডাই)। প্রাচ্য রাজ্যের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র এবং গঙ্গারাষ্ট্রের গঙ্গা (নগর)। পেরিপ্লাস গ্রন্থ ও টলেমির বিবরণ হইতে জানা যায়, গঙ্গানগর সামুদ্রিক বাণিজ্যের বৃহৎ বন্দর ছিল ; টলেমি আরও বলিতেছেন এই গঙ্গা বন্দর অবস্থিত ছিল কুমার নদীর মোহনায়।……"

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের এই বক্তব্য গঙ্গারিডিদের রাজধানীকে গঙ্গা নামক বন্দর ও নগরের সঙ্গে জড়িত করে। কিন্তু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মেগাস্থিনিস অথবা ডিওডোরাস, কুইণ্টাস কার্টিয়াস, প্লিনী, সলিনাস, এরিয়ান, এঁদের কারোর বিবরণেই 'গঙ্গা' বা 'গঙ্গে' বন্দর নগরের উল্লেখ নেই। সুতরাং শুধুমাত্র টলেমি এবং 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থের উপর নির্ভর করেই বলা চলে না যে এই 'গঙ্গে' বা 'গঙ্গা' প্রথম থেকেই গঙ্গারিডিদের রাজধানী ছিল।

প্লিনী কালিঙ্গেয়ী তথা গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ীদের রাজধানীর নাম বলেছেন পার্থালিস। সুতরাং 'গঙ্গা' বা গঙ্গানগরের গঙ্গারিডি দেশের রাজধানী হওয়ার ব্যাপারটি অনেক পরের ঘটনা। দ্বিতীয়তঃ, এই 'গঙ্গা' বা 'গঙ্গে' নাম থেকেই বোঝা যায় যে নগরটি গঙ্গানদীর উপরেই কোথাও ছিল এবং নিঃসন্দেহে গঙ্গার অন্যতম সাগর মুখের কাছাকাছিই ছিল, যাতে বৃহৎ বাণিজ্যিক বন্দররূপে এর নির্দিষ্ট ভূমিকাটি পালন করতে সক্ষম হতো। সেই হিসেবেও ত্রিবেণী থেকে পূর্বগামিনী যমুনা অথবা কুমার নদীর মোহনায় এই গঙ্গা বন্দরের অবস্থিতি অলীক কল্পনা মাত্র !

হয়তো টলেমির মানচিত্রে 'গঙ্গে' বন্দরের অবস্থিতি এই বিভ্রান্তি সৃষ্টির মূলে। টলেমি 'কেম্বেরিখন' বলে গঙ্গার যে তৃতীয় মুখের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা কুমারিকা নদীর জলস্রোতবাহিত মুখ সন্দেহ নেই। কিন্তু 'গঙ্গে' বন্দরের সঙ্গে এই মুখের কি সম্পর্ক তা বোঝা যায় না এবং টলেমি এই তৃতীয় মুখে 'গঙ্গে' বন্দরের অবস্থিতির কথা কোথাও বর্ণনা করেন নি।

আর এই কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে টলেমির বর্ণনা অনুযায়ী যে নদীটি

গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গম থেকে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে কুমারিকা বা কুমারী নদীর মধ্য দিয়ে তৃতীয় মুখটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, সেই নদীটির নাম যমুনা।[৩০] সুতরাং এই তথাকথিত গঙ্গার তৃতীয় মোহনাই যে সেই মোহনা (বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়), টলেমি যার কাছে 'গঙ্গে' বন্দরের অবস্থিতি দেখিয়েছিলেন তাঁর মানচিত্রে, একথা বলা নিতান্তই কষ্টকল্পিত বলে মনে হয়।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে টলেমির মানচিত্রটি (India intra Gangem) প্রদর্শিত স্থানগুলির যথার্থ ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে বিশ্বাস-যোগ্য নয়। এই মানচিত্র থেকে একটি মোটামুটি ধারণা হয়, তার বেশী কিছু নয়। টলেমি তাম্রলিপ্তকে নির্দেশ করেছেন পাটলিপুত্রের নিকটেই। কিন্তু গঙ্গা নদীকে মানচিত্রে অনুসরণ করলে তাম্রলিপ্তের হওয়া উচিত পাটলিপুত্রের বেশ নীচে, সমুদ্রের কাছাকাছি, যদিও টলেমি দেখিয়েছেন তাম্রলিপ্তকে সমুদ্র থেকে অনেক উত্তর-পশ্চিমে! হয়তো 'টমোলিটি' বলতে টলেমি তাম্রলিপ্ত রাজ্যের কথাই বলতে চেয়েছেন, বন্দরের কথা বলেন নি। কারণ, সবই তো তাঁর শোনা কথা! তাম্রলিপ্ত বন্দর নিম্নবঙ্গে, অর্থাৎ, বঙ্গদেশের দক্ষিণপশ্চিমেই ছিল, প্রায় সাগর মোহনার কাছাকাছি। টলেমি দেখাতে ভুল করেছেন।

টলেমির মানচিত্র ও ভৌগোলিক তথ্যসমূহের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঃ—

"Ptolemy wrote a geographical account of India in the second century A. D. on scientific lines. His data being derived from secondary sources, he has fallen into numerous errors, and his general conception of the shape of India is also faulty in the extreme. Nevertheless the attempt was praiseworthy and has supplied valuable information······" (History and Culture of Indian People—Vedic Age-Foreign Accounts—by Bharatiya Vidya Bhavan)

এর বাংলা অনুবাদ করলে তার মোটামুটি এই রকম অর্থ হতে পারে—'টলেমি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভারতের একটি ভৌগোলিক বৃত্তান্ত লিখেছিলেন। তাঁর তথ্যগুলি প্রত্যক্ষ সূত্রে সংগৃহীত না হওয়ায়, তিনি বহু বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন এবং ভারতবর্ষের আকৃতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ত্রুটিপূর্ণ। তাহলেও তাঁর প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবি করতে পারে এবং সেই প্রচেষ্টা কিছু মূল্যবান সংবাদ সরবরাহ করেছে।'

অতঃপর প্রাসী ও গঙ্গারিডির যুগ্ম সামরিক শক্তি এবং রণসজ্জা সম্বন্ধে বৈদেশিক কাহিনীকারদের বিবরণের মধ্যে তারতম্যের বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে। এটা লক্ষ্য করা যায় যে সামরিক বাহিনীর আকারে এবং সংখ্যায় কিছু পার্থক্য থাকলেও, ডিওডোরাস, কুইণ্টাস কার্টিয়াস, প্লুটার্ক, প্লিনী প্রভৃতির বর্ণনায় একটি মূল সাদৃশ্য

আছে। সেই সাদৃশ্য হচ্ছে এই যে প্রাসী এবং গঙ্গারিডির এবং ইতিহাসগতভাবে মগধের রাজশক্তির স্থলসৈন্য-বাহিনীর চারটি বিভাগের কথাই বলা হয়েছে—যথা, পদাতিক, অশ্বারোহী, রথী এবং হস্তীবাহী।[৩২] কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের স্থলসৈন্যের বিবরণে এই চারটি বিভাগের কথাই বলা হয়েছে।

একথা অন্যত্র বলা হয়েছে যে ষ্ট্রাবোর বিবরণ থেকে জানা যায় যে প্রত্যেক রণ-হস্তীতে মাহুতকে বাদ দিয়ে তিনজন করে তীরন্দাজ থাকতো। এই কারণেই মগধের সেনা বাহিনীতে হস্তীবাহীর সংখ্যা তিন সহস্র থেকে নয় সহস্র পর্যন্ত বিবৃত হয়েছে। এই সংখ্যার সবচেয়ে বেশী নয় সহস্র (প্লিনী), তারপরে ছয় সহস্র (প্লুটার্ক), চার সহস্র (ডিওডোরাস) তিন সহস্র (কুইণ্টাস কার্টিয়াস)।[৩৩] এর থেকে ধারণা করা সঙ্গত যে তিন সহস্র রণহস্তীর অস্তিত্বই বোধহয় সমর্থনযোগ্য এবং প্লিনী অথবা প্লুটার্ক বোধহয় হস্তীবাহী সৈন্যের সঙ্গে হস্তীবাহিনীকে মিশিয়ে ফেলেছিলেন। ডিওডোরাসের চার সহস্রের মধ্যে গঙ্গারিডিদের রণহস্তীর পৃথক হিসাব থাকতে পারে, কারণ ডিওডোরাসের মতে গঙ্গারিডিই ছিল সবচেয়ে ক্ষমতাশালী এবং শ্রেষ্ঠ রাজ্য / দেশ।

প্লিনী এবং সলিনস (Solinus) পৃথকভাবে গঙ্গারিডির সামরিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, সে কথা আগেই বলা হয়েছে, এবং অন্য পরিপ্রেক্ষিতে পরেও উল্লিখিত হবে।

এইসব পরিসংখ্যানগত এবং বিবরণগত বিশ্লেষণ এবং অসঙ্গতি থেকে আরও একটি বিষয় স্বচ্ছ আলোকে প্রস্ফুটিত হয়। গাঙ্গারিডি এবং প্রাসীর পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক এবং পরস্পরের সামরিক শক্তি আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় থেকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত একই বিন্দুতে অবস্থান করে নি। মহাপদ্ম নন্দের এবং তাঁর শেষ বংশধরের সময়ে গঙ্গারিডির শক্তি ছিল তুঙ্গে, যে কারণে হয়তো ডিওডোরাস প্রমুখ কেউ কেউ বিদেশী লেখক গঙ্গারিডিকে অধিকতর প্রাধান্য প্রদান করেছেন।

কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মগধজয়ের পর থেকে যেমন মগধ তথা সমগ্র প্রাচ্য দেশ তথা প্রাসীর রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা বর্ধিত হয়েছিল[৩৪], মগধের সামরিক শক্তিও (যুগ্মই হোক অথবা এককই হোক) স্ফীত হয়েছিল। সেই তুলনায় গঙ্গারিডির সামরিক শক্তি হয়তো চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় থেকে এবং অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের পরে এবং পরবর্তী কালে কলিঙ্গরাজ খারবেলের আক্রমণের সময়ে (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) হ্রাস পেয়েছিল। অশোকের সময়ে অথবা কিছু আগেই হয়তো গঙ্গারিডি, কলিঙ্গীদের সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। অবশ্য, এ বন্ধন কলিঙ্গাধিপতি খারবেলের মগধ, বঙ্গদেশ প্রভৃতি আক্রমণের পরেও সংঘটিত হয়ে থাকতে পারে।

প্লিনী ও সলিনস এই সময়ে (চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও অশোকের সময় পর্যন্ত !) গঙ্গারিডির রণশক্তির পরিমাপ জানিয়েছেন। তাঁদের বিবরণের মধ্যে পার্থক্য নেই। তাঁরা বলেছেন গঙ্গারিডির রাজার রক্ষণাবেক্ষণ করতো ষাট সহস্র পদাতিক, এক সহস্র অশ্বারোহী এবং সাত শত হস্তী[৩৫]।

গঙ্গারিডি তথা সমুদ্র মোহনা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে রথবাহী কোন সৈন্যের অস্তিত্ব

ছিল না। অঙ্গদেশ থেকে শুরু করে প্রাগজ্যোতিষ পর্যন্ত রাজকীয় রণশক্তির প্রধানতম স্তম্ভ ছিল হস্তীবাহিনী, যার নিদর্শন আমরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিবরণ থেকে প্রচুরভাবে পাই। মগধে ও তার পশ্চিমের রাজ্যগুলিতে হয়তো পদাতিকের সঙ্গে অশ্বারোহী এবং রথীর প্রাচুর্য ছিল। নৌশক্তির উল্লেখ না থাকায়, মনে হয়, জলময় গাঙ্গেয় বদ্বীপ গঙ্গারিডিদের দেশের প্রধান অংশ ছিল না।

গ্রীক ও লাতিন লেখকগণ যে দেশকে প্রাসী বলেছেন, সেই দেশ বা ভূখণ্ড ছিল ভারতের পূর্বাঞ্চল। আর্যশাস্ত্রমতে আর্যাবর্তের গঙ্গা যমুনার সঙ্গম থেকে পূর্বসাগর পর্যন্ত ভূভাগ প্রাচ্য বা প্রাচ্যদেশ বলে পরিচিত ছিল। সুতরাং মহাপদ্ম নন্দ যখন সমগ্র প্রাচ্যদেশ জয় করে, প্রায় পঞ্চনদের তীর পর্যন্ত নিজের রাজ্য বিস্তার করেছিলেন, সেই সময় থেকেই আর্যাবর্তের কেন্দ্রীয় শক্তিকে বৈদেশিক বিবরণে প্রাসী তথা সমগ্র প্রাচ্যদেশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই কারণে, মগধে কেন্দ্রীভূত রাজশক্তি প্রাচী বা প্রাসী বলে চিহ্নিত হয়েছে।

সুতরাং প্রাচী বা প্রাসী (প্রাসিয়াই-Prasii)[৩৬] নামটি রাষ্ট্রবাচক হলেও জাতি-বাচক আদৌ নয়। বরং 'পলিবোথরী' নামটি (পাটলিপুত্রের লোকেদের অনেকে এই নামে ডাকতো—প্লিনী) সংকীর্ণভাবে ব্যবহৃত হলেও মগধের লোকেদের বুঝিয়ে থাকবে। এই নামের (পলিবোথরী) মধ্যে একটা জাতিগত ইঙ্গিত আছে, যেমন আছে গঙ্গারিডি (গঙ্গারিডাই)[৩৭] নামের মধ্যে। গঙ্গারিডির ক্ষেত্রে এটা একটা রাষ্ট্রও বটে, জাতিও বটে এবং এই রাষ্ট্রটিকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখন এই কথা বিচার্য যে মেগাস্থিনিস এবং আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সমসাময়িক গ্রীক সাক্ষ্যে যখন পূর্বভারতের অন্য কোন সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের নাম পাওয়া যাচ্ছে না, তখন প্রাচ্যের একমাত্র অন্য রাজ্য গঙ্গারিডির নামের উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কিনা! এই স্বতন্ত্র পরিচয়ের অর্থই হচ্ছে যে অন্যান্য প্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ রাজ্য, যথা, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, কাশী, কোশল, বৎস্য, বিদেহ প্রভৃতির নাম দেশীয় ধর্মগ্রন্থে ও সাহিত্যে এই সময়ে লোপ পেলেও, গাঙ্গারিডি রাজ্যের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়নি, যদিও গঙ্গারিডি এবং প্রাসী এই দুটি নাম শুধুমাত্র বৈদেশিক লেখকদের বিবরণেই লিপিবদ্ধ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হয় যে গঙ্গারিডি রাষ্ট্র বা দেশ আপন সহায়, সম্পদ এবং শক্তিতে ভাস্বর ছিল এবং রাজনৈতিক সূত্রে মগধের সঙ্গে জড়িত থাকলেও আভ্যন্তরীণভাবে স্বাধীন রাজ্য বলে বিবেচিত হতো।

অবশ্য এই অবস্থা ছিল আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সময়ে, যখন নন্দ রাজবংশের গঙ্গারিডিদের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন এবং রাজনৈতিক বন্ধন হয়তো ছিল। অনুমান করা যায় যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রবল পরাক্রম এবং সামরিক শক্তির দ্বারা বশীভূত গঙ্গারিডিরা পরোক্ষভাবে প্রাসী তথা মগধ সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন বলে পরিগণিত হয়েছিল[৩৮]। চন্দ্রগুপ্তকে কোথায়ও গঙ্গারিডিদের রাজা বলা হয় নি, সুতরাং এই কথাই মনে করা সঙ্গত যে মগধ তথা প্রাচ্য সাম্রাজ্যের অধিপতিরূপে তিনি সম্পূর্ণভাবে না হলেও আংশিকভাবে গঙ্গারিডিকে শাসন করেছিলেন।

আরও উল্লেখ করার বিষয় এই যে আমরা লক্ষ্য করি যে পরবর্তী কালে অর্থাৎ মৌর্যোত্তর যুগে মালব, থানেশ্বর, কনৌজ, গৌড় প্রভৃতি রাজ্যের অভ্যুদয় হয়েছে। কিন্তু খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রীক লাতিন ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক প্রভৃতিদের সাক্ষ্যে আমরা গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের নাম পাই, তাদের রাজধানীর নাম পাই এবং গঙ্গারিডি যে মগধ সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, এ' কথাও বুঝতে পারি। প্লিনীর বিবরণ অনুযায়ী এর মধ্যে গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ী বলে একটা যৌথ শক্তি অথবা রাজ্যের আবির্ভাব ঘটেছে বলে জানা যায়। কিন্তু টলেমির গঙ্গারিডি বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় যে কলিঙ্গরাজ খারবেলের আক্রমণের পরে গঙ্গারিডির সীমানা সংকুচিত হয়েছিল।

দুটি প্রতিবেশী রাজ্যের এই রাজনৈতিক যোগসূত্রের বর্ণনা থেকে এই কথা সহজেই অনুমেয় যে গঙ্গারিডি এবং কলিঙ্গ উভয় রাজ্যই সম্রাট অশোকের পরে মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনতার পাশ কেটে ফেলেছিল। দেশের রাজনৈতিক পটভূমিকার দ্রুত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে, গঙ্গারিডি এবং কলিঙ্গ তাদের জাতিগত, সংস্কৃতিগত এবং ভাষাগত সাদৃশ্যের ফলে[৪০] যুগপৎ আত্মরক্ষা এবং হয়তো আত্মস্ফীতির জন্যও এক শিথিল যুক্তরাষ্ট্রীয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল।

ভুবনেশ্বরের কাছে হাতি (গুম্ফা) গুহায় ক্ষোদিত লিপি থেকে জানা যায় যে খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে কলিঙ্গরাজ দ্বিতীয় খরাবেল, মহাপদ্ম নন্দের কলিঙ্গ আক্রমণের প্রতিশোধস্বরূপ, বার বার মগধ, পুণ্ড্র, রাঢ় প্রভৃতি দেশে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করে সকল অভিযানেই সফল হয়েছিলেন। মগধে তখন শুঙ্গবংশীয় ব্রাহ্মণ রাজারা ক্ষমতায় আসীন, কিন্তু মৌর্য সাম্রাজ্যের অনেক অংশই তাঁদের অধিকারচ্যুত হয়েছিল।

সুহ্ম, অথবা জৈনশাস্ত্র অনুযায়ী লাল বা লাঢ় (রাঢ়) দেশের কতকাংশ কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং পূর্ব সমুদ্রের নিকটবর্তী তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) কলিঙ্গদের কবলিত হয়েছিল[৪১]। অন্ধ্রদেশীয় সাতবাহনদের মগধ অধিকারের যুগে (খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী) গঙ্গারিডি তাদের স্বাধীনতা হারিয়েছিল বলে মনে করা যেতে যেতে পারে। কিন্তু সাতবাহনদের সে আধিপত্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি।[৪২]

এখন প্রশ্ন এই যে এই গঙ্গারিডি রাজ্য ও জাতির সঠিক পরিচয় কি? গঙ্গারিডিই জাতি যে প্রাচীন বাঙ্গালী জাতি অথবা বৃহত্তর বাঙ্গালী জাতির একটি অংশ, তা বলাই বাহুল্য। যখন আমরা গঙ্গারিডি দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কথা মনে মনে কল্পনা করি, তখন গঙ্গারিডি যে বাঙ্গালী জাতি, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশই থাকে না। গ্রীক ও লাতিন ভারতসন্ধানী পণ্ডিতবর্গ যখন প্রাসী এবং গঙ্গারিডি পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন, তখন এই গঙ্গারিডি যে প্রধানতঃ নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় বা গাঙ্গেয় সমতলভূমিতে সাগর মোহনা পর্যন্ত গঙ্গা-ভাগীরথীর দুই উপকূলস্থ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, সে বিষয়ে প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

মেগাস্থিনিস-নির্ভর ডিওডোরাসের বিবরণ থেকে এই কথা জানা যায় যে গঙ্গা (নদী) গাঙ্গেয়দের (গঙ্গারিডিদের?) পূর্বসীমা ছিল। সুতরাং সম্পূর্ণ রাঢ় দেশ

এই গাঙ্গেয় অথবা গঙ্গারিডি দেশের অন্তর্গত ছিল। গ্রীকগণ বর্ণিত গঙ্গারিডিরা স্বদেশে গঙ্গারাঢ়ী বলে পরিচিত ছিল, যেমন ষ্ট্রাবোর বিবরণ অনুসারে বৃহত্তর পাটলিপুত্র অথবা মগধের অধিবাসীরা "পলিবোথরী" পদবীতে অভিহিত হয়েছিল।[৪৩]

সুতরাং এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে সেই সময়ের বৈদেশিক পণ্ডিত ও লেখকদের বিবরণে এই গঙ্গারাঢ়ী শব্দটিই গঙ্গারিডই বলে বর্ণিত হয়েছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার তাঁর "পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত" গ্রন্থে গঙ্গারাঢ় থেকে গঙ্গারিডি শব্দের উৎপত্তির যুক্তি সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু যে হেতু আমরা লক্ষ্য করেছি যে রাঢ় নামটি বেশ প্রাচীন, সেই হেতু অনেক পণ্ডিত এবং ঐতিহাসিক যে অনুমান করেছেন গঙ্গারিডি নামটি গ্রীকেরা নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় অবস্থিত রাঢ়দেশের অধিবাসীদের নাম অনুসারেই প্রয়োগ করেছিলেন, তা একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। এই সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ রাধা কুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ অতুল সুর, রজনীকান্ত গুহ, সতীশচন্দ্র মিত্র, শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতি পণ্ডিত এবং ইতিহাসবিদদের মন্তব্য উপেক্ষণীয় নয়।

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসও গঙ্গারাঢ় জনপদকে 'গণ্ডারিডি নামে উল্লেখ করেছিলেন'—এ কথা বলেছেন "দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা", গ্রন্থে শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই গণ্ডারিডি অভিধাটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের অনুমান 'বিদেশীদের উচ্চারণের ত্রুটিবশতঃ বঙ্গ বা বঙ্গা নামের জায়গায় গঙ্গা এসেছে' (গঙ্গারিডি, ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ পৃঃ ১৪১) আদৌ বিবেচনাযোগ্য নয়।

আধুনিক কয়েকজন যশস্বী ঐতিহাসিকদের এবং বিশেষভাবে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের (বাঙ্গালীর ইতিহাস) অভিমত যে প্রাসী অথবা প্রাচ্য দেশের পূর্বসীমা ছিল গঙ্গা—তা কখনই হতে পারে না। রাঢ়দেশ গঙ্গারিডির অন্তর্ভুক্ত ছিল, সুতরাং ডঃ রায়ের এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ এবং যুক্তিহীন। গ্রীক বিবরণ অনুযায়ী প্রাসীদেশ ছিল গঙ্গারীডির পশ্চিমে, সেই কারণে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের সিদ্ধান্ত যে প্রাসী-এবং গঙ্গারিডি, দু'দেশই গঙ্গার পূর্ব উপকূলে ছিল, গুরুতরভাবে ভ্রান্তিপূর্ণ এবং সঙ্গতিবিহীন।[৪৪] এই সিদ্ধান্ত ভৌগোলিক বিবেচনার দিক থেকেও সমর্থনীয় নয়। কারণ, তাহলে দক্ষিণ বিহারের অন্তর্গত পাটলিপুত্রসহ মগধদেশকে গঙ্গার উত্তরে / পূর্বে বলে কল্পনা করতে হয়। প্রাচীন মগধ সম্বন্ধে জানা যায় 'In 400 B. C. Magadha Consisted of Monghyr, Bhagalpur, Gaya, Patna, Sahabad districts'. আরও জানা যায়, 'Magadha was bounded on the north by the Ganga, on the west by the Son, while the hilly forests of the South formed the southern boundary. The eastern boundary is somewhat indefinite...' (Bihar through the Ages—R. R. Diwakar.)

বঙ্গদেশের অস্তিত্বের কথা মহাভারতেও পাওয়া যায়। "মহাভারতে কর্ণ, কৃষ্ণ,

ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গেও বাংলার অনেকগুলি কৌমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়" (বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়)। পুণ্ড্ররাজ বাসুদেব কৃষ্ণের হাতে নিহত হয়েছিলেন। মহাভারতে পৌণ্ড্রক বাসুদেব বিশেষ বিক্রমশালী এবং কীর্ত্তিমান নরপতি। পাণ্ডবসুহৃদ কৃষ্ণ মগধরাজ জরাসন্ধের সঙ্গে পুণ্ড্রাধিপতির মৈত্রীর বন্ধনকে পাণ্ডবদের শঙ্কার কারণ বলে গণনা করেছিলেন। জরাসন্ধের মৃত্যুর পরে অঙ্গাধিপতি কর্ণ—কলিঙ্গ, অঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও বঙ্গকে এক সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধীনে এনেছিলেন।[৪৫] ভীমের দিগ্বিজয়ের ফল স্বরূপ পুণ্ড্র এবং বঙ্গ পাণ্ডবদের অধীনতা স্বীকার করেছিল। কিন্তু কুরুক্ষেত্র মহারণে বঙ্গরাজ সমুদ্র সেন কৌরব পক্ষাবলম্বন ক'রে সাহসিকতা এবং শৌর্য্যের সঙ্গে কুরুপতি দুর্য্যোধনের সহায়তা করেন।

সুতরাং মহাভারত ও পুরাণ অনুযায়ী সমগ্র বঙ্গভূমি পুণ্ড্র (উত্তরবঙ্গ), সুহ্ম (গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্ত্তী রাঢ়দেশ) বঙ্গ (গঙ্গার পূর্ব তীরবর্তী এবং দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত) প্রভৃতি খণ্ডিত নামে বর্ণিত হয়েছিল। বঙ্গভূমি এইভাবে বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত থাকলেও, বঙ্গদেশবাসী ছিল স্বাধীনতাকামী, উদ্যমশীল এবং যোদ্ধৃ-ভাবাপন্ন। মৌর্যদের আগে এবং পরে যে গঙ্গারিডি বা গাঙ্গেয়দের বিষয়ে বিদেশী লেখকগণ উল্লেখ করেছেন, তাদের দেশ যে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সে কথাও কেউ কেউ বলেছেন (প্লিনী প্রভৃতি)। বঙ্গে অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে সেই সময়ে কোন উল্লেখ-যোগ্য সমুদ্র বন্দরের সন্ধান না পাওয়া গেলেও, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে তাম্রলিপ্ত যে সেই সময় থেকেই পূর্বভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সমুদ্র-বন্দর বলে পরিগণিত হতো, সে কথা কারোরই অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশসহ সম্পূর্ণ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ যে গঙ্গারিডি বলে পরিচিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ অল্পই।

শুধুমাত্র গঙ্গার মোহনাদেশে গঙ্গারিডিরা অবস্থান করতো, এ কথা বোধ হয় একমাত্র টলেমি ছাড়া আর কেউই বলেন নি। 'এই নদীর শেষভাগ এই দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে' (প্লিনী), বলার অর্থ কখনই এই নয় যে গঙ্গারিডি জনগোষ্ঠী বা জাতি শুধু গঙ্গার মোহনায় বাস করতো। আরও নয় এই কারণে যে বিদেশীরা গঙ্গারিডিকে জনবহুল ভূভাগ বলে বর্ণনা করে গেছেন। আড়াই হাজার বছর আগে গঙ্গার মোহনায় অর্থাৎ সুন্দরবন অঞ্চলে বসবাসকারী লোক খুব বেশী ছিল, এমন অনুমান করা সঙ্গত নয়। একমাত্র নিম্নবঙ্গে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় উপত্যকাই সেই সময়ে জনবহুল ছিল এবং বৈদেশিক লেখকদের (প্লুটার্ক) বর্ণনায় অনেকগুলি জাতির সংমিশ্রণে গঠিত গঙ্গারিডি জাতি সেইখানে অধিষ্ঠান করতো।[৪৬]

গঙ্গারিডি দেশটিই যে নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকার সাগর মোহনা পর্যন্ত সম্পূর্ণ দেশ এবং প্রাসী যে শুধুমাত্র, রাষ্ট্রের নাম—এই যুক্তির শক্তিশালী সমর্থন পাওয়া যায় এই উক্তির মধ্যে—'Greek historians refer to the kingdom of the Naudos as that of the Gangaridai and Praisiai. The first of these terms probably refers to the territory of the Ganga valley and the

second to the Kingdom of the east' (Bihar through the Ages —R. R. Diwakar)

কালিদাসের "রঘুবংশের" বঙ্গদের বর্ণনাও আলোকজাণ্ডারের যুগের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণযোগ্য নয়। কালিদাসের বর্ণনা অনুযায়ী রঘু সুহ্মদেশ অতিক্রম করে উপবঙ্গে এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেই বর্ণনার সঙ্গে টলেমির গঙ্গার মোহনার (পাঁচটি মুখ) অধিবাসীদের বর্ণনার তুলনা করে গাঙ্গেয় বৃহত্তর বদ্বীপ অথবা উপবঙ্গকে গঙ্গারিডি বলা নিছক কল্পনা মাত্র! কারণ, কালিদাসের রঘু বাঙ্গালী নৌবহরের সম্মুখীন হয়েছিলেন গঙ্গার বদ্বীপ থেকে সমুদ্র পর্যন্ত ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে। বঙ্গের যে অংশ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত, সেই অংশ অবশ্যই গঙ্গারিডি সংজ্ঞার মধ্যে নিহিত ছিল, যদিও টলেমির বর্ণনায় সুহ্মদেশও গঙ্গারিডির মধ্যে ছিল বলেই বোঝা যায়। কালিদাস (খৃষ্টীয় ৪র্থ শতক) সমুদ্রগুপ্ত অথবা বড় জোর অশোকের বঙ্গদেশ অভিযানের রূপরেখার উপর কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন।

প্রাসী এবং গঙ্গারিডি, এই দুই শব্দের দ্বারা গ্রীকও লাতিন লেখকেরা সেই প্রাচীন যুগে প্রাচ্য ভারতের প্রায় সম্পূর্ণ অংশটিকে নির্দেশ করেছেন। রাজনৈতিক বিভাগ হিসেবে একটি হচ্ছে সম্প্রসারিত মগধরাজ্য যাদের সার্বভৌম অবস্থা এবং আয়তনকে মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্রে এসে প্রত্যক্ষ করে ছিলেন। অপরটি, অর্থাৎ গঙ্গারিডি ছিল গঙ্গাভিত্তিক রাষ্ট্র যেটি বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ) পুন্ড্র (উত্তরবঙ্গ) হতে পৃথক। এই দুটি নামই ভারতবর্ষের সকল প্রান্তেই বহু আগেই পরিচিত ছিল। গঙ্গারাষ্ট্র উত্তরপশ্চিম বঙ্গ থেকে আরম্ভ করে গঙ্গার মূল ধারার দু পাশে অর্থাৎ ভাগীরথীর দু উপকূল অধিকার করে সাগর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই দেশের মধ্য দিয়েই গঙ্গা নদী সাগরে মিলিত হয়েছিল।

সুতরাং অনুমান করা যায় যে বিদেশী বর্ণিত গঙ্গারিডি গঙ্গা-রাঢ় তথা গঙ্গাভিত্তিক রাঢ়দেশসহ দুই তীরবর্তী অঞ্চল, যার প্রথম যুগে রাজধানী ছিল পার্থালিস (পূর্বস্থলী বা বর্ধমান) এবং পরবর্তী যুগে 'গঙ্গে' বা গঙ্গানগর (হয়তো পাণ্ডুয়া-গাঙপুর-সপ্তগ্রাম প্রভৃতি), যে সব স্থান সেই প্রাচীন যুগে সমুদ্রের মোহনা থেকে দূরে ছিল না। প্রাসী এবং গঙ্গারিডি সেই প্রাচীন যুগের বৃহত্তর বিহার যা মধ্য-প্রাচীন যুগের শেষভাগে গৌড় রাজ্যের স্বর্ণ যুগের সময়ে বৃহত্তর বঙ্গে পরিণত হয়েছিল। বৃহত্তর বিহার অর্থাৎ তদানীন্তন মগধ দেশের (প্রাসী) সঙ্গে বঙ্গভূমির (গঙ্গারিডি) ভাষা এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিশেষ ঘনিষ্ঠ। এই প্রসঙ্গে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের ঐতিহাসিক মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য ঃ—

"বঙ্গদেশের শিক্ষার দীক্ষার মূল প্রস্রবন এই গঙ্গার আদি উৎস হরিদ্বারস্বরূপ মগধ কেন্দ্রস্থলে বিরাজিত ছিল ; মগধের উচ্চশিক্ষা, মগধের শিল্পকলা, সমস্তই উত্তরকালে পূর্ব দিক আশ্রয় করিয়া গৌড়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। মগধকে বাদ দিয়া বাঙ্গালীর ইতিহাস রচনা করা চলে না। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলার ইতিহাসে মগধকে বাদ দেন নাই।"[৪৮]

ব্রিটিশ যুগে এবং বর্তমান সময়েও পূর্ব বিহারে বহু সংখ্যক বঙ্গ ভাষাভাষীর বাস, বিহারে প্রাক্তন যুগে এই বাঙ্গালী আধিপত্যের প্রমাণ। সেই তুলনায় বঙ্গদেশে (কলিকাতা এবং শিল্পাঞ্চল ভিন্ন) বিহারের হিন্দী ভাষাভাষী লোকেদের চিরস্থায়ী বাস অনেক কম। অধিকাংশই জীবিকা অন্বেষণে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত যাদের কিছু অংশ স্থানে স্থানে ভূমিহীনভাবে উপনিবেশিত হয়েছে। ক্রমে ক্রমে ব্যবসায় ও শিল্পের আশ্রয় করে শহরাঞ্চলে ভদ্রাসন নির্মাণ করে স্থায়ী বাসিন্দা বলে পরিগণিত হয়েছে।

বাঙ্গালী যে বিভিন্ন গোষ্ঠী (কৌম) থেকে কবে এক জাতিতে পরিণত হয়েছিল সে সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু মন্তব্য করা কঠিন। তবে মনে হয় গ্রীক ও লাতিন গ্রন্থকারদের বিবরণে যে গঙ্গারিডি নাম পাওয়া যায়, তা সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকেই নির্দেশ করে থাকবে। যদিও বিদেশীরা তাঁদের বর্ণনায় গঙ্গার পশ্চিম দিক সহ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের সীমাতেই গঙ্গারিডিকে স্থাপন করেছিলেন বলেই প্রতিভাত হয়, তথাপি এমন মনে করাই যুক্তিসঙ্গত যে মৌর্য সাম্রাজ্য পত্তনের আগেই গঙ্গারিডির সীমা গঙ্গার উভয় তীরস্থ ভূভাগকে আলিঙ্গন করে সাগর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

এই কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে গঙ্গারিডির সীমা আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বের সূচনায় যা ছিল, টলেমির বর্ণনা অনুযায়ী খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে তার অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ছিল। কলিঙ্গাধিপতি খারবেলের বঙ্গদেশ বিজয়ের পরে পর্যন্ত গঙ্গারিডি দেশ কালিঙ্গেয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং মগধের সঙ্গে তার বন্ধন ছিন্ন না হলেও প্রায় তাৎপর্যবিহীন। কুষাণ যুগের স্বর্ণমুদ্রা বঙ্গদেশে পাওয়া গিয়েছিল। এর থেকে অনুমান করা যায় যে কুষাণ যুগে বাঙ্গালী তার স্বাধীনতা হারিয়েছিল।

সেই সময় থেকে গুপ্তযুগের আগে পর্যন্ত বঙ্গদেশের বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে কয়েকটি স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিবর্তিত হয়। সেই খণ্ডিত দেশ ও জাতিকে পুনরায় একত্রিত করেছিলেন মহারাজ শশাঙ্ক, তাঁর গৌড় রাজ্য প্রবর্তনে, যার রাজধানী ছিল গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী কর্ণসুবর্ণ। শশাঙ্কের গৌড় রাষ্ট্রের মধ্যেই গ্রীক অভিহিত গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের ছায়াটি প্রতিফলিত হয়েছিল, যদিও খৃঃ তৃতীয়/চতুর্থ শতাব্দী থেকে গঙ্গারিডির নাম আর কোথায়ও পাওয়া যায় না।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সংস্কৃতভাষা (বঙ্গদেশের আর্যীকরণের পরে) অভিজাত ও শিক্ষিতদের ভাষা, যদিও মাগধী প্রাকৃত থেকে তখনই বাংলা ভাষার সূচনা হয়ে গেছে। তখন থেকেই বাঙ্গালীর জাতীয়তার জয়যাত্রা। গঙ্গারিডির পরে এবং শশাঙ্কের পরে পাল যুগে বাঙ্গালী প্রায় সর্বভারতীয় ভাবমূর্তি অর্জন করেছিল। সংস্কৃতের গৌড়ীয় রীতি, পঞ্চগৌড়ের সৃষ্টি প্রভৃতি বাঙ্গালীর স্বর্ণযুগের শেষ চিহ্নগুলি সেন রাজত্বের অবসানে বৈদেশিক (মুসলিম) আক্রমণকারীর অতর্কিত এবং নিষ্ঠুর আঘাতে সমাধিলাভ করেছিল। হিন্দু বাঙ্গালীর রাজনৈতিক গরিমা এবং শ্রেষ্ঠত্বের যুগের, গঙ্গারিডির অবলুপ্তি থেকে এক হাজার বছরের মধ্যে অবসান হয়েছিল।

বৈদেশিক লেখকদের দ্বারা বর্ণিত প্রাসী, গঙ্গারিডি, কালিঙ্গেয়ী প্রভৃতি দেশ ও জনগোষ্ঠী সেই শাশ্বতঃ ঐতিহাসিক সত্যেরই পুনরাবৃত্তি করে যে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ-একসূত্রে গ্রথিত। বলাই বাহুল্য, এখানে অঙ্গ বিহার, বঙ্গ বাংলা এবং কলিঙ্গ উড়িষ্যাকেই নির্দেশ করে।

নির্দেশিকা

১। হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস —বিধুভূষণ ভট্টাচার্য।
২। বাংলার ইতিহাস —ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।
"(মহাপদ্মের মনিভদ্র ও পুণ্যভদ্র দুই সেনাপতি ছিল। পুণ্ড্রনগরের ফটকের দুই পার্শ্বে এই দুই যোদ্ধার প্রস্তরমূর্তি স্থাপিত ছিল। ইঁহারা যক্ষ বলে আগে পূজিত হতেন—Vide, History of the Ajivikas —Mr. B. M. Barua)"
৩। বাংলা দেশের ইতিহাস —ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।
৪। সিংহলীয় প্রাচীন কাহিনী—পালিভাষায় লিখিত 'মহাবংশ' অনুযায়ী।
৫। The Early History of Bengal —F. J. Monahan.
Classical Accounts of India (Pliny) Dr. R. C. Majumdar. P. 342
৬। The Early History of Bengal —F. J. Monahan.
৭। The Early History of Bengal —Promode Lal Pal.
৮। Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal (Pre Muhammedan epochs) —Benoy Chandra Sen.
৯। Early History of India —V. A. Smith.
১০। বাণিজ্যে বাঙ্গালী—একাল ও সেকাল —সুভাষ সমাজদার।
১১। বাংলা দেশের ইতিহাস —ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।
১২। Classical Accounts of India—(Diodorus Siculus) —Dr. R. C. Majumdar. P. 172
১৩। Do Do Do Do P. 234
১৪। History of Ancient Bengal (Prehistoric Period) —Dr. R. C. Majumdar.
১৫। Classical Accounts of India—(Plutarch)—Dr. R. C. Majumdar. P. 198
১৬। Classical Accounts of India—(Q. Curtius Rufus)—Dr. R. C. Majumdar. P. 129
১৭। Classical Accounts of India (Pliny)—Dr. R. C. Majumdar. P. 342

১৮। Do Do Do —Do Do P. 341

১৯। Do Do Do —Do Do Do

২০। Do Do Do —(Strabo) Do P. 249

২১। Do Do Do —(Arrian) Do P. 224

২২। Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal (Pre Muhammedan epochs) —Benoy Chandra Sen.

২৩। Classical Accounts of India—(Ptolemy)—Dr. R. C. Majumdar. P. 375

২৪। Do Do Do —(Pliny) Do P. 350

২৫। The Early History of Bengal —F. J. Monahan.

২৬। Classical Accounts of India (Geography of Strabo) —Dr. R. C. Majumdar.

২৭। History of Ancient Bengal —Dr. R. C. Majumdar.

২৮। Do Do Do

২৯। History of Ancient Bengal —Dr. R. C. Majumdar.

৩০। Do Do Do Do

৩১। Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal (Pre-Muhammedan epochs) — Benoy Chandra Sen.

৩২। Classical Accounts of Ancient India —Dr. R. C. Majumdar.

৩৩। Do Do Do Do

৩৪। Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal (Pre-Muhammedan epochs) —Benoy Chandra Sen.

৩৫। Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian —J. W. Mccrindle P. 138, P. 160.

৩৬। ডিওডোরাসের—(প্রাইসোই, প্রেসিওই অথবা প্রেইসিওই), কুইণ্টাস কার্টিয়াসের (ফাররাসী), প্লুটার্কের (প্রাইসিওই), ষ্ট্রাবো প্লিনী এবং এরিয়ানের (প্রাসী) ব্যবহৃত নামের বিভিন্ন পাঠগুলির তাৎপর্য্য বস্তুতঃ এক এবং অভিন্ন।

৩৭। ডিওডোরাসের (গণ্ডারিডাই), প্লুটার্কের (গণ্ডারিটাই), প্লিনী, কুইণ্টাস কার্টিয়াস এবং টলেমির (গঙ্গারিডাই গঙ্গারিডি) নামগুলির তাৎপর্য্য এক এবং অভিন্ন।

৩৮। বাংলার ইতিহাস —রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৯। 'The middle country (Madhyadesa or Aryavarta) was the cradle on which the Brahminical Aryans or the

Buddhists staged the entire drama of their career'—
Historical Geography of Ancient India (Introduction)
—Dr. B. C. Law.

৪০। বঙ্গভূমিকা —ডঃ সুকুমার সেন।
৪১। বাংলার ইতিহাস —রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪২। গৌড় কাহিনী —শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ।
৪৩। Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian
—J. W. Mccrindle. P. 141.
৪৪। The History of Ancient Bengal —Dr. R. C. Majumdar.
৪৫। History and Culture of Bengal —Dr. A. K. Sur.
৪৬। বাণিজ্যে বাঙ্গালী—একাল ও সেকাল —সুভাষ সমাজদার।
৪৭। বঙ্গভূমিকা —ডঃ সুকুমার সেন।
৪৮। বৃহৎবঙ্গ (প্রথম খণ্ড) —ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন।

গঙ্গারিডির ভৌগোলিক সীমা ও জাতিতত্ত্ব

মহাভারতের বনপর্ব থেকে জানা যায় যে যুধিষ্ঠির কৌশিকী তীর্থে (বর্তমান রাজমহলের কাছাকাছি) এসে গঙ্গাসাগর তীর্থ দেখেছিলেন এবং সাগর উপকূল দিয়ে দক্ষিণে এগিয়ে সমুদ্রের তীরবর্তী কলিঙ্গ দেশে সদলবলে প্রস্থান করেছিলেন। যুধিষ্ঠির কৌশিকী তীর্থের কত কাছাকাছি সমুদ্র দেখেছিলেন, অনুমান করা কঠিন।

কবি কলহণের "রাজতরঙ্গিনী" (খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী) অনুসারে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য যখন গৌড়ে আসেন, তার পরেই ছিল সমুদ্র।[1] কালিদাসের 'রঘুবংশের' বর্ণনায় মনে হয় বাংলার মধ্যভাগে ভাগীরথী-গঙ্গা প্রবাহিত হতো এবং তার পূর্বদিকে জলের মধ্যে বড় বড় দ্বীপ ছিল। এই দ্বীপগুলির সমষ্টিই ছিল কালিদাস (খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী) নির্দিষ্ট বঙ্গ, যেখানকার অধিবাসীরা নৌযুদ্ধে পারদর্শী ছিল এবং রঘুর আক্রমণের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে এসে সমতটের দক্ষিণে সমুদ্র দেখেছিলেন এবং সমতট থেকে তাম্রলিপ্তিতে তিনি জলপথে এসেছিলেন। পণ্ডিতদের অভিমত এই যে সমতট হলো ঢাকা জেলার উত্তরাংশের নাম। অর্থাৎ, বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ অংশ ছিল সমুদ্রের গর্ভে। একালের ভূতত্ত্ববিদরা মনে করেন যে আনুমানিক এক হাজার বছর আগে বঙ্গের দক্ষিণাংশ সমুদ্রের গর্ভ থেকে জেগে উঠেছে। তাঁরা মনে করেন যে সমুদ্রের স্রোত রাজমহল পর্যন্ত প্রবাহিত হতো আর গঙ্গাসাগর ছিল গৌড়ের কাছাকাছি।[2]

"পালপূর্ব যুগের বংশানুচরিত" গ্রন্থে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার ভাগীরথী নদীর সম্বন্ধে এক কিম্বদন্তীর উল্লেখ করেছেন—'এক সময়ে নাকি দেবীকোট অর্থাৎ দিনাজপুর জেলার বাণগড় পর্যন্ত পূর্ব সমুদ্র বিস্তৃত ছিল এবং সেটাই ছিল আর্যাবর্তের পূর্ব সীমা।'

সেই প্রাচীন যুগে দেশের ভৌগোলিক অবস্থাটি নির্ণয় করার প্রচেষ্টায় এই সকল উক্তিগুলির তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক আকৃতিটি কল্পনা করার পক্ষে অন্য আর একটি উক্তিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—'সেদিনের পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমপ্রান্তে পাহাড়-লাগোয়া জেলাগুলো ছাড়া নদীয়া, হাওড়া, হুগলী ও চব্বিশপরগণার বদ্বীপ অংশটা সমুদ্রের নীচে ছিল। গঙ্গানদী যেখানটায় বঙ্গভূমিতে প্রবেশ করেছে সেখানে এখনকার ভাগীরথী মোহনার কাকদ্বীপ, সাগরদ্বীপের মতো দ্বীপ প্রচুর ছিল।' (অজানা বঙ্গকে জানো—সঞ্জয় ভট্টাচার্য)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত পুণ্ড্র ও বঙ্গ এই দুটি জাতি অথবা দেশের অবস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গঙ্গার পশ্চিম তীরের দক্ষিণ পুণ্ড্র, আরও দক্ষিণে অবস্থিত রাঢ় দেশ এবং ভাগীরথী-গঙ্গার পূর্ব তীরে অবস্থিত বঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগের (চব্বিশপরগণা, খুলনা) তদানীন্তন গঠিত অংশ সহ সমগ্র ভূখণ্ডটি গঙ্গারিডি বলে অভিহিত হয়েছিল,

মনে করা যেতে পারে। কারণ, এই কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে সেই প্রাচীন যুগে পূর্ববঙ্গের দক্ষিণ ও পূর্ব দিককে স্পর্শ করে সমুদ্র অবস্থান করছিল।[৩]

এই সম্পর্কে "গৌড়ের ইতিহাস" (রজনীকান্ত চক্রবর্তী) গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—'মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থ আলোচনা করলে বোধ হয়, বর্তমান ময়মনসিংহের সমতলাংশ, পাবনা, রাজসাহী, নোয়াখালী, যশোহর প্রভৃতি জেলা পূর্বে কালে সমুদ্রমগ্ন ছিল।...বঙ্গদেশের পার্শ্বদেশ দিয়া হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল। এই সমুদ্রকে লৌহিত্য বা লোহিত সাগর বলিত।' লৌহিত্য বলতে বর্তমান ব্রহ্মপুত্র নদকেই বোঝায়।

মহাভারতের সাক্ষ্য অনুযায়ী তাম্রলিপ্ত একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। পরবর্তীকালে অর্থাৎ পৌরাণিক যুগের শেষে এখানে প্রথমে জৈন ধর্ম এবং পরে বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটে। সেই সময়ে এবং অন্ততঃ মহাপদ্ম নন্দের রাজত্বকাল পর্যন্ত, তাম্রলিপ্ত সুহ্মদেশের প্রধান শহর ও রাজধানী এবং পূর্বভারতের প্রধান বন্দর ছিল। পৌরাণিক বিবরণে এখানে ধ্বজ বংশীয় রাজাদের শাসনের কথা পাওয়া যায়। ভৌগোলিক প্লিনীর বিবরণের মধ্যেও তালুক্তৈয়ী বলে একটি জনপদের উল্লেখ আছে।[৪] টলেমির মানচিত্রে 'তামালিটেস' (Tamalites) অবস্থানগতভাবে অনেক উপরে দেখানো হলেও, পুরাণে তাম্রলিপ্ত গাঙ্গেয় বন্দররূপে নির্দিষ্ট হয়েছে।

তাম্রলিপ্ত রাঢ়বঙ্গের অন্তর্গত। রাঢ়দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি আরও প্রাচীনকাল পর্যন্ত প্রসারিত। পাণ্ডুরাজার ঢিবি প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে এই ধারণা আরও শক্তিশালী হয়েছে। বস্তুতঃ কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, স্বামী শংকরানন্দ প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন যে প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য অনুযায়ী মহেন-জো-দারো এবং হরপ্পার, তথা সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার সঙ্গে রাঢ়বঙ্গে আবিষ্কৃত সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক নিদর্শনের গভীর সংযোগ আছে।

এই প্রাক-আর্য দ্রাবিড় সভ্যতা যে পশ্চিমবঙ্গের প্রাগৈতিহাসিক যুগের গঙ্গারিডিদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎসস্থল, সে বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনার অবকাশ আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে বঙ্গদেশে দ্রাবিড় সভ্যতার উন্মেষের আগে আরও অন্ততঃ দুটি জাতির, যথাক্রমে নিগ্রোবটু এবং আদি-অস্ত্রাল জাতির, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভ্যুদয় হয়েছিল।

কোন কোন নৃবিজ্ঞানীর মতে বাংলার সবচেয়ে পুরানো মানুষেরা ছিলেন অস্ট্রিক জাতীয় অস্ট্রো-এশিয়াটিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত। সে সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা হবে। ইতিমধ্যে অন্য একটি মত অনুসারে, "তাঁরা ব্রহ্মদেশ ও শ্যামদেশের 'মোন' এবং কম্বোজের (উত্তর ইন্দোচীনের 'ক্ষ্মের' শাখার মানুষের আত্মীয়। এ জাতীয় মানুষকেই বোধ হয় বলা হতো 'নিষাদ' কিম্বা নাগ ; আর পরবর্তীকালে কোল্ল ভিল্ল ইত্যাদি" (বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালীর সাহিত্য, প্রথম খণ্ড—গোপাল হালদার)।

প্রায় দু-হাজার বছর আগে উত্তর থেকে মঙ্গোলীয় বা ভোটচীন জাতীয় অর্থাৎ

'কিরাত' জাতীয় লোকেরা বাংলায় এসেছিল। মেছ, কাছারি, চাকমা, এবং কোচ জাতির লোকেরা এদের বংশধর (বঙ্গসংস্কৃতির কথা—প্রসিত রায় চৌধুরী)।

অনেকে প্রাচ্যের (ভারতের পূর্বাঞ্চল) অসুর দানব গোষ্ঠীকে আদি-অস্ত্রাল জাতির প্রতিনিধি বলে বিবেচনা করেন, এবং দাক্ষিণাত্যের রাক্ষস গোষ্ঠীকে দ্রাবিড় জাতির প্রতিনিধি বলে মনে করেন। সেই হিসেবে সেই যুগের গঙ্গারিডি অর্থাৎ বাঙ্গালীর মধ্যে আদি-অস্ত্রাল উপাদানই বেশী, যদিও প্রাগৈতিহাসিক যুগের শেষে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় রক্ত তাদের প্রভাবিত ও সঞ্জীবিত করেছিল। প্রসঙ্গতঃ, পুণ্ড্রদেশে এবং তাম্রলিপ্তিতে এক সময়ে দ্রাবিড়েরাই প্রবলতর হয়েছিল।

বাঙ্গালীর প্রাগার্য্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি এইসব বৃহৎ নরগোষ্ঠীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমন্বয়, এবং বাঙ্গালীর রক্তে আর্য্য রক্তের মিশ্রণ হয়েছে অনেক পরে। এখানে আর্য্য বলতে উত্তরপশ্চিম দিক থেকে আগত ইন্দো-এরিয়ান গোষ্ঠীর মানুষকেই বোঝানো হয়েছে।

রমেশচন্দ্র দত্ত, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকবৃন্দ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি মনীষীগণ—সকলেই বাঙ্গালীর মধ্যে আর্য্য ও অনার্য্য রক্তের সংমিশ্রণের কথা বলেছেন। এই বাঙ্গালীরা নিঃসন্দেহে সেই যুগের গঙ্গারিডি যাদের সময়ে তখনও বাঙ্গালী একটি জাতিতে পরিণত হয় নি, বাঙ্গলা ভাষাও তখনও উদ্ভূত হয় নি।

বাঙ্গালীরা বহুজাতি, এই কথা বলেছিলেন সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র। গঙ্গারিডি তথা তদানীন্তন বাঙ্গালী প্রাক-আর্য্য মানবগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত, যথা—কোল, ভীল, মুণ্ডা (আদি-অস্ত্রাল), সাঁওতাল, ওঁরাও (দ্রাবিড়)। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কোছ, মেচ প্রভৃতি মঙ্গোলীয় গোষ্ঠী। অর্থাৎ নিষাদ, শবর, কিরাত প্রভৃতি আদিম উপজাতির সমন্বয়ে গঙ্গারিডির তৎকালীন সংগঠন।

আদিম যুগের বাঙ্গালীর আদি-অস্ত্রাল, অর্থাৎ নিষাদীয় অস্তিত্ব ক্রমশঃ উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ থেকে আগত ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রভাব ও প্রতিপত্তির মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিল। গঙ্গারিডি ও কালিঙ্গেয়দের সমুদ্রপ্রীতি সম্ভবতঃ তাদের দ্রাবিড় রক্তের অবদান।

প্রাক দ্রাবিড় যুগে গঙ্গারিডি কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত। পরের যুগে দ্রাবিড় প্রভাব বৃদ্ধির পরে কিন্তু তারা ব্যবসায়, বাণিজ্য, যুদ্ধবিগ্রহ ও উপনিবেশ গঠন প্রভৃতিতে লিপ্ত। দ্রাবিড়েরাই নগর সভ্যতার জন্মদাতা। পুণ্ড্রবর্দ্ধন, গৌড়, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি নদীর উপকূলস্থ প্রাচীন নগরগুলি দ্রাবিড় সভ্যতারই সৃষ্টি। রাষ্ট্রশাসন ও পরিচালনায় রাজতন্ত্রও দ্রাবিড়দের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল।

গঙ্গারিডি যখন একটি জাতিত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, তখন থেকেই অর্থাৎ খৃষ্টীয় তৃতীয় / চতুর্থ শতক থেকে গঙ্গারিডি আর্যীভূত হয়েছে। আগেকার গঙ্গারিডি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে নবীন বাঙ্গালী জাতি। এই জাতিত্বের ভিত্তি প্রধানতঃ একটি সার্বজনীন ভাষা, (আর্য্য সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশ থেকে যার উৎপত্তি) যার মধ্য দিয়ে বাঙ্গলা ভাষার পত্তন হয়েছিল পরবর্তী কালে।

এই সময়ে যে আর্যরক্ত বাঙ্গালীর দেহে সঞ্চারিত হয়, নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানীদের মতে তা আলপানীয় নরগোষ্ঠী সম্ভূত। এই নূতন গোষ্ঠীর আগমন হয়েছিল মধ্য এশিয়া থেকে। এদের মধ্যে ছিল আলপানীয়, দিনারিক ও আর্মেনীয় প্রভৃতি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী-সমূহ। নৃতত্ত্ববিদরা মনে করেন যে বাঙ্গালীদের মধ্যে দিনারিক গোষ্ঠীর প্রভাবই প্রবলতর।[৫]

আর্যীকরণ সমাপ্ত হলে, বাঙ্গালী আর আর্য্য ব্রাহ্মণদের চোখে অপাংক্তেয় থাকে না। কিন্তু তখন গঙ্গারিডির গৌরব-সূর্য অস্তাচলে গেছে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকেই আর্য্য বাঙ্গালী গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীন।

প্রাসঙ্গিকভাবেই এইখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ডঃ অতুল সুর তাঁর "বাংলার সামাজিক ইতিহাস" গ্রন্থে রাঢ় ও বঙ্গের প্রাচীন অধিবাসী যথা পোদ, বাগদী, কৈবর্ত্ত, সদগোপ, মাহিষ্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিবর্তনের কথা বহুলভাবে বর্ণনা করেছেন। পুণ্ড্র, বঙ্গ, কর্বট[৬] প্রভৃতি নামগুলি কৌমভিত্তিক। এই পুণ্ড্রদের বংশধর হচ্ছে বর্তমান পোদ জাতি যারা নিজেদের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বলে দাবি করে। বর্তমান কৈবর্ত জাতি কর্বট কোমের বংশধর বলে অনুমান করা যায়। প্রাচীন বাংলায় আর এক উল্লেখযোগ্য জাতি ছিল—তার নাম বাগদী জাতি। "প্রাচীন গ্রীক লেখকদের রচনাবলী থেকে আমরা জানতে পারি যে মৌর্যদের সময় পর্যন্ত বাগদীরাই রাঢ়দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি ছিল। কৈবর্তদের উল্লেখ মনুর 'মানবধর্ম শাস্ত্রে' আছে। মনু এদের বর্ণসঙ্কর বলে অভিহিত করেছেন।…" (বাংলার সামাজিক ইতিহাস ডঃ অতুল সুর)

অন্য আর একটি জাতি সেই সময়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারা হচ্ছে বর্তমান সদগোপ জাতির পূর্ব-পুরুষেরা। 'তাম্রাশ্ম যুগ থেকেই গ্রামের কৃষিভিত্তিক অর্থ-নীতিতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। মনে হয় দক্ষিণ রাঢ়ে কৈবর্তদের যেমন আধিপত্য ছিল, উত্তর রাঢ়ে তেমনই সদগোপদের প্রাধান্য ছিল।'[৭] মাহিষ্য জাতির প্রাধান্য ছিল বঙ্গে এবং পুণ্ড্রে।[৮]

গঙ্গারিডির ভৌগোলিক সীমা এবং জাতিগত উপাদান বিশ্লেষণে এবং নির্ধারণে পৌণ্ড্রদের সম্বন্ধে একটি বিশদ অনুসন্ধান অনিবার্য্য হয়ে ওঠে। আমরা বিভিন্ন পর্য্যায়ে জাতিগত, কৃষ্টিগত, সংস্কৃতিগত আলোচনার মাধ্যমে এই বিষয়ে আলোকপাতে প্রয়াসী হবো।

পৌণ্ড্রদের কাহিনী শুরু করার আগেই মনে রাখতে হবে যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত বঙ্গদেশের প্রধানতঃ তিনটি কাল্পনিক বিভাগ ছিল—উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ। পুণ্ড্রদেশ, বারেন্দ্র প্রভৃতি উত্তরবঙ্গের প্রতীক। বঙ্গ, বাগড়ী, সমতট, হরিকেল, বঙ্গাল প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের প্রতীক। সুহ্ম, প্রসুহ্ম, তাম্রলিপ্ত, গৌড়, রাঢ়, কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের প্রতীক। এখনকার ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে তদানীন্তন দক্ষিণবঙ্গ অংশতঃ পশ্চিমবঙ্গে এবং অংশতঃ পূর্ববঙ্গে।

'বঙ্গ'কে অনেকেই পূর্ববঙ্গ বলে বিবেচনা করলেও, প্রাচীন যুগ থেকে প্রথম—মধ্যযুগ পর্যন্ত বঙ্গ অন্ততঃ ভাগীরথী-গঙ্গার পূর্বদিকে বঙ্গদেশের মধ্য-দক্ষিণ অংশকেও

বোঝাতো।[৯] বলাই বাহুল্য ভাগীরথী-গঙ্গার পূর্বদিকে কলিকাতা, চব্বিশ পরগণা (উত্তর ও দক্ষিণ) বনগ্রাম, নদীয়ার কিছু অংশ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্বাংশ-সহ (মধ্য-দক্ষিণ) বঙ্গের অনেকখানিই বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অধীনে।

অনেকে মনে করেন যে রাঢ় নামটি তুলনামূলকভাবে অর্বাচীন, এবং সেই হিসেবে সুহ্ম এবং পুণ্ড্রের নাম প্রাচীনতর। কিন্তু এই অনুমানটি সর্বতোভাবে নির্ভুল না হতেও পারে। অবশ্য পুণ্ড্র জাতির নাম অনেক আগে থেকেই আর্যশাস্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায়।

আগে রাঢ় দেশের সঙ্গে এবং বিশেষভাবে উত্তর রাঢ়ের সঙ্গে পুণ্ড্রের একটা ভূ-প্রকৃতিগত, সংস্কৃতিগত এবং সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিগত সম্পর্ক ছিল।[১০] স্বাভাবিকভাবেই এই সংযোগ দক্ষিণ পুণ্ড্রের সঙ্গেই ছিল। 'ভাগীরথী যখন গৌড়কে ডাইনে রাখিয়া উত্তর-পূর্ববাহী হইয়া পরে দক্ষিণবাহী হইল, পদ্মা যখন আরও পূর্ববাহী ছিল, তখন তো পুণ্ড্র-বারেন্দ্রীর কিছুটা অংশ (মালদহ জেলা) রাঢ়ভূমির সঙ্গেই যুক্ত ছিল। কিন্তু ইহার পরও গঙ্গা বরেন্দ্র-পুণ্ড্র এবং রাঢ়ভূমির মধ্যে কখনও খুব বড় বাধা হইয়া দেখা দেয় নাই।' ("বাঙ্গালীর ইতিহাস"—দেশ পরিচয়, ডঃ নীহার রঞ্জন রায়)।

মহাভারতে কথিত পুণ্ড্রবর্ধনের (পুণ্ড্র দেশের রাজধানী) নরপতি পৌণ্ড্রক বাসুদেবের মৃত্যুর পরে কুরুক্ষেত্রে কৌরব পক্ষে যুদ্ধকারী এবং হস্তিবাহিনী সমন্বিত পৌণ্ড্রদের স্বাধীনতা মৌর্যযুগ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। পৌণ্ড্রদের স্বাধীনতার যুগেই সেখানকার ব্রাত্য ক্ষত্রিয়েরা, যাঁরা পরে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নামে এক দুর্ধর্ষ জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিলেন, তাঁদের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গতে প্রসারিত করেছিলেন।[১১]

এই ক্ষত্রিয়েরা বালেয় পৌণ্ড্র (বালিয়া জেলাস্থিত অথবা পৌরাণিক বালির বংশধর)। এইভাবেই বলিরাজার বংশধরদের কল্যাণে বৃহত্তর বঙ্গে যে স্বাধীন রাজ্যগুলি উদ্ভূত হয়েছিল কালক্রমে, এবং পশ্চিমে মগধ এবং পূর্ব ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল, সেইগুলিই ঐতিহাসিক যুগের সূচনায় গ্রীক কাহিনীকার তথা অভিযানকারীদের বিবরণ অনুযায়ী গঙ্গারিডি, কালিঙ্গেয়ী প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়েছিল। এই বিষয়টি অন্যত্র আলোচিত হয়েছে।

মৌর্যযুগের আগেই পুণ্ড্র দেশে নাগরিক সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। নগর পুণ্ড্রবর্ধনই তার বিশিষ্ট প্রমাণ। পুণ্ড্র দেশে সেই সময়ে দ্রাবিড় শাসনই অব্যাহত ছিল। 'মৌর্যযুগে পুণ্ড্রবর্ধনে শাসকীয় নির্দেশনামার স্তম্ভ অথবা শিলালিপি না পাওয়ার জন্য এবং তার পরিবর্তে বৌদ্ধ সংঘের প্রতি পাঠানো শাসকীয় শিলমোহর থেকে মৌর্য অধিকারের অভাবই সূচিত হয়।' (উত্তরবঙ্গের ইতিহাস—শ্রীসুকুমার দাস)। লেখকের মতে, যদি এই দেশ মৌর্য রাজশক্তির অন্তর্গত থাকতো, তবে দুর্ভিক্ষের দিনে মৌর্য রাজশক্তি দুর্ভিক্ষের সময় সেবা ও সাহায্যদানের জন্য শ্রমণের কাছে আবেদন পাঠাতো না।

এই যুক্তি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না। মহাপদ্ম নন্দকে পুণ্ড্রবর্ধনের নরপতি

বলা হয়েছে। তিনি ও তাঁর বংশধরদের পরে এই রাজ্য মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের অধীনে ছিল বলেই মনে হয়। হয়তো বিন্দুসার কিংবা অশোকের সময় থেকেই পুণ্ড্রদেশ মগধের আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়েছিল। তাদের সে স্বাধীনতা হয়তো নষ্ট হয়েছিল কলিঙ্গরাজ খারবেলের আক্রমণের পরে।

পৌণ্ড্রিয় ক্ষত্রিয় যোদ্ধৃবর্গ মহাপদ্ম নন্দের অধীনে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে তথা গৌড়, প্রসুহ্ম, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতির মধ্য দিয়ে একেবারে গাঙ্গেয় উপত্যকার শেষপ্রান্তে সমুদ্রের মোহনাগুলিতে উপস্থিত হয়েছিল, মনে হয়। নিজেদের নিপুণতর যুদ্ধকৌশলে এবং উৎকৃষ্টতর সামরিক শক্তিতে স্থানীয় অধিবাসীদের পরাজিত করেছিল।

পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গের আদি-অস্ত্রাল সভ্যতার প্রভাবকে তারা হয়তো তাদের দ্রাবিড় প্রভাবের মাহাত্ম্যেই হীনপ্রভ করেছিল। এক ক্ষমতাসম্পন্ন সামরিক গোষ্ঠী হিসেবে ঐ পৌণ্ড্রগণ বিভিন্ন কৌম অথবা গোষ্ঠীকে একত্রিত করে সেই খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গঙ্গারিডি জাতির পত্তন করেছিল। এদের হাতেই মহাপদ্ম নন্দের নেতৃত্বে মগধের শিশুনাগ বংশীয় নরপতি পরাভূত ও নিহত হয়েছিলেন। এদেরই গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস শক্তিশালী গঙ্গারিডি জাতি বলে বর্ণনা করেছেন, যারা ভৌগোলিকভাবে প্রাচ্যদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য এবং প্রতাপশালী মগধ রাজশক্তির প্রভাব এবং প্রতিপত্তি কুক্ষিগত করার জন্য প্রাসিয়াই-গঙ্গারিডি নামে অভিহিত হয়েছে।

গঙ্গারিডিদের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে ডিওডোরাসের মন্তব্য অনুসরণ করলে, নাপিতপুত্র এবং নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম নন্দকে গঙ্গারিডি জাতি ও দেশের অন্তর্গত চিন্তা না করে উপায় নেই। এই অনার্য মহাপদ্ম নন্দের বাঙ্গালীত্বই বোধহয় তাঁকে পুরাণে বর্ণিত সর্বক্ষত্রান্তক শূদ্র নরপতি হিসেবে পশ্চিম দেশীয় (মধ্যদেশ) আর্য ক্ষত্রিয়দের শ্রেণী শত্রু হিসেবে পরিচিত করে।[১২]

পুরাণের বর্ণনায় বিপাশা নদীর তীর থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকার সমুদ্র মোহনা পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের ক্ষত্রিয় নৃপতিদের তালিকায় বঙ্গদেশীয় কোন নৃপতির নাম নেই। মগধে যেহেতু ইতিমধ্যেই আর্যক্ষত্রিয় শিশুনাগ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই হিসেবে শূদ্রাণীর গর্ভজাত মহাপদ্ম নন্দ গঙ্গারিডি তথা বাঙ্গালী বলেই প্রতিপন্ন হয়।[১৩]

তৎকালীন 'মধ্যদেশের' অন্তর্গত কুরু, পাঞ্চাল, কাশী, বৎস্য এবং প্রাচ্যদেশের অন্তর্গত মগধ প্রভৃতি সকল রাজ্যগুলিই গাঙ্গেয় অর্থাৎ গঙ্গাভিত্তিক রাষ্ট্র। কিন্তু শুধুমাত্র সাগরের মুখ পর্যন্ত নিম্নগাঙ্গেয় দুই উপকূলস্থ ভূমিকে তখনকার ভারতে আগমনকারী বিদেশীরা গঙ্গারিডি বলে উল্লেখ করেছিলেন। এর মূল কারণ এই ছিল যে মহাপদ্ম নন্দের উত্তর ভারত বিজয়ের ফলে অন্য সকল রাষ্ট্রগুলিই বিলুপ্ত হয়েছিল। বাকী ছিল শুধুমাত্র ঐতিহ্যসম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী মগধরাষ্ট্র এবং নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত গঙ্গানদীভিত্তিক প্রাচীন রাঢ়, গৌড়, পুণ্ড্র ও বঙ্গ—যা অনেকাংশেই বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত। এদেরই বিদেশীরা যথাক্রমে প্রাসী (মগধ) ও গঙ্গারিডি বলে বর্ণনা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথী-গঙ্গার প্রধানতম প্রবাহটি রাজমহল-সাঁওতালপরগণা-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম দিয়ে অজয়-দামোদর-রূপনারায়ণ-সরস্বতী-কংসাবতীকে সংযুক্ত করে সাগরে পড়তো (বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়)। গঙ্গার দক্ষিণমুখী পশ্চিম স্রোতধারাই যে বঙ্গদেশে সেই সময়ে প্রবলতর ছিল, তা গঙ্গার শাখানদী সরস্বতী, রূপনারায়ণের উপর আন্তর্জাতিক বন্দর তাম্রলিপ্ত এবং পরবর্তী কয়েক শ' বছরের মধ্যে সাগর মোহনার অনতিদূরে গঙ্গা নদীর উপর 'গঙ্গে' বন্দরের অস্তিত্বই প্রমাণ করে। এই গঙ্গে বন্দর তাম্রলিপ্ত অথবা তার কাছাকাছি কোন বন্দর হওয়া আশ্চর্য নয়!

গঙ্গার প্রাচীনতম ধারার পশ্চিমের দিকে অবস্থিত তাম্রলিপ্ত বন্দর এবং রাজ্যকে প্রাসী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করার (বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডঃনীহাররঞ্জন রায়) যৌক্তিকতা কতখানি, অথবা আমাদের দেশীয় ধর্মশাস্ত্রে, সাহিত্যে ও প্রাচীন কাহিনীতে অথবা কিম্বদন্তীতে সেই রকম কোন সংকেত আছে কিনা, তা বিশেষভাবে বিচার্য।

বর্তমান হাওড়া এবং কলকাতার সৃষ্টি তখন নিঃসন্দেহে হয় নি। সুতরাং দক্ষিণ প্রান্তের সমুদ্রের অবস্থিতি আরও উত্তরে, অর্থাৎ রাঢ়বঙ্গের আরও ভিতরে থাকাই সম্ভব ছিল। সেই ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে বর্তমান মেদিনীপুর ও হুগলীজেলার নীচেই সমুদ্রের মোহনা ছিল। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন সমুদ্রের মোহনার নিকটই 'গঙ্গে' অথবা গঙ্গা বন্দরকে অনুসন্ধান করা কর্তব্য। টলেমির মানচিত্রে গঙ্গার দ্বিতীয় প্রধান মুখ বলে বর্ণিত মেগা (mega-great) কেই সেই মোহনা ধরে নিলে অসঙ্গত হয় না। এই মুখ আদি গঙ্গার সাগর সঙ্গম হওয়াও বিচিত্র নয়। বিগত কুড়ি/পঁচিশ বছরের যে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার দক্ষিণ-চব্বিশপরগণার উপকূলবর্তী অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছে, তার থেকে এই অনুমান অন্যায় ও অবাস্তব নয়। চন্দ্রকেতুগড় প্রভৃতি স্থান গঙ্গার পূর্ব উপকূলের দিকে হলেও, এই সব স্থানই বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত।

সপ্তগ্রাম অঞ্চলে শীর্ণকায়া সরস্বতীর গর্ভে এবং তার আশে পাশে প্রামাণ্য প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত না হলে, এই 'গঙ্গে' বন্দরকে, যা টলেমির সময়ে গঙ্গারিডিদের রাজধানী বলে বর্ণিত, সপ্তগ্রামের সঙ্গে অভিন্ন বলে প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। কিন্তু ইতিমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অনেক পণ্ডিত এবং ঐতিহাসিকই গঙ্গে বন্দর বা 'গ্যাঞ্জেস রেজিয়া' ও সপ্তগ্রামকে অভিন্ন বলে বিবেচনা করেন। "হুগলী জেলার ইতিহাস" লেখক শ্রীসুধীরকুমার মিত্র, ডঃ সুকুমার সেন (বঙ্গভূমিকা), রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (History of Indian Shipping), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্য অনেকেই সপ্তগ্রামকে প্রাচীন বন্দর ও শহররূপে বর্ণনা করে গঙ্গে বন্দরের সঙ্গে এক বলেছেন। মেগাস্থিনিসের সূত্রে গঙ্গে বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

রোমান ঐতিহাসিক প্লিনী (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) তাঁর বিশাল ল্যাতিন গ্রন্থে[২৪] ভারতের ভৌগোলিক বৃত্তান্তের মধ্যে গঙ্গারিডিদের রাজধানী বলে কথিত গঙ্গে অথবা গঙ্গা নগরের কোন উল্লেখই করেন নি। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী গঙ্গার সবচেয়ে কাছেই

কালিঙ্গেয়ীরা বাস করতো এবং তাদের উপর দিকে ছিল মাণ্ডেয়ী এবং মাল্লী এবং এদের রাজ্যের সীমা (উত্তর ?) ছিল গঙ্গানদীই। এই বর্ণনা থেকেই প্রতিপন্ন হয় যে এই কালিঙ্গেয়ীরা রাঢ়দেশ তথা পশ্চিমবঙ্গেরই অধিবাসী, যাদের উত্তর দিকে ছিল বাঁকুড়া, মানভূম, ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চল।

গঙ্গানদীর সম্বন্ধে প্লিনী বলেছেন যে এর উনিশটি উপনদীর মধ্যে কয়েকটির নাব্যতা বেশী (হয়তো সেই সময়ে প্রচলিত সমুদ্রযান এই উপনদীগুলিতে যেতে পারতো), এবং গঙ্গানদী তার গতি পথের অন্তিম ভাগে গঙ্গারিডিদের দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

এই কথা বলার পরেই প্লিনী বলেছেন যে কালিঙ্গেয়ীদের রাজধানী (roval city) পার্থালিস নামে পরিচিত। এ' কথা আগেই বলা হয়েছে।

প্লিনীর টীকাকার ম্যাকক্রিণ্ডল এই রাজধানীকে এইভাবে অভিহিত করেছেন—Gangaridum Calingarum Regia, যার থেকে বোঝা যায় যে গঙ্গারিডি জাতির এই কালিঙ্গেয়ীরা অন্যতম শাখা। আগেই জানানো হয়েছে এই মর্মে। কালিঙ্গেয়ীদের তিনটি শাখার কথা উল্লিখিত হয়েছে। সেই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা অন্যত্র করা হবে।

প্লিনীর বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি যে উত্তর-পূর্ব ভারতে 'প্রাসাইরা' ক্ষমতায় এবং গৌরবে অন্য সকলকেই অতিক্রম করেছিল। তাদের রাজধানী পলিবোথরা একটি বিশাল এবং সমৃদ্ধিশালী নগরী এবং এই ভূভাগে গঙ্গানদীর গতিপথের (দু'পাশে বসবাসকারী) লোকেরা নিজেদের পলিবোথরী বলে অভিহিত করে।

তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ভৌগোলিক অবস্থানের বিশ্লেষণ, প্লিনীর উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে আমাদের এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করে যে প্রাসাইরা বিপাশা নদী থেকে পাটলিপুত্র অথবা তার সান্নিহিত গাঙ্গেয় অঞ্চলে খুবই প্রবল ছিল এবং হয়তো তাদের অধিকার সীমা সমগ্র প্রাচ্য দেশেই বিস্তৃত ছিল। প্লিনীর সামগ্রিক বর্ণনা থেকে এই ধারণাও হয় যে সমুদ্র পর্যন্ত নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রথমভাগে গঙ্গারিডিরা এবং সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থানে কালিঙ্গেয়ীরা বেশী শক্তিশালী ছিল। গঙ্গারিডি এবং কালিঙ্গেয়ীদের মধ্যে জাতিগত এবং রাষ্ট্রগত বন্ধন ছিল।

কালিঙ্গেয়ী, গঙ্গারিডিদের সম্বন্ধে প্লিনী যা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা থেকে এই কথা অনুমান করা যায় যে মেগাস্থিনিস প্রাসাই শব্দটি দেশ-বাচক এবং কালিঙ্গেয়ী ও গঙ্গারিডি, শব্দ দুটি জাতিবাচক হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। সেই অনুমানের ভিত্তিতেই বলা যায় যে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ে নন্দরাজাদের অধীনে পূর্বভারতে তথা সমগ্র প্রাচ্য দেশের[১৫] রাজধানী ছিল পলিমবোথ্রা অথবা পলিবোথ্রা (পাটলিপুত্র) এবং সেই অঞ্চলের লোকেদের পলিবোথ্রী বলেই বুঝাতো।

অন্য যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি প্লিনীর বক্তব্যের মধ্য থেকে পরিষ্কার হয় তা হচ্ছে এই যে গঙ্গারিডিরা শুধুমাত্র সমুদ্রের মোহনার নিকটবর্তী জাতি ছিল না, নিম্ন

গাঙ্গেয় উপত্যকাতেও তাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। গঙ্গারিডি জাতির অধ্যুষিত গাঙ্গেয় ভূমির নিম্নভাগে সমুদ্রের সঙ্গমের কাছে যে কালিঙ্গেয়ীরা বাস করতো, তারা গঙ্গারিডিদের আত্মীয় এবং তাদেরই প্লিনী গঙ্গারিডি—কালিঙ্গেন্সী বলে অভিহিত করেছিলেন। আশ্চর্যের কথা, টলেমি কিন্তু গঙ্গার মোহনায় কালিঙ্গেয়ীদের অস্তিত্বের কথা বিবৃত করেন নি, যদিও তাঁর মানচিত্রে (within the Ganges—আন্তর্গাঙ্গেয়) পূর্বদক্ষিণ দিকে কালিগা (Calliga) বলে একটি অঞ্চল নামাংকিত করেছেন, যাকে কলিঙ্গ বলে মনে করা যেতে পারে। টলেমির এই চিত্রটি বাস্তবানুগ নয়।

সেই অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিক যিনি "পেরিপ্লাস অফ দি এরিথ্রিয়ান সি" নামক গ্রন্থের প্রণেতা, তিনিও কালিঙ্গেয়ীদের কথা বলেন নি। এই নীরবতা হয়তো এই কারণে যে খৃষ্টীয় শতাব্দীর শুরু থেকেই কালিঙ্গেয়ীরা আরও দক্ষিণ পূর্বে অপসৃত হয়েছিল এবং গঙ্গারিডি ও কালিঙ্গেয়ীদের আগেকার বন্ধন শিথিল অথবা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

প্রাচীনকালে সামুদ্রিক জাতি বলে গঙ্গারিডিদের খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি দুইই ছিল। মুণ্ডাদের ভাষায় গঙ্গা নদীর নামের অর্থ জল, এবং সমুদ্রও জলময়। সুতরাং গঙ্গারিডি জলভিত্তিক বা সমুদ্রপ্রিয় মানব গোষ্ঠী ছিল, এ বিষয়ে কোন সংশয়ই থাকে না। পরবর্তী কালে উত্তর ভারতের আর্য্য আধিপত্যের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে এবং বঙ্গভূমিতে প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিবেশের সৃষ্টি হওয়ায়, বঙ্গদেশ ভারতের পশ্চাতভূমিতে পরিণত হয় এবং সমুদ্র ক্রমশঃ দূরবর্তী হওয়ায় গঙ্গারিডি জাতির সমুদ্রবিমুখতা বর্দ্ধিত হয়! এইভাবে সামুদ্রিক বাণিজ্যনির্ভর গঙ্গারিডির অর্থনৈতিক পতনের সম্ভাবনা ত্বরান্বিত হয়।

নির্দেশিকা

১। রাজতরঙ্গিনী (চতুর্থতরঙ্গ) —কাশ্মীর রাজকবি কহ্লণ।

২। অজানা বঙ্গকে জানো —সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য।

৩। যশোহর খুলনার ইতিহাস —সতীশচন্দ্র মিত্র।

৪। Classical Accounts of India (pliny)
—Dr. R. C Majumdar P. 342.

৫। উত্তরবঙ্গের ইতিহাস —সুকুমার দাস।

৬। কর্বট নামটি মহাভারতে পাওয়া যায়। 'The Karvatas of old may be represented by Kharwars of Midnapore and other districts of West Bengal (Hunter, III p p 49, 51)'—pl.see foot-note of p. 46 of Historical Geography of Ancient and Early Mediaeval Bengal.
—Dr. Amitabha Bhattacharjee.

৭। বাংলার সামাজিক ইতিহাস —ডঃ অতুল সুর।

৮। বাঙালীর জাতিতত্ত্ব ও কৃষিজীবি সম্প্রদায় —ডঃ সুহৃদ কুমার ভৌমিক।

৯। Historical Geography of Ancient and Early Mediaeval Bengal. —Dr. Amitabha Bhattacharjee.

১০। বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) —ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

১১। গৌড় কাহিনী (ঐতিহাসিক যুগের উন্মেষ) —শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ।

১২। Studies in Indian Polity —Dr. Bhupendra Nath Dutta.

১৩। বাংলাদেশের ইতিহাস (তৃতীয় পরিচ্ছেদ—প্রাচীন ইতিহাস) —ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।

১৪। Historia Naturalis—Caius Plinius Secundus (A.D. 23—A. D. 79).

১৫। 'According to Dharmasutras the eastern country lay to the east of Prayaga. The Kavya Mimansa points out that it was to the east of Benaras while according to the commentary of the Vatsayan Sutra, it lay to the east of Anga'—Historical Geography of Ancient India. —Dr. B. C. Law.

অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ

ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভেই অথবা তার অনেক আগে স্মরণাতীত যুগ থেকেই অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ এক সূত্রে গ্রথিত।[১] এই সম্পর্কে 'বঙ্গ ভূমিকা' গ্রন্থে (ডঃ সুকুমার সেন) সন্নিবিষ্ট নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ—

"মোট কথা এই হল যে, জ্ঞাত ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠাতে বঙ্গভূমি ও বাঙ্গালী বলতে গেলে বুঝবো—স্থানীয় অবস্থাভেদে পূর্ব ভারতীয় শব্দের সঙ্গে অভিন্ন। একই ভাষার অল্প-স্বল্প স্থানীয় রূপান্তর স্বীকার করে নিলে বলা যায় তখন বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা একই দেশ ছিল। এই দেশের আচার, ব্যবহার, ব্যবসায়, বাণিজ্য ও কৃষি-গোপালন, বস্ত্রবয়ন, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি সাংসারিক ব্যাপারে কিছু ভিন্নতা ছিল না। বিহারের সঙ্গে বাংলার প্রত্যক্ষ এবং প্রবল যোগ ছিল গঙ্গা ধরে। গঙ্গা বঙ্গভূমির মেরুদণ্ড, কি সেকালে, কি একালে।···কাঁসাইয়ের ওপারে পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন উড়িষ্যার অংশ সে কালে উৎকল নামে খ্যাত ছিল। এই অঞ্চল বৃহৎ বঙ্গভূমির অন্তর্গত ছিল বলা যায়।"

গঙ্গারিডি দেশ এবং জনগোষ্ঠীর চিহ্নিতকরণে এবং ঐতিহাসিক কার্যকারণ সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণে, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের আত্মিক সম্পর্কের বিষয় আলোকপাত অনিবার্য হয়ে পড়ে।

আর্যশাস্ত্রে কলিঙ্গের নাম নেই বললেই চলে। অনেক পরবর্তী কালে রচিত অথর্ববেদে অঙ্গ এবং বঙ্গের নাম পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে অঙ্গ, বঙ্গ এবং কলিঙ্গ আর্য সভ্যতার বহির্ভূত।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (আনুমানিক খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দী) উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্রের লোকেদের দাস, দস্যু ইত্যাদি বলে অভিহিত করা হয়েছে। ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে বঙ্গ, বগধ (মগধ) ও চের জনপদের লোকেদের অসুর বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদের পক্ষী বলে অবজ্ঞা করা হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের ভাষা অবোধ্য এবং সংস্কৃতি অজ্ঞাত।[২]

কলিঙ্গ দেশের নাম মহাভারতে এবং পুরাণেই উল্লিখিত হয়েছে, যদিও, রামায়ণে গোমতী নদীর পশ্চিমে অল্প দূরেই কলিঙ্গ নগর বলে এক শহরের কথা বলা হয়েছে (Vide-Tribes in Ancient India Ch. XXXII—Dr. B. C. Law)। সুহ্ম দেশের নাম পাওয়া যায় মহাভারতে, সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মহাভারতীয় যুগ অতিক্রম করে ইতিহাসপূর্ব পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ বৈদিক আর্যদের নিকট অবজ্ঞাত, ঘৃণিত।

আর্য ও অনার্যের মিশ্রণে এবং বর্ণ-সাংকর্যের ফলে এইসব দেশে যেসব ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছিল, তারাও খাঁটি আর্যদের চোখে ব্রাত্য। ভাগবত পুরাণে সুহ্মগণ পাপ-কৌম নামে উল্লিখিত। প্রাচীন সাহিত্যে বঙ্গ নামের সঙ্গে অঙ্গ এবং কলিঙ্গ যুক্ত হয়ে আছে, এবং রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ সেই সাক্ষ্যই দেয়।

পৌরাণিক সাক্ষ্য অনুযায়ী, ঋষি দীর্ঘতমার ঔরসে রাণী সুদেষ্ণার গর্ভে সঞ্জাত দানবরাজ বলির পাঁচ পুত্র জন্মেছিল—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম এবং পুণ্ড্র। এদের প্রত্যেকের নামে এক একটি রাজ্যের নাম হয়েছিল। বলিরাজা পাতালে রাজত্ব করতেন এবং তখন এই প্রাচ্য ভারতের অন্তভাগকেই পাতাল বলতো। এ কাহিনী নিছক কিম্বদন্তী অথবা রূপক হলেও, ইতিহাসের গণ্ডির মধ্যে উপর্যুক্ত পাঁচটি রাজ্যই স্বীকৃতি পেয়েছে।[৩]

বলিরাজার এই পুত্রেরা ক্ষত্রিয়ের সম্মান লাভ করলেও, প্রাচ্যদেশের সংস্কৃতি, ভাষা এবং ধর্মাচরণ বিধি আর্যদের অনুমোদিত না হওয়ায়, এই সকল ক্ষত্রিয়েরা বৈদিক ধর্মাবলম্বীদের চোখে নিকৃষ্ট স্থান অধিকার করেছিল এবং বৈদিক সাহিত্যেও এই রাজ্যগুলির উল্লেখ আদৌ সম্মানজনক হয় নি। এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এমন কি বোধায়ন ধর্মসূত্রে (আনুমানিক খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দী) অঙ্গ ও মগধ দেশকে সংকীর্ণ যোনী বা আংশিক আর্যীকৃত বলে ধরা হয়েছে, কিন্তু পুণ্ড্র, বঙ্গ ও কলিঙ্গদেশ আর্যবহির্ভূত অঞ্চল বলে উপেক্ষিত হয়েছে।[৪]

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এই তিন অভিধার মধ্যে এককভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে বৃহত্তর বাঙ্গালীর অস্তিত্বই নিমজ্জিত আছে। বঙ্গ নামে একটি কৌম পূর্ববঙ্গের মধ্য-দক্ষিণ অংশে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। অন্ততঃ মহাভারতের সাক্ষ্য থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে সেই যুগে এখানে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বঙ্গরাজ সমুদ্র সেন কৌরব পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন।

বাঙ্গালীর অঙ্কুর যেমন সমগ্র বঙ্গভূমির বীজের মধ্যে ছিল, তেমনই ছিল অঙ্গের এবং কলিঙ্গের মধ্যে। অঙ্গদেশ মহাবীর কর্ণের সময়ে পুণ্ড্র এবং সুহ্মদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, অন্ততঃ বর্তমান বীরভূম (উত্তর রাঢ়) পর্যন্ত অঙ্গদেশের সীমা ছিল।[৫]

মহাভারতীয় যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগের সূচনা পর্যন্ত যে ইতিবৃত্ত আমাদের আয়ত্তে আছে, তার থেকে প্রমাণিত হয় যে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ে অঙ্গ দেশ মগধের অন্তর্গত হলেও, বঙ্গদেশের অধিকাংশ যথা গৌড়,[৬] সুহ্ম প্রভৃতি অঞ্চল পুণ্ড্ররাজা তথা দক্ষিণ পৌণ্ড্রিয়দের প্রভাবাধীন ছিল। এবং এরাই সাগর তীরবর্তী কালিঙ্গেয়দের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে গঙ্গারিডি দেশ এবং জাতি বলে পরিগণিত হয়েছিল। পুণ্ড্ররাজারা বঙ্গেও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন বলে জানা যায় এবং বঙ্গও মনে হয় গঙ্গারিডির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের রক্তক্ষয়ী তাণ্ডবলীলার অবসানে যে সব রাজ্যের অস্তিত্বের কথা আমরা বিভিন্ন পুরাণ থেকে অবগত হই, তার মধ্যে কলিঙ্গ উল্লেখযোগ্য। এই পৌরাণিক সূত্রগুলি একত্রিত করলে আমাদের মনের পটে কতগুলি রাজ্যের সমন্বয়ে একটি সাম্রাজ্যের চিত্র বিকশিত হয়। পুরাণের সাক্ষ্য অনুযায়ী, এই সব রাজ্যগুলি মহাপদ্ম নন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মগধের নন্দ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই রাজ্যগুলির নাম কুরু, পাঞ্চাল, ইক্ষ্বাকু, কাশী, হৈহয়, কলিঙ্গ, অশ্মক, মিথিলা, শূরসেন প্রভৃতি।[৭]

মহাভারতের মগধরাজ জরাসন্ধ প্রাচ্যে মগধকেন্দ্রিক যে সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, পুরাণে দানব বলে চিহ্নিত এই প্রাচ্য নরপতির সেই স্বপ্ন সার্থকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের প্রতাপশালী আর্যক্ষত্রিয়বিরোধী শূদ্র অধীশ্বর মহাপদ্ম নন্দের সময়ে এবং অল্প পরে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ে।

ইতিহাসের বহমান ধারায় আমরা এই চিত্রই দেখতে পাই। ডিওডোরাসের বিবরণ[৮] অনুযায়ী তৎকালীন মগধাধিপতি নাপিত বংশীয় নন্দরাজ ছিলেন গঙ্গারিডি সম্ভূত, অর্থাৎ বাঙ্গালী রাজা, যাঁর পিতা মহাপদ্ম নন্দ অঙ্গদেশসহ মগধের সম্রাট হয়েছিলেন।

খারবেলের হাতিগুম্ফা শিলালিপি অনুযায়ী মহাপদ্ম নন্দ সম্পূর্ণভাবে কলিঙ্গ জয় করেছিলেন। এই সূত্র থেকে আরও জানা যায় যে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে মগধ আক্রমণ এবং জয় করে খারবেল কলিঙ্গ বিজয়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন।

ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথের (Early History of India—V. A. Smith) উক্তি ব্যতীত অন্য কোন সূত্র থেকে মহাপদ্ম নন্দ জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলে সঠিক-ভাবে জানা যায় না। কিন্তু কলিঙ্গ দেশে তখন জৈন ধর্মই প্রবল ছিল। এর প্রমাণ-স্বরূপ বলা যায় যে কলিঙ্গাধিপ খারবেলের হাতিগুম্ফা শিলালিপিতে এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে যে তিনি মগধ আক্রমণ করে জিনের প্রতিকৃতি কলিঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

জৈন প্রজ্ঞাপন সূত্রতে কথিত আছে যে মহাবীর বর্দ্ধমান কলিঙ্গদেশে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। সেই প্রাচীন কাল থেকেই (খৃঃ পূঃ সপ্তম / ষষ্ঠ শতাব্দী) কলিঙ্গের সঙ্গে রাঢ়বঙ্গের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ, এই দুই দেশেই জৈন ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল।

বৌদ্ধ ধর্মের পক্ষপাতী অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধের আগে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করলেও, অশোকের পাটলিপুত্রে জৈনদের উপর অত্যাচারের কাহিনী (পুণ্ড্রবর্দ্ধনের জৈনদের বর্দ্ধমান মহাবীরের নিকট বুদ্ধকে হেয় করার জন্য),[৯] তাঁর সেই সময়ের মনের গতির উপর আলোকপাত করে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আনুগত্য এবং কিছুটা গোঁড়ামির জন্যও হয়তো মৌর্য সম্রাট অশোক কলিঙ্গদেশকে দমন করতে এবং শাস্তি দিতে বদ্ধ-পরিকর হয়েছিলেন। 'কালিঙ্গগণ অশোকের উত্তরাধিকার স্বীকার করেন নাই। অশোকের কলিঙ্গ যুদ্ধের পর বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার হয়েছিল।' (বঙ্গের অনন্ত সামন্তচক্র ও ইসলাম রাজ্যের ইতিহাস—ধনঞ্জয় দাশ মজুমদার)।

আমরা মহাভারতে বঙ্গাধিপতি, পৌণ্ড্রাধিপতি, তাম্রলিপ্তাধিপতির উল্লেখ পেয়েছি। ভীমসেনের দিগ্বিজয় বর্ণনা (সভাপর্ব) থেকে লক্ষ্য করেছি সুহ্মদেশ এবং সাগরতীর বাসী লোকেদের ম্লেচ্ছ বলা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে মগধ ও কলিঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন প্রাচ্য রাজ্যের (যথা অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম) নাম পৌরাণিক সূত্রে পাওয়া যায় নি, আমরা সঙ্গতভাবেই অনুমান করতে পারি যে সেই বিবরণে বঙ্গদেশবাসী অর্থাৎ বাঙ্গালীদের কলিঙ্গবাসীদের সঙ্গে একাঙ্গীভূত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

সুতরাং এখানেও আমরা গ্রীক লাতিন লেখক বর্ণিত গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ী নামধারী জাতি অথবা গোষ্ঠীর নামের তাৎপর্যটি উপলব্ধি করতে পারি। স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে গঙ্গারিডি বলতে বিদেশী লেখকেরা সেই যুগে নিম্ন গাঙ্গেয় ভূমিতে সাগর মোহনা পর্যন্ত বসবাসকারী বাঙ্গালীদেরই নির্দেশ করেছেন, যারা বৃহৎ জাতি হিসেবে কালিঙ্গী এবং বৃহৎ দেশ হিসেবে কলিঙ্গ অভিজ্ঞানের মধ্যে নিজেদের বাঙ্গালী সত্তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

আর, অনেক সময়ে এই কলিঙ্গ বলেই সেই যুগে বাঙ্গালীর পরিচয় ছিল বহির্ভারতে। 'মালয় ও অন্যান্য দ্বীপময় দেশে কলিঙ্গবাসী উপনিবেশিকের প্রভাব এত বিস্তৃত হয়েছিল যে ভারতীয় মাত্রকেই কেলিঙ্গ বা ক্লিঙ্গ বলে অভিহিত করা হত' (বৃহত্তর বাঙ্গালী—দেবেশ দাশ)। কলিঙ্গ দেশ থেকেই সুদূর প্রাচ্যের দেশ সমূহে ভারতবাসী গিয়ে বসবাস করেছিল এবং উপনিবেশ স্থাপন করে ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতি, শিল্প কলা সেই সব দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রসারিত করেছিল। এই বৃহত্তর কলিঙ্গের অন্তর্গত বাঙ্গালী জাতি প্রাচীন যুগে ভারতের বাহিরে নিজেদের ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির উৎকর্ষের সাহায্যে সুদূর প্রাচ্যের স্থানে স্থানে নব কলেবর ধারণ করে ভারতের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যকে বিস্তার করেছিল।[৯] আজও সেই ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি প্রভৃতির প্রভাব ইন্দোচীন, মালয়, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতিতে অনুভব করা যায়।

প্রাচীনকালে বঙ্গ অপেক্ষা কলিঙ্গের মধ্যেই আমরা বিশেষভাবে সুহ্ম (রাঢ় দেশ), তাম্রলিপ্ত, কর্বট প্রভৃতি জনপদের অস্তিত্বের স্পন্দন অনুভব করতে পারি। এই কারণেই মেগাস্থিনিস এবং পরবর্তী গ্রীক ও রোমান পণ্ডিতগণের মধ্যে এবং বিশেষভাবে প্লিনী কর্তৃক প্রাসী, গঙ্গারিডি এবং কালিঙ্গেয়ীদের নাম একই সূত্রে গ্রথিত হয়েছিল। এই তিনটি অঞ্চলই ছিল নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় এবং সমষ্টিগতভাবে সাগরমুখ পর্যন্ত প্রলম্বিত এবং মূলতঃ গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

সেই সময় পর্যন্ত যে ভারতের এই প্রাচ্য ভূখণ্ড আর্য সভ্যতার বহির্ভূত, সে সম্বন্ধে অল্পই সন্দেহ থাকে। বোধায়নের ধর্মসূত্রের নির্দেশ অনুযায়ী এবং একটি প্রাচীন শ্লোক অনুযায়ী অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, মগধ প্রভৃতি দেশে তীর্থযাত্রা ব্যতীত অন্য কারণে গমন করলে প্রায়শ্চিত্ত করার বিধি প্রদত্ত হয়েছে।[১০] ব্রাহ্মণ তথা বৈদিক আর্যদের গমন নিষিদ্ধ করে স্পষ্টই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে উল্লিখিত দেশগুলি বেদবহির্ভূত দেশ।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রগুলি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রমাণ করে যে অন্ততঃ মৌর্য সম্রাট অশোকের প্রাদুর্ভাবের কাল পর্যন্ত প্রাচ্যদেশে জৈন ধর্মের প্রভাবই বেশী ছিল। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁর পুত্র বিন্দুসার উভয়েই জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের গুরুর নাম ছিল ভদ্রবাহু। কলিঙ্গদেশ সম্রাট অশোকের বৌদ্ধধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্বকে উপেক্ষা করে প্রধানতঃ জৈনধর্মকেই আশ্রয় করেছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে মেঘবাহন বংশের (যাকে

ভিনসেণ্ট স্মিথ চেত বংশ বলেছেন) তৃতীয় নৃপতি খারবেলের নেতৃত্বে খণ্ডগিরি (তোসালি অর্থাৎ বর্তমান ভুবনেশ্বরের নিকট) জৈন ধর্মের কেন্দ্ররূপে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করেছিল (ভারতকোষ, তৃতীয় খণ্ড, খারবেল—ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার) ।

বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মের উৎপত্তি, প্রসার ও বিশেষভাবে বঙ্গভূমিতে তার প্রভাব সম্বন্ধে অন্য আর এক ভাষাতত্ত্ববিশারদ ও পণ্ডিতের অভিমত লক্ষণীয়—'উত্তরাপথে বৌদ্ধধর্ম যে বিশেষ রূপ নিয়েছিল, যাকে মহাযান বলা যায়, মগধ থেকে বাংলাদেশে এসেছিল প্রধানতঃ গঙ্গাপথ ধরে। বৌদ্ধধর্ম সমাজের উচ্চ স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল। জৈন ধর্ম প্রসারিত ছিল সাধারণতঃ একটু নিম্নস্তরের মধ্যেই। এ ধর্ম এসেছিল কলিঙ্গ ও সুহ্মের মধ্যে দিয়ে, সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মের আগমনের কিছুকাল আগেই।'[১১]

আমাদের বিচারাধীন গঙ্গারিডি দেশ / জাতি এই ব্রাহ্মণ্যবিরোধী পরিমণ্ডলে নিজেদের অবৈদিক সংস্কৃতি ও কৃষ্টির শক্তিতে এবং বৈশিষ্ট্যে প্রজ্জ্বলিত হয়ে অপ্রমেয় গৌরবে এবং অপরিসীম খ্যাতিতে ভাস্বর ছিল। গঙ্গারিডির সামরিক ক্ষমতার কথা, তাদের অতিশয় উন্নত মানের বৈষয়িক শ্রী ও সমৃদ্ধির প্রভাবে প্রায় প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়ে তদানীন্তন ভারতের সুদূর উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত অর্থাৎ আর্য ভারতের অনেক দূর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।

ধর্মগতভাবেও প্রাচ্য ভারত তথা গঙ্গারিডি তথা বাঙ্গালীদের ছিল সাম্য, ঔদার্য ও বৈরাগ্যের ধর্ম, যা বৌদ্ধ, জৈন, আজীবক এবং তারও আগের দ্রাবিড় সংস্কৃতি এবং ধর্ম ও দর্শনের উপর নির্ভরশীল। সে যুগের বাঙ্গালীর ধর্মচর্যা বৈদিক আর্যদের যাগযজ্ঞবহুল এবং ব্রাহ্মণদের জাতিভেদমূলক গৃহস্থের ধর্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র।[১২]

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ সমন্বিত গঙ্গারিডিদের শক্তির উৎস তার মনুষ্যত্বধর্মী চিত্তবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অঙ্গদেশই পরবর্তী যুগের গৌড়ের মধ্যে বিলীন হয়েছিল, তার ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক সত্তায়। তাই বঙ্গ ও কলিঙ্গের মত অঙ্গও গঙ্গারিডি তথা বাঙ্গালীর আদি বাসভূমি। 'কখনও কখনও মগধ ও মিথিলা বা বিদেহ গৌড়ের অন্তর্গত হইত।'[১৩]

বাংলার ইতিহাসের গৌরবময় যুগে অব্রাহ্মণ্য ও সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই বাংলার লোকেরা শূদ্রদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এক বিরাট ও মহিমান্বিত সাম্রাজ্য স্থাপন করে।[১৪] এ কথা শশাঙ্কের কর্ণসুবর্ণ রাজ্য (খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী) সম্পর্কে যতটা না প্রযোজ্য, তার চেয়ে অনেক বেশী প্রযোজ্য তার প্রায় এক হাজার বছর আগে মহাপদ্ম নন্দের মগধ সাম্রাজ্য স্থাপনের সম্পর্কে।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে সেই প্রাচীন যুগে বাঙ্গালীদের অস্তিত্ব অত্যন্ত ব্যাপক সংজ্ঞার মধ্যে নিহিত ছিল। সেই কারণে সেই যুগের বাঙ্গালী তার প্রাচীন গাঙ্গেয় সভ্যতার দীপ্তিতে উজ্জ্বল এবং গাঙ্গেয় উপত্যকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবগোষ্ঠী ও দেশ হিসেবে পবিত্র (জাহ্নবী) গঙ্গার গৌরবের সঙ্গে জড়িত। তারা উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের আর্যভারতে 'গঙ্গার' বা 'গঙ্গাল' নামে অভিহিত। যা অন্যত্র বলা হয়েছে,

গ্রীকেরা / রোমানরা হয়তো এই গঙ্গার শব্দ থেকেই গঙ্গারিডাই এবং গঙ্গারিডি শব্দ দুটি গঠন করে নিয়েছিলেন।

প্রাচ্যদেশের নন্দ সম্রাটদের সামরিক শক্তি আলেকজাণ্ডার এবং তাঁর অনুচর ও সৈন্যদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করলেও, একক জনগোষ্ঠী হিসেবে গঙ্গারিডিদের প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং বাধাদানের দৃঢ়তার সংবাদে গভীরভাবে বিচলিত হয়েই তাঁরা প্রসিয়াই-গঙ্গারিডাই যুগ্মরাষ্ট্রের সম্মিলিত শক্তিকে আক্রমণ করতে উৎসাহী হন নি। রমাপ্রসাদ চন্দ (গৌড় রাজমালা) মন্তব্য করেছিলেন যে মহাপদ্ম নন্দের আগে আর কোনও ভারতীয় নরপতি অথবা রাজা এই রকম সম্মিলিত প্রতিরোধের পরিকল্পনা করতে সক্ষম হন নি। এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

আলেকজাণ্ডারের আগে পারস্য রাজশক্তি ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সামরিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু দেশের হৃদ-স্পন্দনে তা তেমন কোন বিশেষ উত্তেজনার সঞ্চার করতে সক্ষম হয় নি, যেমন হয়েছিল গ্রীক অভিযানের সময়ে যখন আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদী অতিক্রম করে উত্তর ভারতের কেন্দ্রস্থলে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তখনই প্রয়োজন ছিল অত্যাচারী, লুণ্ঠনকারী, ক্ষমতাগর্বস্ফীত এই বৈদেশিক শক্তিকে সংযত করবার।

সেই সংকটময় মুহূর্তে বাঙ্গালী গঙ্গারিডি আর্যাবর্তের রাজনৈতিক কেন্দ্র মগধ থেকে সার্বভৌম ক্ষমতার আনুকূল্য সংগ্রহ করে প্রতিবেশী ও আত্মীয় কালিঙ্গেয়দের সাহচর্যে এক তীব্র মানসিক প্রেরণাতে এবং বাহুবলে প্রদীপ্ত হয়ে বিদেশী আক্রমণ-কারীকে কঠিন প্রত্যাঘাতের ভয় প্রদর্শন করে ছিল এবং দেশছাড়া করে দিয়েছিল।[১৫] এই উপলক্ষ্যেই বোধহয় ভারতের মৃত্তিকায় সর্বপ্রথম এক মহৎ জাতীয়তাবোধের এবং দেশপ্রেমের জন্ম নিয়েছিল, যার মধ্যে গঙ্গারিডি তথা বাঙ্গালীর অবদান অসামান্য এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—সন্দেহ নেই।

অশোকের অনুশাসনে সুহ্ম, পুণ্ড্র ও বঙ্গের উল্লেখ নেই, কলিঙ্গের আছে। সুতরাং গঙ্গারিডির সঙ্গে অশোকের যুগে মৌর্য সাম্রাজ্যের সংযোগ কলিঙ্গদের মধ্য দিয়েই সংরক্ষিত হয়েছিল। কলিঙ্গের ভৌগোলিক বিন্যাসটি অনুসরণ করলে, বিশেষভাবে বঙ্গ এবং কলিঙ্গের মধ্যে অন্তরঙ্গ ভাবটি প্রকাশিত হবে। অশোকের কলিঙ্গ অভিযানের সম্ভাব্য পথটি অন্বেষণ করলে লক্ষ্য করা যাবে যে তিনি পাটলিপুত্র থেকে ছোটনাগপুর এবং রাজমহলের মধ্য দিয়ে সুহ্মদেশে উপনীত হয়ে কপিশা (সুবর্ণরেখা) অতিক্রম করে উৎকলের পথে কলিঙ্গে এসেছিলেন। অবশ্য সেই যুগে কলিঙ্গের সীমা সুহ্ম-দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশকে স্পর্শ করেছিল, এমন কি গঙ্গারিডিদের তাম্রলিপ্ত বন্দরকেও কলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হতো।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎবঙ্গ' (প্রথমখণ্ড) গ্রন্থে বলেছেন—'উড়িষ্যার তমলুকই প্রাচীনকালে বাঙ্গালীদের প্রধান বন্দর ছিল। অনেকের মতে অশোকের সুপ্রসিদ্ধ কলিঙ্গ যুদ্ধের শত্রুপক্ষ ছিল মেদিনীপুরবাসী বাঙ্গালীরা'। অর্থাৎ গঙ্গারিডিরাই কলিঙ্গীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মগধের সাম্রাজ্যবাদী, স্বৈরাচারী

শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। সুতরাং যে গঙ্গারিডি তথা বাঙ্গালী আগের শতাব্দীতে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছিল মগধের সঙ্গে, সেই গঙ্গারিডিই দেশের শত্রু চণ্ডাশোকের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হয়েছিল কলিঙ্গীদের সঙ্গে, মগধের বিরুদ্ধে। এক প্রচণ্ড অস্ত্র সংঘর্ষের মাধ্যমে অত্যাচারী, নিষ্ঠুর, ক্ষমতালিপ্সু অশোকের মনে প্রগাঢ় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল।

অন্যায়, অত্যাচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সেই অতি প্রাচীন যুগ থেকেই বাঙ্গালী সিদ্ধহস্ত। আগ্রাসী মগধের বিশাল সৈন্যবাহিনী পাটলিপুত্র থেকে কলিঙ্গ পর্যন্ত দীর্ঘ পথ অতিক্রমের সময় ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন, এবং নিরীহ মানুষের হত্যার মধ্যে নৃশংসতার চরম স্বাক্ষর স্থাপন করেছিল।[১৬]

আগেই বলা হয়েছে যে বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম পর্যায়ে কলিঙ্গ সম্বন্ধে কোন নির্দেশ নেই। উড্র অথবা উৎকল সম্বন্ধেও কোন প্রসঙ্গ নেই। আদি যুগে কলিঙ্গের রাজারা চন্দ্রবংশীয়। কিন্তু মহাভারতীয় এবং পৌরাণিক সূত্রে কলিঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার আর্য-ক্ষাত্রিয়ত্বের গৌরব থাকলেও, কলিঙ্গাধীশের এই জাতিগত কৌলীন্য সংশয়ের অতীত নয়। কারণ, কলিঙ্গের তৃতীয় রাজবংশের খারবেল অনেক ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতের মতে দ্রাবিড় বংশ সম্ভূত।[১৭]

কলিঙ্গদেশে খারবেলের সময়ে (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) জৈন ধর্ম প্রবল ছিল এবং পরবর্তী যুগে এই দেশে বৌদ্ধ ধর্মের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। অন্ততঃ তাম্রলিপ্ত, যাকে কলিঙ্গীদের বাঙ্গালী বন্দর অথবা বাঙ্গালীদের কলিঙ্গী বন্দর বলে গণনা করা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে, চৈনিক পরিব্রাজকগণ কর্তৃক এবং বৌদ্ধ সাহিত্যে বৌদ্ধ বন্দর বলে বর্ণিত হয়েছে।[১৮]

মনে হয়, কলিঙ্গের আর্যীকরণ বঙ্গদেশের মতোই গুপ্তযুগের আগে সম্ভব হয় নি। পশ্চিমবঙ্গের (গৌড়সহ দক্ষিণ পুণ্ড্র, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত) মতোই প্রাক-আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতি কলিঙ্গকেও প্রভাবিত করেছিল। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ প্রভৃতি দেশে এবং বিশেষভাবে বঙ্গদেশে পুণ্ড্র, সুহ্ম, বঙ্গ) এবং কলিঙ্গে আর্যভাষার মাধ্যমেই সভ্যতা এবং সংস্কৃতির রূপান্তর সম্পন্ন হয়। এই সব অঞ্চল চিরদিনই খাঁটি আর্যাবর্তের প্রান্তিক অঞ্চল বলে পরিগণিত হয়েছিল ঠিক তেমনই ভাবে, যেমনভাবে গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং দক্ষিণী দ্রাবিড় রাজ্যগুলি প্রকৃত আর্যবহির্ভূত অঞ্চল বলে চিহ্নিত ছিল।[১৯]

যখন উড্র বা উৎকল এই সব নামের প্রচলন হয় নি, সেই অজ্ঞাত সুদূর অতীতের যুগেও কলিঙ্গ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। মহাভারতে তিনটি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে নির্দেশ করতে কলিঙ্গ নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। কলিঙ্গ দেশ ছিল পূর্ব সমুদ্রের গঙ্গার সঙ্গম স্থল থেকে সুদূর দক্ষিণে কৃষ্ণা নদীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত।[২০]

হাণ্টার সাহেব যথার্থভাবেই মন্তব্য করেছেন ('Orissa' গ্রন্থে) যে সংস্কৃত সাহিত্যে যেমনভাবে সব সময়ে উত্তরবঙ্গীয় বিভাগগুলির পরেই নিম্নবঙ্গীয় অঞ্চলগুলি

উল্লিখিত হয়েছে, ঠিক তেমনভাবেই নিম্নবঙ্গীয় অঞ্চলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে কলিঙ্গের নামটি সর্বদা লিখিত হয়েছে। ত্রিকলিঙ্গ নামের মধ্যে সুপ্রাচীন এবং সুবিখ্যাত কলিঙ্গদেশের ব্যাপক ভৌগোলিক বিন্যাস এবং তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক বিভাগের অবস্থাটি আমাদের মনের মধ্যে পরিস্ফুট হয়। কিন্তু ত্রিকলিঙ্গ নামটি কত প্রাচীন এবং এই নামের সঠিক তাৎপর্যই বা কি ?

ত্রিকলিঙ্গ এই নামটি অন্ততঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লিখিত প্লিনীর সমসাময়িক, এই কথা বলেছেন, "The Ancient Geography of India" গ্রন্থে Sir Alexander Cunningham. কিন্তু সঠিক ঐতিহাসিক বিবেচনায় এ'কথা প্রতীয়মান হয় যে ত্রিকলিঙ্গ অভিজ্ঞান প্লিনীর সময়ের থেকেও অনেক অতীতের গর্ভে নিহিত। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকেই কলিঙ্গদেশ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন প্লিনী। এ কথাও আমরা জানি যে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও কলিঙ্গের কথা আছে, বিশেষ করে কলিঙ্গের হাতির কথার উল্লেখ আছে।

মেগাস্থিনিসের সূত্র থেকেই প্লিনী বলেছিলেন যে কালিঙ্গেয়ীরা সমুদ্রের সবচেয়ে নিকটবর্তী অঞ্চলে বাস করে এবং তাদের রাজা বাস করে পোর্তালিস অথবা পার্থালিসে।[২] সুতরাং পার্থালিস যদি বর্ধমান অথবা পূর্বস্থলী হয়, তবে সেই স্থানগুলি তখন সমুদ্র থেকে খুব দূরে নিশ্চয়ই ছিল না এবং সেগুলি নিম্নবঙ্গেই ছিল। সমুদ্র যে গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ীদের দেশের সন্নিহিত ছিল তাতে সন্দেহ নেই এবং গঙ্গার তথা সরস্বতী, দামোদর, রূপনারায়ণের মোহনা ছিল এই রাজধানীর অনতিদূরে না হলেও অনেক দূরে নয়।

অনেক প্রাচীন হিন্দুর বিশ্বাস যে গোদাবরী পবিত্র গঙ্গারই একটি শাখা। হয়তো গ্রীক লেখকেরা এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে অনুমান করেছিলেন যে তেলেগু জনগোষ্ঠীর দুটি প্রধান বিভাগ—যথাক্রমে অন্ধ্রেরা এবং কলিঙ্গীরা, গাঙ্গেয় জাতি।

কলিঙ্গের রাজধানী বলে বর্ণিত রাজা সিংহবাহুর প্রতিষ্ঠিত সিহপুর (সিংহপুর) সমুদ্র থেকে বেশী দূরে অবস্থিত ছিল বলে বোধ হয় না। তাম্রপর্ণী (সিংহল) থেকে আরম্ভ করে পূর্ব সমুদ্রের উপকূল সন্নিহিত কলিঙ্গদেশের অন্তর্গত বেশ কয়েকটি বন্দরের নাম জানা যায়। টলেমির মানচিত্রে যে 'কালিগা' নামটি পাওয়া যায়, সেটি খুব সম্ভব কালিগাঁও বা কলিঙ্গপট্টম বন্দর ছিল।

ত্রিকলিঙ্গ নামটির সঙ্গে বর্তমান অন্ধ্রের তেলিঙ্গনা নামটি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত, এ কথাও কেউ কেউ বলেছেন (Ancient India as Described by Ptolemy— J. W. Mccridle পৃঃ ২৩৪ দ্রষ্টব্য)। আমরা ত্রিকলিঙ্গ অর্থাৎ কলিঙ্গের তিনটি বিভাগের বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করবো কেমনভাবে কলিঙ্গের দক্ষিণতম অংশটি শেষ পর্যন্ত কলিঙ্গ নাম ধারণ করে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। বর্তমানে যেমন অনেক পুরানো নাম কালের কবলিত হয়ে বিলুপ্ত হয়েছে, তেমনই কলিঙ্গ নামটিও বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে—বেঁচে আছে তার ঐতিহ্যের রেশটি এবং বোধহয় তার সাংস্কৃতিক স্পর্শটি।

কিন্তু বর্তমান ইতিহাস এবং ভূগোল থেকে কলিঙ্গ অন্তর্হিত হলেও, উড়িষ্যার মধ্যেই কলিঙ্গ তার অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। কৌতুকের বিষয় এই যে কলিঙ্গের ভাষা, সংস্কৃতি, অঙ্গীভূত হয়েছে অন্ধ্রদের সঙ্গে, যে অন্ধ্রেরা এক প্রাচীন জনগোষ্ঠী বলে পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। তবে উড়িষ্যা পর্যন্ত যেমন আর্যসভ্যতা তার প্রভাব বিস্তার করেছে, কলিঙ্গ কিন্তু দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ভিত্তিক সংস্কৃতির মধ্যে আরও নিরাপদ আশ্রয় লাভ করেছে। সেইজন্য বর্তমান বাঙ্গালীর সঙ্গে কলিঙ্গের নিবিড় সম্পর্ক খুঁজতে গেলে, আমাদের উড়িষ্যার মধ্য দিয়েই সেই যোগসূত্রগুলি অন্বেষণ করতে হবে। অবশ্য দ্রাবিড়দের সঙ্গে বাঙ্গালীরও প্রাচীন কালে নিবিড় সম্পর্ক ছিল—যা আগেই আলোচিত হয়েছে।

বৈদেশিক সূত্রে আমরা যে ত্রিকলিঙ্গের পরিচয় লাভ করি তার মধ্যে প্রবেশ করার আগে আমাদের দেশীয় সূত্রে প্রাপ্ত এই সংক্রান্ত তথ্যগুলি আলোচনা করা কর্তব্য। মেদিনীপুর এবং বালেশ্বর থেকে আরম্ভ করে ব্রাহ্মণী এবং বৈতরণী নদীর উত্তরে ভূভাগ সমেত দেশকে বলা হতো উৎকল। তারপরে দেশের মধ্য অংশ যার মধ্যে পুরী, কটক এবং গঞ্জাম জেলার উত্তরভাগ অন্তর্ভুক্ত, তার সঙ্গে মহানদীর দুকূলবর্তী ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যগুলি নিয়ে অভিহিত হতো তোসালী। খুব সম্ভবতঃ চিল্কা হ্রদ এবং মহেন্দ্র পর্বতের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলই কোঙ্গদ বলে চিহ্নিত হতো, কারণ একটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে কোঙ্গদ তোসালীর দক্ষিণে অবস্থিত ছিল।[২২] চিল্কা থেকে গোদাবরী নদীর বদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগই হিউ-এন-সাঙের বর্ণনায় প্রকৃত কলিঙ্গ দেশ।

প্লিনী গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ী জাতির সঙ্গে বৃহত্তর কলিঙ্গী জাতির আর দুটি শাখার কথা বলেছেন—মক্কোলিঙ্গী, মদকালিঙ্গী। মদকালিঙ্গীরা গঙ্গার উপর একটি খুব বড় দ্বীপে এককভাবে বাস করতো।[২৩] এই দ্বীপ তাম্রলিপ্ত বা তার নিকটবর্তী কোন স্থান হওয়া অসম্ভব নয়।

প্লিনীর গঙ্গারিডেই-কালিঙ্গেয়ীদের বর্ণনা থেকে ভিভিয়ান সেণ্ট মার্টিনের এই অভিমত যে কলিঙ্গীদের তিনটি শাখা ছিল এবং তাদের রাজধানী ছিল পার্থালিস, যে স্থানকে বর্তমান বর্ধমান শহরের কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত পূর্বস্থলী বলে এক বড় গ্রামের সঙ্গে এক মনে করা হয়েছে।[২৪] কিন্তু এ বিষয়ে মতানৈক্য আছে, যদিও পার্থালিস গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ীদের রাজধানী হওয়াই সম্ভব, বৃহত্তর কলিঙ্গদেশের নয়।

এর থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কলিঙ্গীদের একটি শাখা রাঢ়দেশে বাস করতো এবং সম্ভবতঃ বাঙ্গালীদের সঙ্গে তাদের রক্তের সম্পর্ক ছিল। বঙ্গভূমি এবং কলিঙ্গের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রাচীন ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে।

ত্রিকলিঙ্গ সম্বন্ধে অন্যত্র বলা হয়েছে—এখানে কলিঙ্গ অর্থে প্রকৃত কলিঙ্গ, মধ্য-কলিঙ্গ, উড়িষ্যা এবং গাঙ্গেরিড কলিঙ্গ, রাঢ় (পৌরাণিকা ১ম খণ্ড)। কলিঙ্গদেশের ত্রিকলিঙ্গ সংজ্ঞার ব্যাপ্তি, তাৎপর্য এবং ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণে আমরা লক্ষ্য করি যে ব্যক্তিবাচক কলিঙ্গ যেমন পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে সুহ্ম, পুণ্ড্র,

বঙ্গ ও অঙ্গের সঙ্গে আবদ্ধ, বাস্তব ক্ষেত্রেও সংস্কৃতি, অর্থনীতির দিক থেকেও এই দেশগুলির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। 'অশোকের কালে—খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এবং তারপরেও বহু শতাব্দী ধরে অঙ্গ-বঙ্গ মগধ-পুণ্ড্রের মধ্যে জনগত, বিশিষ্ট আচরণগত ও ভৌগোলিক পারিপার্শ্বিক ছাড়া বিশেষ বিভেদ ছিল না ......খৃষ্ট-পূর্বকালে কলিঙ্গ বলতে অন্ততঃ তিনটি বিষয় বোঝাতো—একটি দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার সংলগ্ন অঞ্চল—অর্থাৎ ঝারিখণ্ড, যা তখন ভাষায় হয়তো নয় সংস্কৃতিতে সুহ্মের ঘনিষ্ঠ ছিল।......প্লিনী যাদের বলেছেন গাঙ্গেয় কলিঙ্গ (Gangarides-Calingae), তারাই মনে হয় মধ্যকলিঙ্গ (কালিদাসের উৎকল, হিউএন সাঙের ওড্ড)।'[২৫]

ভাষার দিক থেকেও প্রচণ্ড সাদৃশ্য, বিশেষ করে মৈথিলী, ওড়িয়া, বাংলা এবং অসমীয়ার মধ্যে। বাংলা ও মিথিলার আত্মিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ প্রাচীন কাল থেকে এক বিবর্তনের ধারায় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল। ওড়িয়া, বাংলা এবং অসমীয়ার লিপি অনেকদিন পর্যন্ত একই ছিল।[২৬] 'ভাষাতত্ত্ববিদরা বলেন যে উড়িয়া, অসমীয়া আর বাংলা পরস্পরের সহোদরা বোন। এবং তাদের মধ্যে উড়িয়াই, বড় বোন। হাজার বছরের প্রাচীন বাংলার ধ্বনি ও ব্যাকরণ বুঝতে গেলে পুরানো উড়িয়া শিখতে হবে।...' (বৃহত্তর বাঙ্গালী - দেবেশ দাশ)।

'বাঙ্গালীর প্রতি উৎকলবাসীর যে গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়েছি, তা ভুলতে পারবো না কোন দিন'—এই কথা বলেছেন বিনয় ঘোষ, 'বাংলার লোক-সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব' গ্রন্থে। উড়িষ্যার গ্রামের 'ভাগবত-ঘর' বাংলার গ্রামের চণ্ডী-মণ্ডপেরই অন্য একটি সংস্করণ।

এখনও অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের (কলিঙ্গ বলতে এখানে উড়িষ্যা ধরতে হবে) গ্রামে গ্রামে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী আদিম জাতিগুলির কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির রীতিগুলি লক্ষ্য করলে মনে হয় যে বোধহয় রাজনৈতিক বিভেদ ব্যতীত এদের মধ্যে বিশেষ কোন হৃদয়গত ব্যবধান নেই। ভাষা ও সংস্কৃতির যে নৈকট্য প্রাচী, অথবা প্রাচ্য রাজ্যসমূহে বিদ্যমান ছিল ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে এবং আরও বহু শতাব্দী পর্যন্ত, তা মূলতঃ আর্য এবং অনার্যের সংঘাত এবং প্রাচ্যে আর্যদের ক্রমিক অগ্রগতির পুরাবৃত্তের অঙ্গীভূত হয়েছে।

পূর্ব সমুদ্র পর্যন্ত আর্যীকরণ সম্পূর্ণ হবার পরে ক্রমশঃ মধ্যদেশ এবং প্রাচীর মধ্যে ভাষাগতভাবে আত্মীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল সন্দেহ নেই। সংস্কৃত, বিশিষ্টজনের এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চতর বর্ণের ভাষা বলে পরিগণিত হওয়ার কারণে এবং রাজধর্ম, আধ্যাত্মিক ধর্ম, সাহিত্য ধর্ম প্রভৃতিতে ভাষারূপে গণ্য হওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায়, ধর্মও সংস্কৃতির বাহনে রূপান্তরিত হয়েছিল।

কিন্তু প্রাচ্যভূমিতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে সুহ্ম, পুণ্ড্র প্রভৃতি রাজ্যে ভাষাগত যে ঐক্য অনেকদিন পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়েছিল, তার প্রধান কারণ ছিল দুটি। প্রথম কারণ, এই সকল রাজ্যের বেদবিরুদ্ধ এবং যজ্ঞবিহীন পরিবেশে জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যবিরোধী প্রতিবাদী ধর্মমত সঞ্জাত হওয়ায়, মাগধী কথ্যভাষার, যাকে

প্রাকৃত বলা হতো, অপভ্রংশের মধ্যে এক শব্দ এবং লিপিবাচক সাদৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। দ্বিতীয় কারণ, সাধারণ মনকে এই সকল অবৈদিক ধর্মমতে আকৃষ্ট করার জন্য, তাদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারগুলি আত্মসাৎ করার সঙ্গে সঙ্গে, তাদের বোধগম্য কথ্য ভাষার সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছিল। বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া প্রভৃতি ভাষার জন্মের কথা চিন্তা করলে আমাদের উপর্যুক্ত দুটি কারণকেই বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হয়।

পৌরাণিক গ্রন্থে বলিরাজার পুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম—এদের আর্য ক্ষত্রিয় হিসেবে স্বীকৃতির কথা জানা যায়। এই সব রাজ্যে আর্য ব্রাহ্মণদের করতোয়া, গঙ্গা-ভাগীরথীর অববাহিকায় এবং সাগর সঙ্গমে (কপিল মুনির আশ্রমে) পবিত্র তীর্থস্থানগুলিতে তীর্থযাত্রায় আগমনের কথা ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য থেকেও অবগত হওয়া যায়। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিতে আর্য ব্রাহ্মণেরা এই দেশীয় লোকেদের অনেক দিন পর্যন্ত আর্য গোষ্ঠীভুক্ত বলে বিবেচনা করেন নি।

কিন্তু এই সব রাজ্যে আর্যদের আগমনের আগে অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড় জাতি তাদের প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিল। তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি আর্যদের ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে অনেক পরিশীলিত, হৃদয়গ্রাহী এবং উদার। অনেকে এই সভ্যতাকে 'অসুর' সভ্যতা বলে অভিহিত করেছেন এবং অনেক পণ্ডিত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গে এই অসুর সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাকে সিন্ধুসভ্যতার বাহক ও উত্তরসুরী বলে বিবেচনা করেছেন। বৈদিক সাহিত্যে এই সব অনার্যদের (পুণ্ড্র প্রভৃতি রাজ্যের) দাস, দস্যু, অসুর প্রভৃতি বলা হয়েছে। রাঢ় দেশের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও অসুর ভাষার রেশের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। সিন্ধু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও সমসাময়িক নিদর্শন ঐতিহাসিক যুগে কোন কোন রাজ্যে পরিলক্ষিত হয়, এবং তার তাৎপর্যই বা কি এবং আমাদের গঙ্গারিডি সমীক্ষায় তার যোগই বা কি, এগুলি বিশদভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে।

শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে জানা যায় যে ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশকারী আর্যদের যজ্ঞাগ্নি সরস্বতী নদীর তীর থেকে গঙ্গার উত্তর উপকূল দিয়ে অগ্রসর হয়ে সরযূ, গণ্ডক, কোশী নদী অতিক্রম করে সদানীরা (অধুনা রাপ্তী) নদীর পশ্চিমকূলে পৌঁচেছিল। সেই যজ্ঞাগ্নি মগধ, দক্ষিণ বিহার, বঙ্গ (সমগ্র বঙ্গদেশ) প্রভৃতি দেশে প্রবেশ করেছিল বলে উল্লিখিত হয় নি। মহাভারতীয় যুগের পরেও, বর্তমান বিহার এবং বাঙ্গলায় যে আদি স্থানীয় লোকেদের প্রভাবই শক্তিশালী ছিল, এবং সেই স্থানীয় জাতি বা গোষ্ঠী আর্য অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গঠন করেছিল, তাদের বিরুদ্ধেই আর্য ব্রাহ্মণেরা বিষোদ্গার করেছেন। ঐতিহাসিক যুগে প্রধানতঃ আর্য ভাষার (সংস্কৃত) প্রভাবেই অঙ্গ, বঙ্গ, প্রাগজ্যোতিষ সমন্বিত পূর্বভারতে এবং দক্ষিণ-ভারতে আর্যদের সাংস্কৃতিক বিজয় সম্পন্ন হয়। প্রাচ্য ভারতে এবং দাক্ষিণাত্যে আর্যেরা সামরিক শক্তিতে জয়লাভ করে নি, করেছিল সংস্কৃতির মাধ্যমে।[২৭]

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর "বৃহৎ বঙ্গ" গ্রন্থে পূর্বভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিবর্তনের

মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে তাদের সংঘাতের উপর আলোকপাত করে যে মূল্যবান মন্তব্যগুলি করেছিলেন, সেগুলিও এই স্থানে স্মরণীয়। "......পরবর্তী কালে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম-বন্যায় পূর্ব-ভারত ভাসিয়া গিয়াছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণেরা এই দেশকে তাঁদের গণ্ডির বহির্ভূত করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্রে অনেক শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করিয়া সমস্ত পূর্বভারতকে কলঙ্ক-লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ এমনকি সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত বৃহৎ জনপদকে তাঁহারা আর্যগণ্ডির বহির্ভূত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন,—যাঁহারা তীর্থযাত্রার উপলক্ষ্য ভিন্ন এই সকল দেশে গমন করিবেন, তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া স্বদেশে ফিরিবার অধিকার লাভ করিতে হইবে।"

এই গঙ্গারিডি দেশ জাতি নির্ণয়ের সমস্যা সমাধানে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ—এই মৃত্তিকাখণ্ডের ত্রয়ী মূর্তির তাৎপর্য সংক্ষেপভাবে বিশ্লেষণ করা সমীচীন। মগধ রাজ্য নিঃসন্দেহে গ্রীক ও লাতিন লেখকগণ বর্ণিত প্রাসী বা প্রাসাই। অবশ্য এই শব্দের দ্বারা সমগ্র প্রাচ্য দেশ অথবা দেশ এবং জাতিকেও ওঁরা বুঝিয়ে থাকতে পারেন। গঙ্গারিডি এবং প্রাসীর প্রসঙ্গটি বিস্তারিতভাবে অন্যত্র বিশ্লেষিত হয়েছে।

ইতিমধ্যে আমরা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের অবস্থিতির ব্যাপক দর্পণের মধ্যে গঙ্গারিডির চিহ্নিতকরণে মূলতঃ নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় পশ্চিমবঙ্গকেই পরিস্কারভাবে লক্ষ্য করি। অঙ্গ এবং কলিঙ্গ নিঃসন্দেহে গৌড় এবং সুহ্ম তথা রাঢ়বাংলার সন্নিহিত অঞ্চল, কোন কোন সময়ে একে অপরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল কিন্তু আপন আপন বৈশিষ্ট্য এবং অস্তিত্ব হারায় নি।

বঙ্গ বলতে এখানে কি বুঝিয়েছে? সংস্কৃতিগতভাবে বঙ্গ বলতে এখানে স্থান, কাল এবং পাত্র বিবেচনায় শুধুমাত্র দক্ষিণ পূর্ব বা পূব বঙ্গকে নির্দেশ করে নি, যদিও ইতিহাসগতভাবে মহাভারতের যুগ থেকে বঙ্গ বলতে প্রধানতঃ বঙ্গদেশের পূর্ব এবং মধ্য-দক্ষিণ অংশকে বুঝিয়েছে। সেই যুগে বৈদিক আর্যেরা যে সব অঞ্চলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল, সেই সব অঞ্চলগুলিকেই তারা সেই সেই নামে অভিহত করেছিল। তাহলে, বেশ পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে অঙ্গ ও কলিঙ্গের সঙ্গে বর্তমানের পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিমাংশ সংশ্লিষ্ট এবং বঙ্গের সঙ্গে গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্বাংশ সংশ্লিষ্ট।

জৈন ভগবতীসূত্রে যে ষোলটি কৌমের উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রথমেই অঙ্গ ও বঙ্গ। পরবর্তী যুগের বৌদ্ধ সাহিত্যে অঙ্গ ও বঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। পণ্ডিত এস লেভির মতে 'অঙ্গ হলো বর্তমান ভাগলপুর জেলা আর 'বঙ্গ' বাংলার বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়াজেলা (S. Levi-Pre Aryan and Pre Dravidian in India—Translated by Dr. P. C. Bagchi)।[২৮]

কলিঙ্গের উত্তর-পশ্চিম অংশ তো মেগাস্থিনিসের বিবরণের ভিত্তিতে গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ী বলে বর্ণিত হয়েছে (প্লিনী)। সুতরাং গঙ্গারিডি তথা বাঙ্গালীর দেশ ও জাতি চিহ্নিতকরণে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ যুগপৎ সংকীর্ণ অর্থে এবং ব্যাপক অর্থে,

ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। 'অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ শুধু রাষ্ট্রবিভাগ বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হত না, একই সংস্কৃতি-সঙ্গমের অঞ্চল বলে মনে করা হত।' (বৃহত্তর বাঙ্গালী—দেবেশ দাশ)।

ঐতিহাসিক যুগে বঙ্গের ব্যাপক সংজ্ঞা সম্বন্ধে সমসাময়িক ধর্মগ্রন্থে ও সাহিত্যে যে প্রতিফলন হয়েছে এই স্থানে তার উপর কিছু আলোকপাত প্রয়োজন। বঙ্গের এই অভিধার মধ্যে যে অঞ্চল অঙ্গীভূত হয়েছে, সেই অঞ্চলের পশ্চিম অংশের সঙ্গে অবশ্যই গঙ্গারিডির নিবিড় সম্পর্ক আছে। বঙ্গ বলতে প্রাচীনকালে যে ভূখণ্ডকে বোঝাতো, সেই বিষয়ে শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে লিখিত আছে ঃ—

রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ ॥

অর্থাৎ, সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত ভূভাগই বঙ্গদেশ। ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন যে বঙ্গ ব্রহ্মপুত্রের পূর্বভাগে কি পশ্চিমভাগে অবস্থিত। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমেও যে বঙ্গ রাজ্য বিস্তৃত ছিল, সে বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রমাণ স্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন যে মধ্যম পাণ্ডব ভীম তাঁর দিগ্বিজয়ের সময়ে গিরিব্রজ, মোদাগিরি, পুণ্ড্র, কৌশিকিকচ্ছ জয় করে বঙ্গরাজকে আক্রমণ করেছিলেন এবং পরে তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সুহ্ম এবং সাগর তীরবর্তী ম্লেচ্ছগণকে বশীভূত করে লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) তীরে উপনীত হন। ভীম লৌহিত্য অতিক্রম করে তার পূর্বতীরবর্তী ভূখণ্ডে গিয়েছিলেন বলে কোন প্রমাণ নেই। এই মন্তব্য করে তিনি তাঁর উপরে উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে মহাভারত রচনার যুগে (খৃঃ পূঃ অষ্টম/সপ্তম শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দী) বঙ্গ যে লৌহিত্যের পশ্চিমেও বিস্তৃত ছিল ইহা সুনিশ্চিত।[২৯]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বঙ্গ বলতে সুপ্রাচীন যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগের সূচনা পর্যন্ত গঙ্গার পূর্বে ও ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমে আদিম এবং নির্মীয়মান ভূভাগকেই বোঝাতো। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের কালে উত্তরপশ্চিম ভারতের আর্যদের কাছে এই বঙ্গ নামটি অপরিচিত অথবা অজ্ঞাত থাকার কথা নয়, এবং এই অপরিচিতির কোন যুক্তিও নেই। যেহেতু সেই প্রাচীন যুগে (ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে ও তার পরেও) বঙ্গজাতির সঙ্গে লৌহিত্য অথবা ব্রহ্মপুত্রের সম্পর্কই ঘনিষ্ঠ, গঙ্গারিডি বলতে প্রত্যক্ষভাবে বঙ্গকে বোঝানো হয় নি, যদিও একটি চৈনিক বিবরণ অনুযায়ী (খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী/খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী) সমুদ্র-তীরবর্তী গাঙ্গীরাজ্য এই গঙ্গারিডি দেশের সমার্থক এবং "পোরপ্লাস" গ্রন্থকার কর্তৃক বর্ণিত 'গঙ্গা' দেশের সঙ্গে অভিন্ন।[৩০]

এই দিক থেকে বিচার করলে মনে হয় যে খৃষ্টীয় যুগের ঠিক আগে এবং পরে এই গঙ্গারাজ্য বা গাঙ্গেয় ভূমি গঙ্গাহৃদয় (heart of the Ganges) বলে অভিহিত হতো এবং এই রাষ্ট্র অথবা দেশ অথবা জাতি পুণ্ড্র বা বঙ্গ থেকে স্বতন্ত্র। কৌষীতকি উপনিষদে গঙ্গাদেশের রাজার কথা বলা হয়েছে।[৩১] এর থেকেই পরিষ্কার হয় যে রাজ্য হিসেবে গঙ্গা নামও বেশ প্রাচীন, এবং এই নামের দ্বারা কলিঙ্গ এবং মগধের

মধ্যবর্তী গঙ্গা ভাগীরথীর দুই উপকূলের সাগর-সঙ্গম পর্যন্ত ভূভাগকেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হতো। এর মধ্যে প্রাচীন বঙ্গের কিছু অংশ, যা হয়তো তখন ক্ষুদ্র দ্বীপের সমষ্টি ছিল, অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আমরা এই তিন দেশেই অর্থাৎ অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গে রেশম শিল্পের উল্লেখ লক্ষ্য করি। এই বিবরণের মধ্যে বলা হয়েছে :—

'মাগধিকা, পৌণ্ড্রিকা, সৌবর্ণকুড্যকা চ পত্রোর্ণা'।

রেশমের খুব উৎকৃষ্ট কাপড়ের নাম ছিল পত্রোর্ণ।

পত্রোর্ণ শব্দের অর্থ,—কীট পাতা খেয়ে যে রেশম বার করে। কোথায় পাওয়া যেত এই বিচিত্র বর্ণের পত্রোর্ণ, তা আগেই বলা হয়েছে। মগধের দক্ষিণ বিহারের পথে প্রান্তরে জন্মাতো এই রেশমকীট বৃক্ষ। সুপ্রাচীন কালে পৌণ্ড্রদেশে (বরেন্দ্র ভূমি উত্তরবঙ্গে) ও সুবর্ণকুড্যে (টীকাকারদের নিকট কামরূপের কাছে কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে কর্ণসুবর্ণ; অর্থাৎ, আধুনিক কালের মুর্শিদাবাদ ও রাজমহল জেলাই সেই সুদূর অতীতের সুবর্ণকুড্য) অজস্র ও অগণন এই রেশম কীটের বৃক্ষ দেখা যেত।[৩২]

মহামহোপাধ্যায় ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর "প্রাচীন বাংলার গৌরব" এই গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—'কিন্তু কামরূপের নিকট যে রেশম এখন হয়, তাহা ভেরেণ্ডা পাতায় হয়, (অর্থাৎ পত্রোর্ণ নয়)। আমি বলি, সুবর্ণকুড্যেরই নাম শেষে কর্ণসুবর্ণ হয়। কর্ণসুবর্ণও মুর্শিদাবাদ ও রাজমহল লইয়া। এখানকার মাটি সোনার মত রাঙ্গা বলিয়া এদেশকে কর্ণসুবর্ণ, কিরণসুবর্ণ ও সুবর্ণকুড্য বলিত। এখানে এখনও রেশমের চাষ হয় এবং এখানকার রেশম খুব ভালো।...'

বাঁকুড়া এবং হুগলী জেলায় যে বহু পুরাকাল থেকেই রেশম শিল্পের প্রবর্তন হয়েছিল, এ কথা বোধহয় সর্বজনবিদিত।

পাটলিপুত্র, চম্পা, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমির বন্দরগুলি শুধু বাংলার নয়, সমগ্র পূর্বভারতের বাণিজ্য বহন করতো। এর মধ্যে অবশ্য তাম্রলিপ্তই ছিল মুখ্য বন্দর। গঙ্গারিডি জাতির সামরিক শক্তি ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি, তার সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং কৃষ্টির মতোই উন্নত মানের ছিল। কৃষিই ছিল দেশের প্রধান সম্পদ। মিশর দেশকে যেমন Gift of the Nile অর্থাৎ নীল নদের দান বলা হয়, তেমনই উত্তর ভারত অর্থাৎ আর্যাবর্তকে সিন্ধু ও গঙ্গার দান বললে অত্যুক্তি হবে না।

পলিমাটিসমৃদ্ধ গঙ্গার নিম্নভাগই সমতলভূমি এবং সবিশেষ উর্বর। গঙ্গার সমুদ্রের মুখগুলি সহ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের সম্পূর্ণ অংশই গঙ্গারিডির অধিকারে ছিল। সুতরাং গঙ্গারিডির অন্তবর্তী ছিল কলিঙ্গের সমুদ্র তীরবর্তী গাঙ্গেয় ভূমি (অর্থাৎ বর্তমান মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ ও বালেশ্বরের কিয়দংশ), প্রায় সম্পূর্ণ অঙ্গদেশ এবং প্রাচীন বঙ্গের গঙ্গার (গঙ্গা-ভাগীরথীর) পূর্ব উপকূলের অংশ, এবং গৌড়, রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত। পুণ্ড্রদেশের কিয়দংশ গৌড়ের সঙ্গে অভিন্ন, সেই কারণে পুণ্ড্র দেশের নাম এখানে স্বতন্ত্রভাবে করা হচ্ছে না। গাঙ্গেয় নিম্নভূমির প্রসঙ্গে স্মরণ করা

যায় যে হাণ্টার সাহেব বীরভূম এবং বাঁকুড়া জেলাকে নিম্নবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করেছেন।[৩৩] সুতরাং এই দুটি প্রাচীন ভূভাগও গঙ্গারিডির অন্তর্গত ছিল, যেমন ছিল গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্ব উপকূলস্থ তৎকালীন গঠিত ভূখণ্ড।

অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের খনিজ সম্পদের বিষয়ে যথাস্থানে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হবে। সেইদিক থেকে বিচার করলেও প্রধানতঃ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গসহ পূর্ব বিহার এবং উত্তর-পূর্ব কলিঙ্গের মধ্যেই এই সম্পদ সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্ব ভারতের প্রধান বন্দর ছিল তাম্রলিপ্ত এবং অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের নির্দিষ্ট ভূভাগগুলি ছিল এই বন্দরের বিস্তীর্ণ পশ্চাতভূমি যেখানে নানারূপ শিল্প / ব্যবসায় এবং বাণিজ্য প্রভৃতির কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় গঙ্গারিডি ও প্রাসাই দেশ / জাতির উন্নতি এবং সমৃদ্ধির লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। (যথা বস্ত্র, রেশম, লৌহ, মৃৎ)

এই কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে এই অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ সমন্বিত গঙ্গারিডি দেশে তাম্রলিপ্তের পরেই বন্দর হিসেবে আমরা সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির কথা জানি। প্রধান ভূখণ্ডের অংশরূপে এই বিরাট পশ্চাতভূমির বহির্বাণিজ্য এবং আন্তর্বাণিজ্য বহন করার ক্ষমতা তাম্রলিপ্তের পরে সপ্তগ্রামেরই ছিল। দেশের দক্ষিণ প্রান্তের সমুদ্র মোহনায় অবস্থিত গঙ্গানদীর তৎকালীন প্রধান খাত (শাখা) সরস্বতী নদীর প্রবাহে সপ্তগ্রাম এবং দামোদর, রূপনারায়ণ পুষ্ট সরস্বতীর অপর সাগর মুখের খাড়িতে প্রাচীনতর তাম্রলিপ্ত বন্দর ব্যতীত অন্য কোন আন্তর্জাতিক বন্দর পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় উপকূলে ছিল কিনা, তা গভীর বিবেচনা এবং গবেষণার বিষয়।

ভারতের ইতিহাসে সিন্ধু সভ্যতার পরের পর্যায়েই বোধহয় গাঙ্গেয় সভ্যতা। সেই সুদূর অতীতে আর্যদের (Indo-Aryans) ভারতে আগমনের পরে পঞ্চনদের দেশ থেকে আরম্ভ করে পূর্বমুখী সরস্বতী-গঙ্গাকে অনুসরণ করে এবং পুণ্যবাহিনী—জাহ্নবী-ভাগীরথীর প্রাচীনতম প্রবাহকে আলিঙ্গন করে যে প্রাচীন আর্য সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল, সেই নবাগত সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতার সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাবে পুষ্ট গঙ্গারিডিদের মধ্যে এক অত্যন্ত সচেতন, সক্ষম ও শক্তিশালী প্রতিপক্ষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর সাক্ষাৎ লাভ করেছিল।

প্রাচীন গঙ্গারিডি দেশ / জাতি বঙ্গদেশে আর্যদের বাহুবলের দ্বারা জয়ের আশাকে বার বার ব্যর্থ করে দিয়েছিল এবং প্রথমে মহাপদ্ম নন্দ এবং পরে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের অধীনে প্রাচ্য ভারতে আর্য ক্ষাত্রিয় শক্তির অগ্রগতিকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করেছিল। সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং প্রচারে সমৃদ্ধ বৌদ্ধধর্মের প্রবল স্রোত আরও দীর্ঘকাল মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও কামরূপকে আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব অস্বীকার করতে প্রণোদিত করেছিল।

নির্দেশিকা

১। Tribes in Ancient India. —Dr B. C. Law.

২। ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায়মীয়ুঃ স্তানী মানি বয়াংসি
বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদানান্য অর্কমমভিতো বিবিশ্র। (ঐ আ—২।১।১)

৩। অঙ্গোবঙ্গকলিঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মা তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাং সমাখ্যাতা স্বনামকথিতা ভুবি॥ আঃ পঃ ১০৪ অঃ

৪। "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি" —প্রথম খণ্ড (বাংলার প্রাচীন জনপদ)
—বিনয় ঘোষ। (পৃঃ ৭৯।৮১)

৫। গৌড়ের ইতিহাস —রজনীকান্ত চক্রবর্তী।

৬। পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত – ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার।
......'সুতরাং দক্ষিণ মালদা, উত্তর বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে মূল গৌড়দেশের অবস্থান অনুমান করা যায়।......'

৭। The History and Culture of Indian People (The vedic Age) —Bharatiya Vidya Bhavan.
The History of North-Eastern India.—Dr. R. G. Bysack.

৮। বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস (তাম্রলিপ্তে জৈনধর্ম) —যুধিষ্ঠির জানা।
পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর জৈনগণ মহাবীরের চরণতলে পতিত বুদ্ধদেবের ছবি এঁকেছে শুনে সম্রাট অশোক নাকি পাটলিপুত্রের সমস্ত জৈনকে হত্যা করেছিলেন।...

৯। বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাস (২য় খণ্ড) —ধনঞ্জয় দাশ মজুমদার।

১০। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ।
তীর্থ যাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥

১১। বঙ্গভূমিকা —ডঃ সুকুমার সেন।

১২। প্রাচীন বাংলার গৌরব —হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

১৩। গৌড়ের ইতিহাস —রজনীকান্ত চক্রবর্তী।

১৪। বাংলার ইতিহাস (আর্য যুগ) —ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৫। Classical Accounts of India (Diodorus P. 234)
—Dr. R. C. Majumdar.

১৬। বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাস (২য় খণ্ড) —ধনঞ্জয় দাশ মজুমদার।

১৭। History of Orissa —R. D. Banerjee.

১৮। বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস —যুধিষ্ঠির জানা।

১৯। Indo-Aryan Races —Rama Prasad Chanda.

২০। Orissa —W. W. Hunter.
'Our earliest glimpses at Orissa disclose an unexplored

maritime kingdom from the mouth of the Ganges to the mouth of the Krishna.'

২১। Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian (P. P. 136-138) J. W. Mccrindle.
The Classical Accounts of India (P. 341)—Dr. R. C. Majumdar.

২২। History of Orissa —R. D. Banerjee.

২৩। Classical Accounts of India (P. 342) —Dr. R. C. Majumdar.
Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian (P. P. 135-139) —J. W. Mccrindle
Indological Studies Part IV P. P. 52-53—Dr. B. C. Law.

২৪। Ancient India as Described by Megathenes and Arrian (P. 136) J. W. Mccrindle.

২৫। বঙ্গভূমিকা —ডঃ সুকুমার সেন।

২৬। বঙ্গভূমিকা —ডঃ সুকুমার সেন।

২৭। Prehistoric India —R. D. Banerjee.

২৮। বাংলার ইতিহাস (আর্যযুগ) —ডঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত।

২৯। Studies in Indian Antiquities—Dr. H. C. Roychowdhury.

৩০। Historical Geography of Ancient and Mediaeval Bengal P. P. 39, 40—Dr. Amitabha Bhattacharya

৩১। Do Do P. 40 Do

৩২। বাণিজ্যে বাঙ্গালী—একাল ও সেকাল —সুভাষ সমাজদার।

৩৩। Annals of Rural Bengal —W. W. Hunter.

দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ

'নিজের দেশকে যেদিন থেকে চিনতে শিখেছি সে দিন থেকে মনে হয়েছে ভারত-তীর্থের সেরা তীর্থ দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ। বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, উত্তর রাঢ়, ঝাড়খণ্ড নিয়ে যে বিস্তৃত সাংস্কৃতিক অঞ্চল তার মধ্যে যে কেবল জৈন, বৌদ্ধ অথবা পরবর্তী হিন্দু সংস্কৃতির আদান প্রদান হয়েছে তা নয়, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে নানাবিধ ঐতিহাসিক ঘাত প্রতিঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে নানাবিধ জনগোষ্ঠী ও বুদ্ধিজীবিদের আনাগোনা হয়েছে। ছোটনাগপুরের ওঁরাওরা দ্রাবিড় ভাষাভাষী কিন্তু শারীরিক গঠনে আদি-অস্ত্রাল সমপর্যায়ভুক্ত, অনেকটা সাঁওতালদের মতো। হিন্দুদের কিছু কিছু দেবদেবী এরা পুজো করে, আর এদের কিছু দেবদেবীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে। চণ্ডীর উল্লেখ বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারতে নেই। কিন্তু পরে এই অসভ্য অনার্যদেবতা হিন্দু সমাজের সকল স্তরের লোকের আরাধ্য দেবী বলে গণ্য হয়েছেন। ওঁরাওদের মধ্যে চাণ্ডী নামে এক দেবীর অস্তিত্ব আছে।…'

এই সব কথা বলেছেন বিনয় ঘোষ তাঁর "বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব" গ্রন্থে। ভারতের ভাগ্যবিধাতা জনগণমনের অধিনায়কত্বের প্রতি কবি-প্রশস্তির মধ্যে একসূত্রে গ্রথিত দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ বোধ হয় নিতান্তই তাৎপর্যহীন নয়। এই নামগুলি যুগপৎ জাতিবাচক এবং দেশবাচক বলেই মনে করা হয়।

গঙ্গারিডিদের অস্তিত্বের অনুসন্ধানে আমাদের শুধু তারা কোন কোন স্থানে বাস করতো, তা নির্ণয় করলেই চলবে না। নিঃসন্দেহে বাঙ্গালীর পূর্বপুরুষ এই গঙ্গারিডিদের জাতীয় পরিচয় কি, অর্থাৎ কোন বৃহৎ মানবগোষ্ঠী অথবা গোষ্ঠীসমূহের তারা অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাও আমাদের জানতে হবে।

উপযুক্ত তিনটি নামের মধ্যে কলিঙ্গ নামটি নেই, কিন্তু তার পরিবর্তে উৎকল আছে। সমসাময়িক ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ে কলিঙ্গ জাতি প্রাচ্যদেশে অর্থাৎ পূর্বভারতে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এবং দক্ষিণাপথেও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল।

মেগাস্থিনিসের বিবরণেও (অর্থাৎ মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থের উপর নির্ভরশীল লেখকদের বিবরণে) কালিঙ্গেয়দের খোঁজ পাওয়া গেছে এবং ত্রি-কলিঙ্গের অস্তিত্বের কথাও কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন।[১] আর কলিঙ্গ অথবা কালিঙ্গজাতি যে ঋগ্বেদে উল্লিখিত এক অতি প্রাচীন আর্যগোষ্ঠী, এ সম্বন্ধেও কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন।[২]

কলিঙ্গ শব্দটির জাতিগত এবং দেশগত বিশ্লেষণ এই সত্যটি প্রতিপন্ন করে যে এইটি অত্যন্ত গূঢ়ার্থবোধক শব্দ। প্রথমেই ধরা যাক দ্রাবিড় শব্দটির তাৎপর্য।

"The Ancient History of Near East" গ্রন্থে অধ্যাপক হল (P R Hall) অনুমান করেছেন যে ভারতবর্ষই দ্রাবিড়জাতির প্রাচীন বাসস্থান এবং দ্রাবিড় জাতির সহিত প্রাচীন ব্যাবিলনবাসী সুমেরীয় জাতির যে নিকট সম্পর্ক ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এই দ্রাবিড়জাতির অস্তিত্ব এবং প্রসারের পরিচিতির প্রসঙ্গে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাংলার ইতিহাস" (১মভাগ) গ্রন্থের মন্তব্যগুলি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। তিনি [illegible]—"আর্য্যোপনিবেশের পূর্বে যে প্রাচীন জাতি ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, তাহারাই বোধহয় ঋগ্বেদের দস্যু এবং তাহারাই ঐতরেয় আরণ্যকে বিজেতৃগণ কর্তৃক 'পক্ষী' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই প্রাচীন দ্রাবিড়জাতিই বঙ্গ মগধের আদিম অধিবাসী। নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বঙ্গবাসীগণের নাসিকা ও মস্তক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে তাঁহারা দ্রাবিড় ও মোঙ্গলীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন"।

ভূমধ্যসাগর অঞ্চল থেকে এই প্রাচীন দ্রাবিড়জাতি হয়তো উত্তর পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথ দিয়ে না এসে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে এসেছিল। বাঙ্গালী ও গুজরাটীদের মত দেহ গঠন ও গোল করোটিবিশিষ্ট জাতি আমরা গুজরাট, কানাড়া, কুর্গ, মহীশূর, উড়িষ্যা ও বাংলার সমুদ্রের নিকটবর্তী প্রদেশের মধ্যে লক্ষ্য করি (বঙ্গ পরিচয়- প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)। সুতরাং এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে এই প্রাচীন দ্রাবিড় জাতিই কলিঙ্গের আদিম অধিবাসী।

উৎকল এক দেশের নাম, যে নাম মহাভারতের যুগে প্রচলিত না থাকলেও, উড্র অথবা ওড্র নামটি অপ্রাচীন নয়। কাঁপশা (বর্তমান কংসাবতী অথবা সুবর্ণরেখা নদী) থেকে গোদাবরী অবধি বিস্তৃত ভূভাগকে প্রাগৈতিহাসিক যুগে কলিঙ্গ বলে বর্ণনা করা হতো। কিন্তু তখন বোধহয় এই শব্দটি জাতিবাচক ছিল না। কলিঙ্গের মধ্যে যেমন পরবর্তী যুগের উৎকল জাতিও ছিল, তেমনই ছিল অংশত দাক্ষিণী অন্ধ্ররাও, যদিও অন্ধ্রদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বও বহু প্রাচীন।

সুতরাং যে হেতু দক্ষিণপশ্চিম বঙ্গের (রাঢ় দেশের) একটি বৃহৎ অংশ এমনকি তাম্রলিপ্তিও (তমলুক) অনেক সময়ে উড়িষ্যা বা উৎকলের[৩] অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেই হিসেবে আমরা কলিঙ্গ এই ব্যাপকতর সংজ্ঞাটির মধ্যে দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ অর্থাৎ দক্ষিণদেশীয়, ওড়িয়া ও বাঙ্গালী সকলেরই গন্ধ পাই।

গঙ্গারিডি তথা বাঙ্গালীর এক বৃহত্তর গোষ্ঠীর প্রকৃত পরিচয়ের প্রতিষ্ঠা করতে গেলে, এই বিচার এবং বিশ্লেষণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করতে গেলে, কোন আপাতঃতুচ্ছ অথবা তাৎপর্যহীন সূত্রকে অস্বীকার করা যাবে না। সেই সঙ্গে দেখতে হবে যে সেই ক্ষীণতম সূত্র অথবা উপাদানটির সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মতভাবে আমরা আমাদের দেশীয় ধর্মগ্রন্থ, প্রাচীন কাহিনী, সাহিত্য (যেগুলি সবই ইতিহাস রচনার উপাদান) প্রভৃতির কতদূর পর্যন্ত সমন্বয় সাধন করতে পারি।

এ কথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে মেগাস্থিনিসের বিবরণের উপর নির্ভরশীল প্লিনীর মারফৎ আমরা কালিঙ্গেয়ী, গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ী এবং মডো (মকো কালিঙ্গেয়ীদের রাজ্য ও একটি রাজধানীর কথা জানতে পেরেছি। এর অর্থ এই যে সেই খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে কালিঙ্গেয়ী নামধারী বহুজাতিবাচক মানবগোষ্ঠী ভারতভূমির পূর্ব-দক্ষিণে গঙ্গার সাগর মোহনা থেকে গোদাবরীর মোহনা পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের উপকূলে এবং গাঙ্গেয় উপত্যকার দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে সগৌরবে বিরাজ করছিল। সুতরাং এই সত্যই আমাদের কাছে বিশেষভাবে প্রতিভাত হয় যে গঙ্গারিডির ইতিহাস কলিঙ্গের তথা উৎকলের ইতিহাসের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। প্লিনীর কালিঙ্গেয়ী বর্ণনার ক্রম অনুসারে তাদের গঙ্গারিডি জাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক উপজাতি বা গোষ্ঠী বলে মনে হয়। এটা সেই বৃহত্তর কলিঙ্গ হয়তো নয়।

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (History of Orissa) এবং আরও কয়েকজন পণ্ডিত প্রাচীন রাঢ়দেশের একটি অংশকে কলিঙ্গের সীমার মধ্যেই স্থাপন করেছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণপশ্চিম বঙ্গে হুগলী জেলার সিংহপুরকে (সিঙ্গুর ?) লংকাবিজয়ী বিজয় সিংহের পিতা সিংহবাহু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উত্তর কলিঙ্গের রাজধানী বলে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেছেন, সিংহবাহুর মাতা ছিলেন কলিঙ্গের রাজকন্যা। পিতৃরাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়ে সার্থদের সঙ্গে রাঢ় দেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবার সময়ে সিংহ কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে, সেই সিংহকে তিনি পতি হিসেবে বরণ করতে বাধ্য হন। তাঁর পুত্র সিংহবাহু বঙ্গদেশের রাজকন্যার পাণি গ্রহণ করেছিলেন এবং রাঢ় দেশে জঙ্গল পরিষ্কার করার অনুমতি পেয়ে উত্তর কলিঙ্গ নামে একটি নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

কলিঙ্গ দেশ সিংহবাহুর মাতার পিতৃভূমি হওয়ায় দ্রাবিড় প্রথায় মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অনুযায়ী সিংহবাহু কলিঙ্গী বলে পরিচিত হয়েছিলেন বলে বোধ হতে পারে। উপর্যুক্ত সিংহ কোন আদিম উপজাতির টোটেম বলে মনে হয়।

কলিঙ্গের জৈনধর্মাবলম্বী অধিপতি দ্বিতীয় খারবেলের হাতিগুম্ফ শিলালিপি অনুযায়ী নন্দ রাজাদের এই দ্রাবিড় রাজ্য বিজয়ের কাহিনী ইতিহাসগতভাবেই সমর্থিত হয়েছে এবং দ্রাবিড় (রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের অভিমত অনুযায়ী) রাজবংশের সম্রাট খারবেল কর্তৃক মগধ বিজয়, পাটলিপুত্রের সুগঙ্গা রাজপ্রাসাদে হস্তীসহ প্রবেশ, এবং নন্দরাজ কর্তৃক কলিঙ্গ থেকে একদা অপহৃত জিনের প্রতিকৃতিটি পাটলিপুত্র থেকে পুনরায় কলিঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কাহিনীগুলিকে সত্যের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সত্যানুসন্ধানীদের এই কথা স্মরণ রাখা অবশ্য কর্তব্য যে গঙ্গারিডিদের এই পাঁচ / ছয় শত বছরের (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী পর্যন্ত) কাহিনী কিন্তু এক এবং অদ্বিতীয় নয়। শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে এর পরিবর্তন হয়েছে দেশের মূল রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে, ধর্ম ও সংস্কৃতির সংঘর্ষে, আর্য ও অনার্যের শেষ পর্যায়ের সংগ্রামের মধ্যে, দেশীয়

শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্যে এবং বিদেশী শত্রুদের আগ্রাসী মানসিকতায়। তাই গ্রীক বর্ণিত (মেগাস্থিনিস প্রভৃতি) গঙ্গারিডির ইতিহাস কখনই কেবলমাত্র গাঙ্গেয় বদ্বীপের অর্থাৎ গঙ্গা এবং পদ্মার মধ্যবর্তী তৎকালীন বিচ্ছিন্ন ভুভাগের ইতিহাস নয়। কাদের তাঁরা গঙ্গারিডি বলে বর্ণনা করেছেন, তা জানবার, বোঝবার এবং পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বিষয়টি এই ইতিহাস-অন্বেষণের প্রচেষ্টার অন্তর্গত।

বৈদেশিক সাক্ষ্যের অন্তিম পর্যায়ের বর্ণনা অনুযায়ী গঙ্গারিডির ইতিহাস আপাতঃ-দৃষ্টিতে শুধু দক্ষিণ বঙ্গীয় বাঙ্গালীর ইতিহাস মনে হলেও, গঙ্গারিডির ইতিহাস সমগ্র বাঙ্গালী জাতিরই ইতিহাস। আগেই বলা হয়েছে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার প্রমুখ ঐতিহাসিকখ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিতেরা গঙ্গারিডিকে বঙ্গের প্রাচীন পরিচিতি ও সীমানার সঙ্গে একত্রিত করেছেন। এই সিদ্ধান্ত কখনই নির্ভুল নয়। কারণ, প্রাচীন অর্থে বঙ্গকে ধরলে, তাম্রলিপ্তসহ গাঙ্গেয় রাঢ়বঙ্গ তার থেকে বাদ পড়ে।

এই সুযোগে আমরা বঙ্গ এই ভৌগোলিক নামটির প্রাচীন এবং আধুনিক তাৎপর্য বিশ্লেষণে তৎপর হতে পারি। ঐতিহাসিক যুগে বঙ্গের ভৌগোলিক সীমার যে পুরাতন নির্দেশ পাওয়া যায়, তার দ্বারা গঙ্গা ও পদ্মার মধ্যবর্তী বদ্বীপের শেষাংশ অর্থাৎ বাংলার দক্ষিণ-মধ্য ভাগকেই বঙ্গ বলে চিহ্নিত করা যায়, যদিও অনেকে বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগকে প্রাচীন (পূর্ব) বঙ্গ বলে অভিহিত করেছেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার (পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত), ডঃ নীহাররঞ্জন রায় (বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদি পর্ব) প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা গঙ্গা-ভাগীরথীকেই বঙ্গের পশ্চিম সীমা বলেছেন। রামায়ণ এবং মহাভারতে সন্নিবিষ্ট বঙ্গের আনুমানিক সীমানার সঙ্গে এই ঐতিহাসিকদের অভিমত অনুযায়ী বঙ্গের সীমারেখার কোন সংঘাত ঘটে না।

গঙ্গার পূর্বদিকে এবং আদিগঙ্গার উভয় কূলে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি দুই গঙ্গা অর্থাৎ গঙ্গা এবং পদ্মার মাঝখানে বঙ্গের অবস্থান বিপুলভাবে সমর্থন করে। গঙ্গা ভাগীরথীর পূর্বতীরে বর্তমান চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, খুলনা, যশোহর, বরিশাল প্রভৃতি জেলাগুলির তৎকালীন সমুদ্র উত্থিত অংশ নিয়ে বঙ্গ গঠিত ছিল। এই 'বঙ্গে'র অনেকখানি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় ভূখণ্ড এবং সুন্দরবন ও সমুদ্র উপকূলের অন্তর্গত। গঙ্গার পশ্চিম তীরের মতো গঙ্গার পূর্বতীরের নদীবহুল অঞ্চল গঙ্গারিডির অধীন ছিল। সুতরাং বঙ্গ ও গঙ্গারিডি যেমন অভিন্ন বা একাত্ম নয়, তেমনই গঙ্গারিডি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

বাঙ্গালীর সমগ্র দেশ বঙ্গ নামে পরিচিত হয়েছে অনেক পরে। তবে আধুনিক কালে অনেক পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক সম্পূর্ণ বঙ্গভূমিকে বোঝাতে গৌড়-বঙ্গ যুগ্ম নাম ব্যবহার করেছেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্কের কর্ণসুবর্ণ (রঙ্গামাটি) ভিত্তিক গৌড় রাজ্য মূলতঃ গঙ্গার পশ্চিমকূলেই ছিল, যদিও তিনি পরে প্রায় সমগ্র বঙ্গ-ভূমির অধীশ্বর হয়েছিলেন। আজকের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে গৌড়রাজ্য প্রায় সবটাই এবং বঙ্গেরও বেশ কিছু অংশ আছে। মহাপদ্ম নন্দকে গঙ্গারিডির অধিপতি[৪] বলার

মধ্যে তাঁকে গৌড় এবং বঙ্গ দু'দেশেরই রাজা বলা হয়েছে, যদিও গৌড় নামটি হয়তো তখনও বিশেষ প্রচার লাভ করে নি।

গঙ্গারিডিরা সম্পূর্ণভাবে আর্যসভ্যতার ও সংস্কৃতির অঙ্গীভূত ছিল অথবা ছিল না, অথবা তারা সেই সময়ের উত্তর-বৈদিক তথা পৌরাণিক অথবা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আওতায় এসেছিল অথবা আসছিল কিনা, তা চূড়ান্তভাবে জানার উপায় প্রায় নেই বললেই চলে। বিদেশী লেখকেরা এ বিষয়ে অল্পই আলোকপাত করেছেন।

কিন্তু মনুসংহিতায় অথবা বৌধায়ন ধর্মসূত্রে (খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী) বঙ্গ সন্তানদের সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক অথবা তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি অনুমোদনবাচক কোন উল্লেখ নেই। বরং বিপরীত কথাই বলা আছে। এমন কি, প্রাচ্যদেশের অন্তর্গত বিদেহ দেশের পূর্বদিকে তীর্থযাত্রা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে যাওয়ার নিষেধের কথা আছে। পূর্ব দেশীয়দের প্রতি বৈদিক সাহিত্যের অবজ্ঞাসূচক সম্ভাষণ যদিও পৌরাণিক গ্রন্থসমূহে বহুলাংশে স্তিমিত হয়েছে, তথাপি বিশেষভাবে পুরাণগুলিতেও কলিঙ্গবাসী ও বঙ্গদেশবাসীদের প্রতি কোন মর্যাদার দৃষ্টি প্রসারিত হয় নি।[৫] এর প্রধান কারণ, কলিঙ্গ ও বাঙ্গালীদের ধর্ম এবং সংস্কৃতির সঙ্গে মধ্যদেশীয় আর্যদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য।

তৎকালীন বৈদিক ধর্মের বহির্ভূত ধর্মগ্রন্থাদি ও সাহিত্য থেকে জানা যায় যে বৈদিক ব্রাহ্মণদের অত্যধিক যাগযজ্ঞপ্রবণতার বিরোধিতায় এবং তাদের প্রতি বিক্ষুব্ধ বহু ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞ এবং মননশীল ব্যক্তি মগধ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে স্বেচ্ছায় নির্বাসন গ্রহণ করে বসবাস করতে শুরু করেন।[৬] পূর্ব ভারতে তথা প্রাচ্যে জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, আজীবক ধর্মের অভ্যুত্থান থেকে এই বিরোধিতার বিরাটত্ব এবং গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

আমরা জানি যে কলিঙ্গে অর্থাৎ দ্রাবিড় ও উৎকল দেশে এবং সমগ্র বঙ্গদেশে আর্য ভাষা ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল অনেক পরে, এমন কি মগধেরও পরে। এই সম্পর্কে আমাদের মনে রাখা কর্তব্য যে জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, আজীবক ধর্ম প্রভৃতিকে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত ধর্মমত বলে অনুমান করা উচিত নয়। উত্তর বৈদিক তথা পৌরাণিক ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফলেই এই ধর্মমতগুলি জন্মলাভ করেছিল, এবং প্রাথমিকভাবে এই প্রাচ্যদেশের ধ্যান, জ্ঞান, সংস্কৃতিতে পুষ্ট হয়েই এই বৌদ্ধ ধর্ম কালক্রমে সমগ্র ভারতে এবং এশিয়া মহাদেশের বিস্তীর্ণ অংশে প্রসার লাভ করেছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত ভারতের মাটি থেকে তাকে বিদায় নিতে হয়েছিল।

জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভাবন ও প্রবর্তন সম্বন্ধে নিম্নে উদ্ধৃত মন্তব্যটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়—'বাংলার বন ও জলাভূমি ও তাহার জলপথের কঠিন জাল বিস্তার বাঙ্গালীর স্বাধীনতার স্পৃহাকে অতি যত্নে পোষণ করিয়াছে। তাই নদ-নদী দিয়াছে বাঙ্গালীর সংস্কৃতিকে এক আশ্চর্য স্বতন্ত্র রূপ যাহা কখনও উত্তর ভারতের সংস্কৃতির পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে নাই। বাংলাদেশ এই কারণেই অতি সহজেই বিদ্রোহমূলক বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে আশ্রয় দিয়াছিল'।[৭]

জৈন ধর্ম বহির্ভারতে বিস্তৃতি লাভ না করলেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও মানুষের মধ্যে বেঁচে আছে। এই বেদবিরুদ্ধ ধর্মমতগুলি ব্রাহ্মণ্যবাদকে চূর্ণিত করে, চাতুর্বর্ণ্যকে ধ্বংস করে, অনুষ্ঠানের আতিশয্যকে দমিত করে, মানুষের মধ্যে এক মানবিক ভাবের উন্মেষে সহায়তা করেছিল, যে ভাব বৈদিক ধর্মের কাঠিন্যের মধ্যে হয়তো তেমনভাবে বিকশিত হয় নি। সুতরাং জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি লোকায়ত ধর্মগুলির প্রণয়নে আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির কোন অবদান নেই বললে অত্যুক্তি হবে না।

মোটামুটিভাবে আলোচনা করতে গেলে এ কথা বলতেই হয় যে প্রাচ্য তথা পূর্ব-ভারতে এবং বিশেষভাবে বঙ্গভূমিতে ঐতিহাসিক যুগের উদ্বোধনে প্রাগার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব এবং অগ্রসরণ প্রবলতর হওয়াতে যেমন একদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুপ্রবেশ বিলম্বিত হয়েছিল, তেমনই অন্যদিকে ব্রাহ্মণ ও বেদবিরোধী ধর্মমতের প্রচলন ও প্রসার শক্তি সঞ্চয় করেছিল।

এইখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে মহাভারতের যুগে উত্তর-বৈদিক তথা নব ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে পূর্বভারতের বিদ্রোহের ধ্বজা জরাসন্ধের নেতৃত্বে উত্তোলিত হয়েছিল।[৮] শেষ পর্যন্ত জাত্যভিমানী ও পুরোহিততন্ত্রে বিশ্বাসী রক্ষণশীলদের সঙ্গে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে কৌরব দুর্যোধনের নেতৃত্বে চাতুর্বর্ণ্যে অবিশ্বাসী, পুরোহিত-তন্ত্রবিরোধী উদারনৈতিকদের এক চূড়ান্ত সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল। বলাই বাহুল্য, প্রাচ্য দেশ তখন আর্যদের সংস্পর্শে এলেও আদৌ আর্যীভূত হয় নি; অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ তখন বৈদিক মতবাদের ঘোর বিরোধী।

এই প্রাক্-আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বঙ্গভূমিতে তখন অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের প্রভাবই বেশী। এই তথ্যের ভিত্তিতে এই কথা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের কালে গঙ্গারিডি অধ্যুষিত ভূখণ্ডে তথা নিম্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের সাগর মোহনা পর্যন্ত ভূখণ্ডে প্রথমে অস্ট্রিক এবং পরে দ্রাবিড় মানবগোষ্ঠীর ধর্ম ও সংস্কৃতি বহুলভাবে বিদ্যমান ছিল। কারণ, আর্য ও অনার্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব এখানে আগাগোড়াই চলছিল।

এই আর্য ও অনার্যের দ্বন্দ্বের ও সংঘর্ষের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধী ও বিদ্রোহী হিসেবে অবৈদিক ধর্মমতগুলি প্রচার ও প্রসারের সুযোগ লাভ করে। এই কথা স্মরণীয় যে অঙ্গদেশ ও মিথিলাসহ মগধ (সম্পূর্ণভাবে আর্যীভূত না হলেও) যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও আর্য ভাষার অধীনে চলে গিয়েছিল, তখন পুণ্ড্রে, রাঢ়ে, বঙ্গে, কলিঙ্গে জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্ম অনেকদিন পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল।

দক্ষিণপশ্চিম বঙ্গে তথা রাঢ়দেশে তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্পর্শ রীতিমতভাবে লেগেছিল বলে মনে হয় না। তার মানে এই নয় যে এখানে পৌরাণিক তথা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবক্তারা একেবারেই আসেন নি, বাস করেন নি, অথবা রাঢ়দেশ অসভ্য ও বর্বর ছিল। তা থাকলে, জৈনধর্ম তার জন্ম মুহূর্ত থেকে রাঢ় দেশেই প্রচারিত হতো না এবং প্রায় বিশজন তীর্থঙ্কর ধর্মপ্রচারে অবতীর্ণ হয়ে এই রাঢ় দেশেই ইহলীলা সংবরণ করতেন

না। অথবা, তাঁদের সমাধি মন্দির অধুনা মানভুমের (প্রাচীন মল্লভুম) সমেত শিখরে (পরেশনাথ পাহাড়) স্থাপিত হতো না।

অঙ্গদেশ (বর্তমান ভাগলপুর ও মুঙ্গের) থেকে আরম্ভ করে গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিমকুল পর্যন্ত (ছোটনাগপুরের পূর্ব-দক্ষিণ অংশ, রাজমহল, মানভুম, সিংভূম-সমেত সম্পূর্ণ কঙ্কগ্রামভুক্তি এবং বর্ধমান ভুক্তি) এই রাঢ় দেশের অন্তর্গত ছিল। এই রাঢ় দেশেই অজয় নদের নিকটবর্তী পাণ্ডুরাজার ঢিবির প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে বিভিন্ন স্তরের সভ্যতার নিদর্শনের মধ্যে অষ্ট্রিক সভ্যতার উপর দ্রাবিড় সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।[৯]

অনেকেই অনুমান করেন যে ঐতিহাসিক যুগের সূচনায় উত্তর পশ্চিম বঙ্গে, যা এক সময়ে গৌড় (সম্পূর্ণ পশ্চিমবঙ্গ) বলে পরিগণিত হতো, সেই সময়ে দ্রাবিড়দের প্রভাব ও প্রতিপত্তিই বেশী ছিল। যদিও অনেক পরবর্তী যুগে (খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী ও তার পরে) গৌড় বলতে সমগ্র বঙ্গভূমিকেই (বৃহত্তর বঙ্গ—বর্তমান বিহারের পূর্বাংশসহ এবং বর্তমান আসামের কিছু অংশসহ) বোঝাতো, কিন্তু প্রথম ঐতিহাসিক যুগে গৌড় বলতে যে ভৌগোলিক সীমাকে নির্দেশ করেছে তার সঙ্গে বঙ্গকে জুড়েই তবে সম্পূর্ণ বঙ্গদেশ হতো। এইজন্য সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে গৌড়-বঙ্গ এই যৌগিক শব্দটি সম্পূর্ণ বঙ্গদেশের সমার্থক।

নির্দেশিকা

১। History of Orissa —R. D. Banerjee.

২। বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাস —ধনঞ্জয় দাশ মজুমদার।

৩। উৎকল—কলিঙ্গের উত্তরস্থিত উৎ-কলিঙ্গ শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ—ওড়িশা বা উড়িষ্যার অপর নাম—"নব জ্ঞান ভারতী" (ভৌগোলিক)
—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৪। The Classical Accounts of India—(Diodorus Siculus)
—Dr. R. C. Majumdar P. 172.

৫। History of Orissa —R. D Banerjee.

৬। বাংলার ইতিহাস (আর্যযুগ) —ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

৭। বাঙলা ও বাঙালী —রাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

৮। বৃহৎবঙ্গ (প্রথম খণ্ড) —ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন।

৯। বাঙলার সামাজিক ইতিহাস —ডঃ অতুল সুর।

রাঢ়-গৌড়-পুণ্ড্র

রাঢ়, গৌড় ও পুণ্ড্র পুরাকাল থেকেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 'দক্ষিণ মালদা, উত্তর বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে মূল গৌড় দেশের অবস্থান অনুমান করা যায়।' (পালপূর্ব যুগের বংশানুচরিত—ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার)। এই কথার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে।

গ্রীক ও লাতিন লেখকগণ যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন তার থেকে এই ধারণা দৃঢ়তর হয় যে গঙ্গারিডি শব্দটির সঙ্গে রাঢ়, গৌড়, পুণ্ড্র প্রভৃতি স্থানবাচক শব্দগুলির নিবিড় সম্পর্ক আছে। 'খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত জৈন-অঙ্গ গ্রন্থে রাঢ়ের নাম পাওয়া যায়। রাঢ় প্রায়ই গৌড়ের অধীনে থাকিত। কেহ কেহ বলেন এই শব্দটি সাঁওতালদিগের ভাষার 'রাঢ়ো' শব্দ হইতে উৎপন্ন। উহার অর্থ নদীভূগর্ভস্থ পাথুরিয়া জমি।'·

বঙ্গদেশের ভৌগোলিক আকৃতির বিশ্লেষণে গঙ্গা-ভাগীরথীর দুদিকের ভূখণ্ডের প্রধান বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়। এই বিশ্লেষণের মধ্যে আমরা দুই ভূখণ্ডের প্রাচীনত্বের তুলনামূলক বিচার করতে পারি। এই সম্পর্কে একটি উক্তি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ :—

'ভাগীরথীর পূর্বদিকে নাবাল বা নিম্নভূমি। পশ্চিমে রাঢ় অঞ্চল। পূবের সমতল-ভূমি অপেক্ষা পশ্চিমের রাঢ় অঞ্চল অনেক বেশী পুরানো। শুশুনিয়া পাহাড়ের (বাঁকুড়া) কাছে চল্লিশ হাজার বছর আগেকার প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর ফসিল বা জীবাশ্ম পাওয়া গেছে।—ভৌগোলিক সীমা রেখায় রাঢ়ের পরিচয় ভাগীরথীর পশ্চিম তীর থেকে ছোটনাগপুরের মালভূমি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা।···বাংলা অভিধানে রাঢ় অর্থে গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থ ভূভাগ' (বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য)।

রাঢ়ের সীমা অথবা সংজ্ঞা সম্বন্ধে কতগুলি মন্তব্য বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য :— পশ্চিমবঙ্গকে তখন গৌড় ও রাঢ় বলিত—"বাংলা ভাষার অভিধান"—(দ্বিতীয় ভাগ)—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

'রাঢ় দেশ বলিতে পূর্বে ভাগীরথী, দক্ষিণে উড়িষ্যা, পশ্চিমে মগধ ও উত্তরে গঙ্গা; ইহার নাম প্রাঠ দেশ। বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের সময়ে সেই শব্দ অপভ্রষ্ট হইয়া রাঢ় নামে পরিণত হয়। এই দেশ বহুদিন মগধের অধীনে ছিল' (বাংলার সামাজিক ইতিহাস—দুর্গাদাস লাহিড়ী)।

'মূলতঃ আদি-অস্ত্রাল কোল ভাষাগোষ্ঠীর বংশধর সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো প্রভৃতি উপজাতিদের থেকেই রোড, রড়া, লড়া শব্দগুলি এসেছে। পাথুরে রূঢ় রুক্ষ লাল মাটির দেশই রাঢ় শব্দের মধ্যে সূচিত হয়েছে। রাঢ়, রাঢ়ী বা লাড়া শব্দগুলি বিকৃত-ভাবে এই ভাবেই এসেছে এবং লালা বা লাল (রং) শব্দও একভাবেই উদ্ভূত হয়েছে।

দেশের যে অঞ্চলে রোড় বা পাথরের ভাগ বেশী—সেই বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, সিংভূম, মানভূম, হাজারীবাগ, রাঁচী, পালামৌ প্রভৃতি নিয়ে বৃহৎ রাঢ় দেশ সৃষ্টি হয়েছিল। এইসব স্থান গঙ্গা এবং দামোদর, অজয়, কংসাবতী প্রভৃতি গঙ্গার বড় বড় উপনদীগুলির দানে পুষ্ট, এবং কর্ষিত ক্ষেত্র শস্য সম্পদে সমৃদ্ধ।

গঙ্গারিডি যে রাঢ়ভিত্তিক পশ্চিমবঙ্গ ও বৃহৎ বঙ্গ, তার আরও একটি কারণ এই দেশে হাতির বাহুল্য, যে কথা বৈদেশিক (গ্রীক ও লাতিন) লেখকদের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি। আলেকজাণ্ডার এদের হস্তীবলের কথা শুনে বিশেষ বিচলিত হয়েছিলেন (Ancient India as Described by Megasthenes & Arrian—J. W. McCrindle)। এই বিষয়ে অন্যত্র বলা হয়েছে। এই সম্পর্কে শুশুনিয়া (বাঁকুড়া) অঞ্চলে পাওয়া প্রাগৈতিহাসিক হাতির শিলীভূত অংশের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সম্বন্ধে ডঃ পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের 'প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া' পুস্তকটি দ্রষ্টব্য।

এতদ্ব্যতীত গঙ্গারিডই অর্থাৎ বৃহৎ বঙ্গের ভাষা মাগহীর পূর্বাঞ্চলীয় রূপ এবং বাংলার সঙ্গে এক। সিংভূম, রাঁচীর কোন অংশ, হাজারিবাগ, ধানবাদ, সাঁওতাল পরগণাতে এখনও অনেক বাংলা ভাষাভাষী বাস করেন। এ'রা এদের ভাষাকে বলেন 'রাঢ়ী ভাষা'। "গঙ্গারিডি ঃ নাম ও স্থান প্রসঙ্গ"—সুহৃদ কুমার ভৌমিক—(কৌশিকী ১৩৯৩ শারদীয়া সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

শোন, বরাকর, অজয়, দামোদর, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদী ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে মানভূম, সিংভূম, মল্লভূম, বীরভূমের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গায় অনেক লাল জল এনে ফেলেছে। নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকাকে লোহিত বঙ্গ এই কারণেই বলা হয়েছে। রাঢ় দেশসহ পশ্চিমবঙ্গই 'লোহিত বঙ্গ', (বঙ্গভূমিকা —ডঃ সুকুমার সেন)।

কারও কারও অভিমতে গঙ্গা এই নদী নামটি রাঢ় অথবা রাঢ়া দেশের আগে ব্যবহৃত হয়ে গঙ্গারিডই শব্দ সৃষ্টি করেছে। অবশ্য গ্রীকেরা কোন দেশের নামের সঙ্গে সেই দেশের প্রধান নদীর নামকে যুক্ত করে দিত এমন উদাহরণের অভাব নেই। নীল নদের প্রাচীন নাম ছিল ঈজিপতস্। পরে সমগ্র মিশর দেশ এই নামেই পরিচিত হয়েছে। হিন্দু অথবা ইণ্ডিয়া নাম সিন্ধু নদ থেকেই এসেছে।[২]

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমায় (ভাগীরথীর পশ্চিমকুলে) আজও গঙ্গারিডি নামে এক গ্রামের অস্তিত্ব আছে। এই প্রসঙ্গে একজন খ্যাতনামা ইতিহাসবেত্তার নিম্নলিখিত মন্তব্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ 'মেগাস্থিনিসের গ্রন্থে গঙ্গাহৃদয় (Ganga-ridai) নাম পাওয়া যায় এবং উহাতে গণকরের উল্লেখ আছে। গণকর রাঢ়ের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম।' (গৌড়ের ইতিহাস—রজনীকান্ত চক্রবর্তী)।

'পৌরাণিক কিম্বদন্তী অনুসারে আদিম গৌড়দেশ পদ্মা বা গঙ্গা নদীর দক্ষিণে এবং বর্ধমানের উত্তরে অবস্থিত ক্ষুদ্র জনপদ মাত্র ছিল। অপর নামটি বাংলার পশ্চিমাঞ্চল, পশ্চিমউত্তরাঞ্চল, সম্মিলিত গৌড়বঙ্গ, সমগ্র পূর্বভারত এবং আর্য্যাবর্ত বা উত্তরভারত প্রভৃতি অর্থগুলিতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।'[৩]

গৌড় নামে একটি বিশাল নগরীর অস্তিত্ব আমরা বিভিন্ন সূত্রে জানতে পারি। গৌড় নামে একটি অঞ্চলও যে ছিল সে বিষয়েও ঐতিহাসিকেরা প্রায় একমত। গৌড় দেশটি ছিল পশ্চিমবঙ্গে এবং কর্ণসুবর্ণ ও রাঢ়াপুরী এর অন্তর্গত ছিল—এ কথা বলেছেন ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁর "Political History of Ancient India" গ্রন্থে।

গৌড় দেশ যে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তা বিভিন্ন সূত্রেই জানা যায়। দক্ষিণ পুণ্ড্রের অধিবাসীরা ছিল দুর্ধর্ষ স্বভাবের যোদ্ধা এবং তারাই গৌড়, রাঢ় প্রভৃতি জয় করে পূর্ব সমুদ্র পর্যন্ত তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। মৌখারী বংশীয় রাজা ঈশানবর্মার হরাহা শিলালিপি (৫৫৪ খৃষ্টাব্দ) অনুযায়ী গৌড় দেশীয়েরা সমুদ্রের উপকূলে বাস করতেন এবং তিনি গৌড় দেশীয়দের পরাজিত করেছিলেন। তাঁর শিলালিপিতে গৌড়বাসীদের 'সমুদ্রাশ্রয়ান্' বলা হয়েছে।

একজন বিদেশী লেখকের গৌড়ের বর্ণনা উল্লেখযোগ্য। 'Gour comprehended the well-known city of that name and all the country south of Anga to the sea······Gour appears on the historical board just after Magadha disappears from it. Of its earliest history we have no account, but the city of Gour is supposed to have been the most ancient in Bengal and one of the most magnificent in India'.[8]

গৌড়ের ইতিহাস রাঢ় ও পুণ্ড্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। উপর্যুক্ত মন্তব্য অনুসারে গৌড়ের অবস্থান প্রায় পুণ্ড্রদেশের সঙ্গেই ছিল। মহাপদ্ম নন্দের যুগ থেকে রাঢ় দেশ পুণ্ড্রদের অধীনে, তারপরে কলিঙ্গের অধীনে, তারপরে মগধের অধীনে এবং রাজা শশাঙ্কের সময়ে গৌড়ের অধীনে। অনুমান করা যায় যে নন্দবংশীয়েরা মগধে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, তথা রাঢ়, গৌড়, পুণ্ড্রের (পশ্চিম অংশ) উপর এবং কলিঙ্গে ক্ষমতা বিস্তার করেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় হয়তো একই অবস্থা ছিল, কিন্তু সম্রাট অশোককে পুনরায় কলিঙ্গ বিজয়ে অগ্রণী হতে হয়েছিল। পুণ্ড্রদেশের তৎকালীন সমুদ্রোত্থিত সকল ভূখণ্ডের উপরই মহাপদ্ম নন্দের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল, মনে করা যেতে পারে।

আমরা বার বার বলেছি যে পশ্চিমবঙ্গই গ্রীক ও লাতিন গ্রন্থকারগণ বর্ণিত গঙ্গারিডি, যদিও সমার্থক নয়। এই পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে ১৯৪৭ সালের রাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুযায়ী তৎকালীন অখণ্ড বঙ্গের পশ্চিম অংশ, যার পরিপূর্ণ ভৌগোলিক আকৃতি (পশ্চিমবঙ্গের) হয়তো সেই প্রাচীন যুগেই অনেকাংশে সম্পূর্ণ হয়েছিল।

এই কথা মনে রাখতে হবে যে এই সীমার মধ্যে যেমন বঙ্গের কিছু অংশ আছে, তেমনই রাঢ় দেশের সম্পূর্ণ অংশই আছে। আছে সুন্দরবনসহ সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ যার পশ্চিমদিক রাঢ় দেশ নামে প্রাচীন কাল থেকেই পরিচিত। সুতরাং গঙ্গারিডির মধ্যে আছে গাঙ্গেয় উত্তরপশ্চিম, মধ্যপশ্চিম এবং দক্ষিণপশ্চিম বঙ্গ

যা শশাঙ্কের সময়ে (খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী) গৌড় বলে পরিচিত ; আছে পশ্চিম সুন্দরবনের ভূভাগকে গণ্ডির মধ্যে নিয়ে, রাজমহল থেকে শুরু করে একেবারে সমুদ্রের মোহনা পর্যন্ত সমুদয় গঙ্গাহ্রদি বঙ্গভূমি।

এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের সীমানা অতিক্রম করলেও, ঐতিহাসিক যুগের সূচনা পর্যন্ত এবং সুহ্ম বা রাঢ় দেশকে সঙ্গে নিয়ে পুণ্ড্র বলে পরিগণিত। ভাগীরথীর পশ্চিমকূল থেকে একেবারে প্রাচীন মগধের পূর্ব সীমা পর্যন্ত রাঢ় দেশ গঙ্গারিডি নামে পরিচিত ছিল। 'অর্থাৎ ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল থেকে উদ্ভূত নদীগুলির দ্বারা বিধৌত এই জনপদটি উত্তরে রাজমহল থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত'।

গঙ্গারিডির ভৌগোলিক সীমানা বিশ্লেষণে রাঢ় ও পুণ্ড্রকে যুক্তভাবে দেখালেই বোধহয় ঐতিহাসিক সঙ্গতি অক্ষুণ্ণ থাকে। কারণ, বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র থেকে এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয় যে ঋগ্বেদে কথিত অনার্য দাস, দস্যু জাতির, সঙ্গে আর্যদের সংগ্রাম মহাভারতীয় যুগের পরবর্তী কালেও চলেছিল, এবং পূর্ব ভারতে ছোটনাগপুরে, রাঢ়ীয় পশ্চিমবঙ্গে এবং উত্তর বঙ্গের বরেন্দ্র ভূমিতেও দ্রাবিড় রাজ্যগুলির অভ্যুত্থান ঘটেছিল প্রাক আর্য যুগে।

'আর্য অনার্য সংগ্রামের নানা বিবরণ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের একটি প্রার্থনায় বলা হইয়াছে—"আমরা চতুর্দিকে দস্যু কর্তৃক পরিবেষ্টিত। ইহারা যজ্ঞ করে না, ইহাদের রীতিনীতি ভিন্ন তুমি ইহাদের ধ্বংস করো।" ঋগ্বেদে বর্ণিত দাস, দস্যু অথবা অসুরেরা যে সিন্ধু সভ্যতার উত্তরাধিকারী ছিল না ইহার বিপক্ষে কোন প্রমাণ নাই।' (প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয়—গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত)।

বৈদিক সাহিত্যে দস্যুজাতি বলে খ্যাত পুণ্ড্রগণ নিঃসন্দেহে দ্রাবিড় জাতিভুক্ত। আনুমানিক ১৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে পুণ্ড্রবর্ধনকে ভিত্তি করে যে বিরাট নগরসভ্যতা গড়ে উঠেছিল পুণ্ড্রদেশীয় রাজার অধীনে, তারা ছিল পুরাণে উক্ত বলিরাজার বংশ সম্ভূত। তারা চন্দ্রবংশীয় আর্য্য ক্ষত্রিয় অথবা অসুর (দৈত্য) জাতিভুক্ত হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদের পৌত্র বংশীয়, এ কথা নির্ভুলভাবে জানা কঠিন। কিন্তু ইতিহাসের পারম্পর্য্যের বিবেচনায় বলিরাজার অন্যতম পুত্র পুণ্ড্রের বংশধরদের অসুর, দানব ও দৈত্য বংশীয় বলেই অনুমান করা যায়। আরও করা যায় এই জন্য যে মহাভারতের কালে পৌণ্ড্র বাসুদেব ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণের এবং পাণ্ডবদের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন।

মৌর্যশাসনের প্রবর্তনের পরে আর্যশক্তির অনুপ্রবেশ পর্য্যন্ত পুণ্ড্রদেশ তথা পুণ্ড্রবর্ধনে এই দ্রাবিড় শাসনই প্রতিষ্ঠিত ছিল। নৌযুদ্ধবিশারদ এবং হস্তিবাহিনী নিয়ে যুদ্ধনিপুণ এরাই ক্রমশঃ রাঢ়দেশে এবং সমুদ্রের মোহনা পর্যন্ত (তখন সমুদ্র অনেক উপরে ছিল) নিজেদের ক্ষমতার বিস্তার করেছিল। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় তথা বর্তমান পোদ জাতি এদের অস্তিত্বের নিদর্শন।

মহাপদ্ম নন্দের শূদ্র জন্মের সঙ্গীতিতে এ' কথা মনে করা যায় যে হয়তো মাতৃকুলের দিক থেকে তিনি ছিলেন দ্রাবিড়বংশীয়, যাদের মধ্যে তখনও মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। নন্দ বংশ নামে নূতন মাতৃতান্ত্রিক শূদ্র বংশের প্রচলনও হয়েছিল মহাপদ্ম নন্দ থেকেই। এই মহাপদ্ম নিজের বাহুবলে গঙ্গারিডির অধিপতি হয়েছিলেন এবং তাঁর রাজধানী ছিল পুণ্ড্রবর্ধন।[৮] এই প্রসঙ্গে এই কথাও বিশেষভাবে স্মরণীয় যে গ্রীক এবং জৈন সূত্রে মহাপদ্ম নন্দকে নাপিতপুত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই শূদ্র বংশীয় নরপতি মগধের সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। ব্রাহ্মণ পরশুরামের মতো সকল ক্ষত্রিয় নরপতিদের সংহার করে নিজের বিজয়ীর ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে তিনি মগধের তদানীন্তন রাজধানী পাটলিপুত্রে এক সর্বভারতীয় নূতন সাম্রাজ্যের স্থাপনা করেছিলেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এই রকম অনুমানের বশবর্তী হয়েই তাঁর "বাংলাদেশের ইতিহাসে" মন্তব্য করেছেন যে বাঙ্গালীদের পক্ষে মহাপদ্ম নন্দের বীর্যবত্তার সামিল হওয়া কম শ্লাঘার বিষয় নয়।

পাটলিপুত্রের 'সুগাঙ্গেয়' নামধারী প্রাসাদটি বোধ হয় এই বিজয়ী নৃপতির গঙ্গারিডি তথা বাঙ্গালী জন্মের পরিচয় বহন করে। এই কথা বলার কারণ এই যে উত্তরপশ্চিম বঙ্গের অধিবাসী মহাপদ্মের পক্ষে নিজের আবাসভূমির গঠন শৈলী অনুযায়ী পাটলিপুত্রে কাঠের প্রাসাদ নির্মাণ করাই সঙ্গত ছিল। তিনি তাই করেও ছিলেন। মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত এবং অশোকের সময়ে এই সুগাঙ্গেয় প্রাসাদে মাগধী রীতি অনুযায়ী প্রস্তর ব্যবহৃত হয়েছিল।

মহাভারতীয় যুগে যেমন আমরা জরাসন্ধের অধীন এবং মগধের মিত্ররাজ্য হিসেবে পূর্বভারতে কতগুলি ব্রাহ্মণ্যবিরোধী রাজ্যের অস্তিত্বের কথা জানতে পারি, তেমনই পরবর্তী যুগে এবং ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভেও আমরা অন্য কতগুলি রাজ্যের নাম পাই। সেই সময়ে পূর্বভারতে আর্য সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিরোধ করতে পুণ্ড্রবর্ধনের সঙ্গে সহযোগী ছিল আরও একাধিক রাষ্ট্র। তাদের নাম অন্ধ্র, শবর, পুলিন্দ ও মূতিবগণ।

বিভিন্ন শাস্ত্রীয় এবং সাহিত্যিক সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে এরাও সকলে ছিল দ্রাবিড়—কেননা এরা পুণ্ড্রদের সঙ্গে একই জাতি থেকে উদ্ভূত। এই বিষয়ে পণ্ডিতদের অনুমান এই যে অন্ধ্রগণ অধুনা অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তরপূর্ব সীমানায় পার্বত্যরাষ্ট্রে, মূতিবগণ পশ্চিম উড়িষ্যায়, পুলিন্দরা কলিঙ্গে এবং শবরগণ সাঁওতাল পরগণায় দ্রাবিড় রাজতন্ত্রের পত্তন করেছিল।[৯] সাঁওতালদের ভাষায় অস্ট্রিকদের ছাপ থাকলেও, সাঁওতাল নরগোষ্ঠীতে দ্রাবিড় উপাদানই বেশী আছে।

উপর্যুক্ত তথ্যগুলি একটি অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মহাভারতের সময়ে যেমন প্রথমে জরাসন্ধ এবং পরে দুর্যোধন কর্ণের অধীনে ব্রাহ্মণ্যবিরোধী চাতুর্বর্ণ্য-বিরোধী একটি প্রগতিশীল প্রতিরোধশক্তি গঠিত হয়েছিল, (কর্ণপর্ব দ্রষ্টব্য—অঙ্গ প্রভৃতি প্রাচ্যরাজ্যে এবং 'মধ্যদেশ' বহির্ভূত অন্য

স্থানগুলি চাতুর্বর্ণ্যের প্রভাবাধীন ছিল না), পুনরায় প্রায় এক হাজার বছর পরে মহাপদ্ম নন্দের অধীনে আর্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক বিরাট শক্তিশালী অনার্য গোষ্ঠীর পুনরভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল।

আর্যভাষা ও সংস্কৃতি মগধ ও অঙ্গদেশের পথেই পুণ্ড্রদেশে প্রবেশ করেছিল। মনে হয় খৃঃ পূঃ তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতকে বঙ্গে আর্যেরা উপনিবেশিত হয়েছিল। এই পুণ্ড্রদেশ তথা পুণ্ড্রবর্ধন উত্তরবঙ্গে অবস্থিত বলেই স্বীকৃত হয়েছে।[১০]

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউ-য়েন-সাঙ যখন ভারতে ভ্রমণ করেছিলেন, তখন তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন যে গঙ্গার পূর্বদিকে পুণ্ড্রবর্ধন নগরী এবং এর কাছেই অশোকের একটি স্তূপ রয়েছে।[১১] তাম্রলিপ্ততেও তিনি অশোকের স্তূপ এবং বৌদ্ধ বিহার ইত্যাদি দেখেছিলেন। সুতরাং অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের ফলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ তথা গঙ্গারিডি রাজ্য মৌর্যশাসন অথবা প্রভাবের অধীন হয়েছিল, হয়তো স্বল্প-কালের জন্যও—এই অনুমানই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুযায়ী গঙ্গারিডাই-প্রাসাই একটি সংযুক্ত রাষ্ট্র ছিল। হয়তো নন্দদের গঙ্গারিডিদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক ছিল বলেই গঙ্গারিডি-প্রাসাই যুক্তরাষ্ট্র গ্রীক আক্রমণ ও গ্রীক বিজয় ব্যর্থ করতে সংঘবদ্ধ হয়েছিল এবং সেই সংঘবদ্ধতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়ে শ্লথ হয়ে গেলেও, ছিন্ন হয়ে যায় নি। সেই কারণেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়ে গঙ্গারিডিদের কার্যতঃ স্বাধীন থাকার যুক্তি অগ্রাহ্য করা যায় না। উপরন্তু বৈদেশিক সূত্রে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে প্রাসাইদের রাজা বলা হয়েছে, কিন্তু কোথায়ও গঙ্গারিডিদের রাজা বলে অভিহিত করা হয় নি।[১২]

বাঙ্গলায় অশোকের কোন অনুশাসন আবিষ্কৃত হয় নি। কলিঙ্গও নন্দদের পরে কোনভাবে মৌর্যদের হস্তচ্যুত হয়েছিল এবং সেই কারণেই অশোককে কলিঙ্গের বিরুদ্ধে বিপুলভাবে অস্ত্র ধারণ করতে হয়েছিল। সুতরাং এই সময়ে গঙ্গারিডি ও কালিঙ্গেয়ীদের মধ্যে দুটি কারণে, যথা ১) বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং ২) মগধ থেকে প্রবাহিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্রোতকে দ্রুত প্রতিরোধকল্পে, এক সখ্যতার চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, মনে করা যেতে পারে। কলিঙ্গরাজ দ্বিতীয় খারবেলের বিজয় অভিযানের ফলে তাম্রলিপ্ত সহ রাঢ়ের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ কলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বলে মনে হয়। সেই জন্য প্লিনী গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ীদের কথা বললেও টলেমি অথবা পেরিপ্লাস গ্রন্থকার কেউই গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ীদের সম্বন্ধে উল্লেখ করেন নি।

সুহ্ম তথা রাঢ় দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বেশ কিছুকাল পুণ্ড্রদেশের কর্তৃত্বাধীন থেকে, রাঢ় দেশ কলিঙ্গ দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হয়। ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী রাঢ়ের (সুহ্ম) সঙ্গে কলিঙ্গের সম্পর্ক খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে অথবা তারও আগে থেকে। সিংহপুরের সিংহবাহু এবং তাঁর পুত্র বিজয় সিংহের কাহিনী এই সম্পর্কের অঙ্গীভূত, যে কথা আগেই বলা হয়েছে। সুতরাং মনে হয় মাঝখানে কিছুদিন রাঢ় ও কলিঙ্গের এই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে, অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের আগে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই প্রসঙ্গে এক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—'যেহেতু গঙ্গারিডই রাজ্যের সহিত কলিঙ্গীরাজ্য যুক্ত ছিল, গঙ্গানদী গঙ্গারিডি রাজ্যের পূর্ব-সীমা ছিল, ইহা হইতে অনুমান হয় যে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রারম্ভে রাঢ় ও কলিঙ্গ মগধ রাজের অধীনে ছিল না। মগধ রাজগণ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলে রাঢ় ও বঙ্গ তাহাদের সাম্রাজ্য ভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসারের রাজ্যকালে দাক্ষিণাত্য এবং বিন্দুসারের পুত্র অশোকের শাসন কালে কলিঙ্গদেশ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল'।[১৩]

অশোকের মৃত্যুর পরে পুণ্ড্র নৃপতিরা যে পুনরায় উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ সমন্বিত সমগ্র গঙ্গারিডি রাজ্যে ক্ষমতা বিস্তার করেছিল, তার প্রমাণ দ্রাবিড়দের গাঙ্গেয় ভূমিতে ক্ষমতা বিস্তার এবং অপসারণের মধ্যে নিহিত আছে। গৌড় বলতে তখন রাজমহল থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সমগ্র গাঙ্গেয় অঞ্চলকেই বোঝাতো। গৌড়ের মধ্যে রাঢ় এবং বরেন্দ্র দুই দেশই অন্তর্ভুক্ত ছিল (The Early History of Bengal—Promode Lal Paul)। মৌর্যোত্তর যুগে রাঢ়দেশ পুণ্ড্র তথা গৌড়ের অধীন হয়েছিল। পরে সম্ভাব্যভাবে কলিঙ্গরাজ খারবেলের অধীনে কলিঙ্গ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

সুতরাং গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের আগেও কোন কোন বাঙ্গালী নৃপতি পশ্চিমবঙ্গে অথবা সমগ্র বঙ্গে (গৌড়-বঙ্গে) অধিকার বিস্তার করেছিলেন একথা বলাই বাহুল্য। তবে বঙ্গদেশ পুনরায় সাতবাহন সম্রাটদের অধীনে মগধের বশীভূত হয়েছিল। এ সবই খৃষ্টীয় শতাব্দীর অল্প আগের কথা। এর পরে গৌড়ের নৃপতিদের দেখা যায় কুষাণদের সামন্ত হিসেবে। কুষাণ সম্রাটেরা ভারতের জাতিত্ব ও ধর্ম গ্রহণ করলেও মূলতঃ বিদেশী ছিলেন।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ে যে হেতু প্রাগার্য জনগোষ্ঠী এবং তাদের অধিপতিরাই গঙ্গারিডি বলে দেশ / জাতির কর্তৃত্ব করেছিলেন, সেই কারণেই আর্য শাস্ত্রে, ধর্ম-পুস্তকে ও সাহিত্যে তাদের উল্লেখ নেই। পুরাণে যে কলিঙ্গের এবং বঙ্গভূমির দ্রাবিড় রাজবংশের উল্লেখ নেই, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষে তারা আর্য ব্রাহ্মণদের ঈর্ষার পাত্র ছিল।

বর্তমান পদ্মানদীর দক্ষিণে এবং বর্ধমানের উত্তরে গৌড় দেশ অবস্থিত ছিল। মালদার দক্ষিণাঞ্চলের গৌড় নগর অবশ্যই এর প্রধান নগর ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে গৌড় বলে কোন নগর বিশেষের নাম পাওয়া যায় না।

অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে অথবা ঐতিহাসিক যুগের সূচনায় গৌড়ের অস্তিত্ব ছিল না। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে যে গৌড়পুরের উল্লেখ আছে, তা বঙ্গদেশের গৌড় না হওয়াই সম্ভব। কিন্তু ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে গৌড়ের কথা কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে জানিয়ে গেছেন। পরবর্তী কালে বাৎস্যায়নের কামসূত্রে (খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী) এই গৌড়ের উল্লেখ আছে।

সুহ্ম এবং অঙ্গ দেশের কিছু অংশ নিয়ে রাঢ় দেশের সৃষ্টি হয়েছিল। এবং রাঢ় ও পুণ্ড্র নিয়ে গৌড়দেশ এবং সেই প্রাচীনকালে গঙ্গার পশ্চিম তীরে গৌড়নগরী।

দেশবাচক গৌড় পশ্চিমবঙ্গ, স্থানবাচক গৌড়—লক্ষণাবতী বা পাণ্ডুয়া (গৌড়)। প্রাচীনতম কালে যখন থেকে গৌড়ের অস্তিত্ব জানা গেছে, তার পর থেকেই এই বিশেষ নামের তাৎপর্যের একটি ধারা বিবর্তিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিক যুগে একটি নগর, একটি রাজ্য এবং একটি সাম্রাজ্য পর্যন্ত নির্দেশ করেছে। পরবর্তীকালে শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে (খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী) এই রাজ্যের সীমানা নির্ধারিত হয়েছে নিম্নলিখিতভাবে ঃ—

বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।

গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ববিদ্যাবিশারদঃ॥ শক্তিসঙ্গমতন্ত্রম, ৭ম পটল, ১৭,৬২ অবশ্য বঙ্গদেশ থেকে আরম্ভ করে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত এই আয়তন পরবর্তীকালে সঙ্কুচিত হলেও, ঐতিহাসিক যুগের উম্মেষে হয়তো গৌড় নামের তাৎপর্য এই রকমই ছিল।

পুণ্ড্রদের দক্ষিণ দিকে প্রতিপত্তি বিস্তারের সময়েই যে গৌড় নগরী সৃষ্ট হয় নি, এ'কথা জোরের সঙ্গে বলা যায় না। হয়তো কোন বিশেষ কারণে পুণ্ড্রনগর (পুণ্ড্রবর্ধন) ও গৌড় থেকেই রাজধানী পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এই রকম হওয়া অসম্ভব নয় যে মহাপদ্ম নন্দ পুণ্ড্রদেশ থেকে মগধের সিংহাসন লাভ করে মগধের স্থানীয় শত্রুদের প্রতিকূলতা এড়িয়ে যাবার জন্য রাজধানী পুনরায় পুণ্ড্র নগরেই স্থাপন করেছিলেন এবং ক্ষত্রিয় বিজয়ের পরে সার্বভৌম সম্রাট হয়ে রাজধানী পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত করেছিলেন।

পুণ্ড্রদের উত্তর বঙ্গের বাইরে দক্ষিণে এবং পূর্বে শক্তি বিস্তারের প্রচেষ্টা স্বাভাবিকই ছিল, কারণ পশ্চিমে ছিল বিক্রমশালী মগধ-রাজশক্তি, যারা আগেই অঙ্গ দেশকে কুক্ষিগত করেছিল, গৌতম-বুদ্ধের সমসাময়িক কালে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় শক্তি পরিচালনার যোগ্য কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে এবং রক্ষণাত্মক ও আক্রমনাত্মক কৌশলের দিক থেকে উত্তরবঙ্গে গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত গৌড় নগরী রাজধানীর মর্যাদা লাভের উপযুক্তই ছিল।

যে হেতু কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে এই নগর-রাজধানীর উল্লেখ করেছেন,[১৪] গৌড় সেই সময়ে হয় পুণ্ড্র দেশের, নয় রাঢ় দেশের রাজধানী ছিল বলে ধরে নিতে হবে। যে হেতু সেই সময়ে রাঢ় দেশে কালিঙ্গেয়দের থেকে পৃথকভাবে কোন শক্তিশালী আর্য অথবা অনার্য রাজ্যের অস্তিত্বের কথা জানা যায় না এবং গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়দের রাজধানী পোতালিস বা পার্থেলিসে ছিল, অনুমান করা যেতে পারে যে গৌড় তবে পুণ্ড্ররাজাদের রাজধানী যাঁরা মেগাস্থিনিসের বর্ণিত গঙ্গারিডিদের নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন এবং জাতিগতভাবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে কালিঙ্গেয়দের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

এই অনুমিতি থেকে অন্য একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবার যৌক্তিকতাকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা কর্তব্য। 'অধুনা মধ্য রাঢ়ে পাণ্ডুরাজার যে ঢিবি পাওয়া গেছে, তা পুণ্ড্ররাজার কোন স্থানীয় নগর হওয়াও বিচিত্র নয়। অষ্ট্রিক সংস্কৃতির পরিমণ্ডলের ঊর্ধ্বাংশে দ্রাবিড় সংস্কৃতির চিহ্ন এবং নাম সাদৃশ্য (পুণ্ড্ররাজা পাণ্ডুরাজা)

থেকে এ অনুমান খুব কষ্ট-কল্পিত না হতে পারে। কারণ, শবর বংশীয় দ্রাবিড়দের কোন রাজা কোন বিশেষ সময়ে প্রখ্যাতি লাভ করে চিহ্নিত হয়ে ওঠে নি। অন্যদিকে পুণ্ড্রদের উত্তরবঙ্গের দক্ষিণে ও পূর্বে শক্তি বিস্তারের উল্লেখ রয়েছে'।[১৫]

'পুণ্ড্রদের দ্বারা দঃ রাঢ়ের সিংহবংশ বশীভূত হয়েছিল বলে জানা যায়,...সেই প্রাচীন যুগেও পৌণ্ড্রগণ রণনৈপুণ্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। উত্তর ও পূর্ব দিক থেকে বিভিন্ন পার্বত্যজাতি প্রায়ই তাদের রাজ্য আক্রমণ করতো। এমনই এক আক্রমণের সময়ে বহুসংখ্যক পৌণ্ড্র যোদ্ধা পিছু হটতে হটতে একেবারে সমুদ্রতীরে এসে উপনীত হয়। এরাই দক্ষিণ রাঢ়ের দুর্ধর্ষ সম্প্রদায়, পোদ বা পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়।' ...[১৬]

পাণ্ডুরাজার ঢিবির সঙ্গে পুণ্ড্ররাজাদের সংশ্লেষ সম্বন্ধে অনুমান বিতর্কের অতীত নয়। এই বিষয়টির বিজ্ঞানসম্মত এবং ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার জন্য আরও অনেক বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলির বিবরণ-সমূহ এবং তাদের স্থান কাল পাত্র সমর্থিত বিশ্লেষণ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তর্গত অনেক সত্যই প্রকাশ করে।

খননকার্য ব্যাপকভাবে সম্পাদিত এবং প্রাচীন নিদর্শনগুলি বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরীক্ষিত হয়েছে এ কথাও ঠিক। কিন্তু এখনও আবিষ্কৃত বস্তুগুলিকে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পটভূমিকায় রাষ্ট্রনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বিশেষ বিশেষ সময়ে এবং বিশেষ স্থানে এবং বিশেষ পাত্র ও পাত্রীর সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয় নি। পাণ্ডুরাজার ঢিবি বলতে সঠিক কোন সময়ে কোন স্থানের কোন রাজার সম্পর্কীয় ঢিবি বোঝায়, তা এখনও স্থিরীকৃত হয় নি। যতদূর জানা যায়, এখানকার খনন কার্যের কোনও সম্পূর্ণ সরকারী রিপোর্টও প্রকাশিত হয় নি।

দক্ষিণ রাঢ় দেশে (সুহ্ম) মহানাদে পাণ্ডুশাক্য নামে এক রাজার নাম জানা যায়। তিনি শকজাতীয় এবং গৌতম বুদ্ধের খুল্লতাতের বংশজাত।[১৭] কিন্তু এই নামের সাদৃশ্য সত্ত্বেও পাণ্ডুরাজার ঢিবির যথার্থ পাণ্ডুরাজাকে কিন্তু এখনও চিহ্নিত করা যায় নি। তথাপি এই ঢিবি যে এক সময়ে কোন পুণ্ড্র দেশীয় রাজার রাজধানীর নিদর্শন, এ'কথা একেবারেই হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মেগাস্থিনিসের বিবরণের উপর নির্ভরশীল ডিয়োডোরাস, প্লুটার্ক প্রভৃতি গণ্ডরিদই শব্দ ব্যবহার করেছেন। যদিও গণ্ডারিদি, গঙ্গারিডি, গঙ্গারিডাই প্রভৃতি শব্দ একই তাৎপর্য বহন করে, কিন্তু এই গণ্ডারিডি শব্দের অস্তিত্ব অনেকের মনে প্রশ্ন জাগায় যে কেন এই নামে সুদূর অতীতের এই ক্ষমতাশালী জনগোষ্ঠীকে এবং তাদের দেশকে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই সম্পর্কে এক ঐতিহাসিকের মন্তব্য বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য ঃ—

'...তবে প্রাচীনতম উল্লেখ গণ্ডারিদই থাকলে বর্জন করে নতুন বানান গ্রহণের যুক্তি নেই। অতএব গণ্ডারিদই জাতি বলে গৌড়ীয় জাতি হিসেবে নেওয়া যেতে পারে, তবে সে জাতি গঙ্গা ও রাঢ়ের জনগণ নিয়ে গঠিত হওয়াই স্বাভাবিক। প্রাকমৌর্য যুগেই গৌড়ের অস্তিত্বের কথা বহু প্রাচীন গ্রন্থে ঘোষিত।...'[১৮]

অবশ্য 'গৌড়' শব্দই যে গণ্ডরিদই অথবা গঙ্গারিডির উৎস, সে কথা অভ্রান্তভাবে স্বীকার করা যায় না। কিন্তু গৌড়দেশ অথবা গৌড়বাসী যে গঙ্গারিডির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সে বিষয়ে অল্পই সন্দেহ আছে।

গণ্ডরিদই শব্দটির আলোচনা প্রসঙ্গে সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে অল্প একটু বলার আছে। পূর্ববঙ্গের ঢাকা অঞ্চলে উৎপন্ন একজাতীয় আখকে গাণ্ডারী বলা হতো। এই আখ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সুতরাং গণ্ডরিদই শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধানে যদি আমরা গৌড় (এই নামের মধ্যেও গুড় এবং আখের ভূমিকা আছে) অবধি পৌঁছাই, তবে প্রত্যক্ষ যোগসূত্রের উপস্থিতিতে আমরা কি প্রাচীন পূর্ববঙ্গকে গঙ্গারিডির পরিধি থেকে বাদ দিতে পারি? অবশ্য, সেই বিস্মৃত যুগে পূর্ববঙ্গের কতখানি পর্যন্ত জলের উপর মাথা তুলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল, সেটাও বিচার করতে হবে।

পূর্ববঙ্গের ঢাকা (বিক্রমপুর), মৈমনসিংহের উত্তরাংশ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রামের কিছু অংশ বঙ্গভূমির প্রাচীনতম অংশের অন্তর্গত। কিন্তু এই সব অংশই গঙ্গার দ্বিতীয় ধারাটির (পদ্মা) উত্তরে এবং ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী অঞ্চল। গঙ্গারিডি নামটির সঙ্গে প্রাথমিকভাবে রাঢ়, গৌড়, পুণ্ড্র অর্থাৎ গঙ্গা ভাগীরথীর প্রাচীনতম প্রবাহের পশ্চিমাংশ যুক্ত ছিল। গ্রীকেদের সঙ্গে পরিচিতি এবং নাম সাযুজ্য, এই দুই কারণেই এই অঞ্চলই মূলতঃ গঙ্গারিডি। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে গঙ্গার দ্বিতীয় ধারাটি (পদ্মা) সেই প্রাচীন যুগে আদৌ প্রবল এবং আকর্ষণযোগ্য ছিল না।

বঙ্গদেশের মধ্য-দক্ষিণ ভূখণ্ড অর্থাৎ গঙ্গার পূর্ব উপকূলের ভূভাগ সেই যুগে অনেকটাই জলমগ্ন ছিল অথবা কয়েকটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের সমষ্টিগত আকৃতি ছিল, যার নিকটেই অর্থাৎ পূর্বদক্ষিণেই ছিল সমুদ্র। সুতরাং গাঙ্গেয় বঙ্গদেশের প্রাচীন ভূভাগ (রাঢ়, গৌড়, পুণ্ড্র) এবং গঙ্গার পূর্বে এবং সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থলভাগ (যাকে বঙ্গ বলা হয়েছে) নিয়েই তৎকালীন গঙ্গারিডি গঠিত হয়েছিল এবং বিভিন্ন কৌমের সমন্বয়ে।

অধুনা বাংলাদেশের এক গবেষক মহম্মদ ইমানুল হক দেশ পত্রিকায় (৩রা মার্চ, ১৯৮৪) "সমুদ্র কেন টানে না" নামক নিবন্ধে মন্তব্য করেছেন, "নদীয়া, যশোর, কুষ্ঠিয়া, আর ফরিদপুরের কিয়দংশ নিয়েই বাংলার আদি বদ্বীপ। তাই বাংলার আদি সভ্যতা গৌড়, পৌণ্ড্র, রাঢ় আর এই বদ্বীপ অঞ্চলেই গড়ে উঠেছিল।"

বঙ্গভূমির এই সমুদয় অংশকেই পাশ্চাত্য লেখকেরা গঙ্গারিডি বলে বর্ণনা করেছিলেন—এই কথা মনে করা আদৌ অসঙ্গত হবে না।

'আধুনিক বঙ্গদেশের পূর্ব ভাগই বঙ্গ এবং পশ্চিম ভাগই পুণ্ড্র দেশ নামে অভিহিত হইত। জানা যাইতেছে ইহাদের দক্ষিণেই সমুদ্রোপকূলে সুহ্ম ও তাম্রলিপ্ত অবস্থিত ছিল' (মেদিনীপুরের ইতিহাস—যোগেশচন্দ্র বসু)।

ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে গৌড়ের প্রকৃত অবস্থান পশ্চিমবঙ্গেই ছিল, (Tribes in Ancient India—Dr. B. C. Law)। মৌখারীরাজ ঈশানবর্মার হরাহা শিলালিপিতে (খৃষ্টীয় ৫৫৪) গৌড়বাসীদের 'সমুদ্রাশ্রয়ান' বলে বর্ণনা করা

হয়েছে। সুতরাং গৌড় এবং দক্ষিণ পুণ্ড্রের লোকেরা হয়তো প্রায় অভিন্ন ছিল, কারণ এই দুই দেশের দক্ষিণ সীমাই সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। পুনরায়, গৌড় এবং দক্ষিণপুণ্ড্র রাঢ় দেশের সমার্থক বলেই অনুমিত হয়। গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিম দিককই এই সব আঞ্চলিক নাম বহন করতো।

বস্তুতঃ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত গৌড়ের গৌরব পুণ্ড্রের মধ্যেই নিহিত ছিল। এই কথা আগেই বলা হয়েছে। রাজা শশাঙ্কের অভ্যুত্থানের সময় থেকেই গৌড়ের প্রসিদ্ধি বেড়ে যায় এবং প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ (তাম্রলিপ্ত, সুহ্ম, কর্ণসুবর্ণ, দঃ পুণ্ড্র) গৌড় নামে অভিহিত হয়। গৌড় নামের মাহাত্ম্য এতই প্রবল হয়েছিল যে পরে গৌড়াধিপতি পাল রাজাদের সময়ে গৌড় এক সর্বভারতীয় রাষ্ট্রের নাম পরিগ্রহণ করেছিল এবং সেই বিশাল রাষ্ট্রের একাধিক স্থানকে গৌড় বলা হতো।

সুহ্ম অর্থাৎ রাঢ় দেশ এক সময়ে পুণ্ড্রদেশের অধীনে ছিল, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। এই পুণ্ড্র নাম থেকেই পুনরায় উড্রনামের উৎপত্তি হয়েছে। উড্র অর্থাৎ উত্তর পুণ্ড্র। পুণ্ড্রদেশের অংশবিশেষ নিয়েই উড্রের আবির্ভাব হয়। 'সম্ভবতঃ আধুনিক ছোটনাগপুর প্রদেশ, ময়ূরভঞ্জ, কেওঞ্ঝর প্রভৃতি গড়জাত মহাল, মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ ও বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণাংশ লইয়া উড্র দেশ গঠিত ছিল।'[১৮] যেমন পরবর্তী কালে উত্তর কলিঙ্গ থেকে উৎকল নামটির উৎপত্তি হয়েছিল।

দানব অথবা অসুর বলে চিহ্নিত অনার্য গোষ্ঠী পুণ্ড্রদেশে কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল এবং ক্রমশঃ দক্ষিণে ও পূর্বে তাদের অধিকার বিস্তারে প্রবৃত্ত ছিল। এই সব অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক জীবনধারণ প্রণালীতে আমূল পরিবর্তন এনেছিল পরে দ্রাবিড়েরা। রাঢ়, গৌড় এবং পুণ্ড্রে নগরভিত্তিক জীবন ও সভ্যতার প্রবর্তন এই দ্রাবিড়েরাই করতে সক্ষম হয়েছিল।

রাঢ়, গৌড়, পুণ্ড্র এই তিন নামের মধ্যে দ্রাবিড় উচ্চারণ, দ্রাবিড় শব্দমূল ও প্রত্যয় লুকিয়ে আছে, অর্থাৎ এরা দ্রাবিড় শব্দভাণ্ডার জাত। দ্রাবিড় ভাষায় উর (UR) মানে শহর। শব্দমূলে উর যোগ করে স্থানের নাম তৈরী করা দ্রাবিড় ভাষার একটি লক্ষণ, এবং তা প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। ভেল্ল+উর (>ভেল্লূর) আট্ট+উর (>আট্টুর) প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত শহরের নাম এইভাবে করা হয়েছে।

রাঢ়বঙ্গে নানুর প্রভৃতি স্থানের নামেও সদৃশ গঠনরীতি দেখা যায়। রাঢ়, গৌড়, পুণ্ড্র—এই তিনটি নামের মধ্যেও এই শব্দগঠন প্রণালী অনুসৃত হয়েছে।

(১) ল্লা+উর্>লাঢ় (প্রাঃ সং উচ্চারণে)>তৎসম রাঢ়

(২ গা+উর>গাউর>(গৌর, গৌড় (সং বাং)

(৩) পুণ্ড্র+উর=পুণ্ড্রুর>পুণ্ড্রঃ >পুণ্ড্র (সং বাং)

আমরা জানি যে মৌর্য যুগে বঙ্গদেশের উত্তরে এবং পূর্বে আর্যধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটলেও, খৃষ্টীয় তৃতীয় অথবা চতুর্থ শতাব্দীর আগে এখানে আর্যধর্ম সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। সুতরাং এইটিই প্রকৃতপক্ষে সম্ভব যে গঙ্গারিডির বাঙ্গালী রাজা

মহাপদ্ম নন্দ মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে সার্বভৌম সম্রাটরূপে প্রতিষ্ঠিত হলে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংস্পর্শে আসেন। কিন্তু সে ধর্ম তাঁকে ক্ষত্রিয় বলে স্বীকৃতি দেয় নি।

কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মগধের সিংহাসন লাভ করা পর্যন্ত এই বাঙ্গালী পুণ্ড্র-রাজাদের দ্রাবিড়ী প্রভাব পাটলিপুত্রেও অনুভূত হতো। কিম্বদন্তী আছে যে নন্দবংশীয় শেষ রাজা ব্রাহ্মণ চাণক্যের (যিনি পরে কৌটিল্য নামে অভিহিত হয়েছিলেন) শিখা কর্তন করে অপমানিত করায়, চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের সহযোগিতায় নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করেছিলেন, এবং এইভাবে নিজের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করেছিলেন।[১৯]

বলাই বাহুল্য, গৌড়ে এবং রাঢ়ে আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের সময়ে পুণ্ড্রদেশীয় রাজাদের আধিপত্য সম্পূর্ণভাবেই অক্ষুণ্ণ ছিল। সুতরাং মেগাস্থিনিস প্রভৃতি সমসাময়িক গ্রীক পর্যটকেরা যে গঙ্গারিডি জাতির উল্লেখ করেছেন, তা এই পৌণ্ড্রীয় রাজশক্তির প্রভাবাধীন বাঙ্গালীরা ব্যতীত আর কেউই নয়।

মহাভারত এবং পুরাণের তথ্য থেকে পার্জিটার সাহেব (F. E. Pargitar) সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে ইতিহাসে কথিত পুণ্ড্রবর্ধন দেশ (গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী বর্তমান রাজশাহীজেলাভিত্তিক) এবং পুণ্ড্র রাজ্য এক এবং অভিন্ন ছিল না। পুণ্ড্রদের রাজ্য ছিল দক্ষিণ অংশ ব্যতীত আধুনিক ছোটনাগপুর সমন্বিত ভূখণ্ড যার সীমানায় ছিল—উত্তরে কাশী, উত্তরপূর্বে অঙ্গ-বঙ্গ, পূর্বে সুহ্ম এবং দক্ষিণপূর্বে ওড্র। "Pre Aryan and Pre Dravidian in India"—S. Levi (Translated by Dr. P. C. Bagchi)

এই পুণ্ড্র রাজাই ক্ষমতায় স্ফীত হয়ে ক্রমে তদানীন্তন সমগ্র বঙ্গভূমিই প্রায় অধিকার করেছিল।

গ্রীকেরা প্রাসীয়াই এবং গঙ্গারিডাই ব্যতীত মধ্যদেশে এবং পূর্ব ভারতে কোন ক্ষত্রিয় বা নীচজাতীর রাষ্ট্রশক্তির উল্লেখ করেন নি। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় আর্যাবর্তের অর্থাৎ উত্তর ভারতের এই অবস্থা ছিল। বিপাশা নদীর পূর্ব উপকূল থেকে সমুদ্রের মোহনা পর্যন্ত বঙ্গদেশীয় পুণ্ড্ররাজ্যসম্ভূত এক শক্তিশালী নৃপতির অধীনে প্রাসিয়াই এবং গঙ্গারিডাই নামে এই দুই শক্তিশালী রাজ্যের এবং জাতির নামই তাঁরা শুধু করেছিলেন—ইতিহাসগতভাবে এই অনুমানই অপরিহার্য্য বলে মনে করা যেতে পারে।

মগধে সম্পূর্ণভাবে এবং বঙ্গদেশে তখনও আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রসারিত হয় নি। দ্রাবিড় পুণ্ড্রেরাই তখন এখানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। নাপিতপুত্র মহাপদ্ম নন্দ এবং তাঁর বংশধরদের অধীনে নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় এবং সমুদ্র পর্যন্ত যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ এক বিশাল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা সংরক্ষিত ও পুষ্ট হয়ে বিরাজ করছিল, সেই ভূখণ্ডকে এবং তার অধিবাসীদেরই মেগাস্থিনিস ও পরবর্তী বিদেশী লেখকেরা প্রাসাই এবং গঙ্গারিডি বলে উল্লেখ করে গেছেন।

মধ্যদেশ বা আর্যাবর্ত যে ধর্ম, যে সামাজিক রীতিনীতির দ্বারা শাসিত ছিল, বঙ্গদেশ সেই ধর্ম, সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রথার অন্তর্গত ছিল না। এখানকার ভাব-

ধারা মধ্যদেশীয় ভাবধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। 'এখানে বৈদিক অগ্নির স্থান অধিকার করিয়া আছেন মা কালী, শিব ও বিষ্ণু। এই যে মাতৃ এবং শিব ও বিষ্ণু উপাসনার বিপ্লবাত্মক পরিণতি, ইহার বীজ মাহেঞ্জোডারোতেই উপ্ত হইয়াছিল' (বঙ্গে হিন্দু সভ্যতার বিস্তার—স্বামী শংকরানন্দ)। বস্তুতঃ বেদে কালীর কথা তো নেইই, শিবও সেখানে অনুপস্থিত এবং বিষ্ণু এক অপ্রধান দেবতা।

প্রাচ্য ভারতের এই অধিবাসীরাই বৈদিক সাহিত্যে উক্ত দাস, দস্যু, অসুর প্রভৃতি যাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আর্য ব্রাহ্মণেরা পছন্দ করতেন না। বরং তাদের শ্রী ও সমৃদ্ধিতে ঈর্ষাপরায়ণ হতেন। এই সব অবৈদিক, যজ্ঞবিরোধী মানব গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষে, আক্রোশে এবং ক্রোধের বশবর্তী হয়ে ব্রাহ্মণেরা বৈদিক শাস্ত্রে এবং পৌরাণিক গ্রন্থে এই উচ্চমানসম্পন্ন সভ্য ও সংস্কৃতিবান বাঙ্গালীর সম্বন্ধে কোন ভালো কথাই লিপিবন্ধ করেন নি। বরং তাদের অত্যন্ত গর্হিতভাবে আক্রমণ করেছেন এবং নানারূপে অশ্রদ্ধেয় ভাষায় এই বাঙ্গালীদের প্রাচীন ইতিহাসকে মসীলিপ্ত করেছেন। ঐতিহাসিক বিচারে এই মনোভাব অত্যন্ত দুঃখজনক এবং সংকীর্ণ-চিত্ততার পরিচায়ক।

অষ্ট্রিক অথবা দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর কোন লিপি না থাকায়, আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সময় থেকে প্রায় খৃষ্টীয় ২ শতক পর্যন্ত বাঙ্গালীর কোন ইতিহাস নেই, এ কথা বলা হয়েছে।

সুশৃঙ্খলভাবে ইতিহাস রচিত না হলেও এবং পরবর্তী যুগে, বিশেষ করে মুসলমান শাসনের অভ্যুদয়ের পরে ইতিহাস বিকৃত এবং মিথ্যাভাবে লিখিত হবার সম্ভাবনা স্বীকার করে নিলেও, এই পাঁচ অথবা ছ'শত বছরের বাঙ্গালীর ইতিহাস নেই —এ কথা বলা ভুল। এই সময়ের ইতিহাস রাঢ়-গৌড়-পুণ্ড্রের ইতিহাস, যাদের অধিবাসীদের গ্রীক ও রোমান লেখকেরা গঙ্গারিডি বলে অভিহিত করেছেন। এদের কথা পরে আরও বিশদভাবে আলোচিত হবে।

গৌড় অর্থে এক রকম আখের নাম। গুড় শব্দটির সঙ্গে গৌড় শব্দের যোগ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গৌড়ের উল্লেখ আছে, একথা আগেই বলা হয়েছে। এই নামটির উৎপত্তি দ্রাবিড় এবং নগরটি দ্রাবিড়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। রাঢ়-গৌড়-পুণ্ড্র সমন্বিত গঙ্গারিডির বিশাল রাজ্য প্রাসী সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এক বিরাট সামরিক শক্তির সহায়তায় বিপাশানদী পর্যন্ত উত্তরপশ্চিম ভারতে বিস্তৃত ছিল। এই প্রচণ্ড শক্তিশালী দুই জাতি তথা দেশের অপ্রতিরোধ্য সামরিক শক্তিতে ভীত হয়ে, পরাক্রান্ত আলেকজাণ্ডার গভীর নৈরাশ্যে ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

অঙ্গদেশ ও পুণ্ড্রদেশ ছিল বন্য হস্তীর জন্য বিখ্যাত। 'ইতিহাস-পূর্ব যুগ হইতে বাঙ্গালী বন্য হস্তীকে বশীভূত করার দক্ষতা অর্জন করিয়াছিল, এবং পালকাপ্য ছিলেন হস্তী-বিশারদ, হস্তী-চিকিৎসক। হস্তীবাহিনী গড়িয়া তোলার দক্ষতা তাই নন্দবংশীয় বাঙ্গালীরা অর্জন করিয়াছিলেন।'[২০]

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও হস্তীপালন সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। অঙ্গ ও পুণ্ড্র এই দুই দেশই যথাক্রমে প্রাসী এবং গঙ্গারিডির অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং রাঢ় দেশ প্রাক্তন

অঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং ডিয়োডোরাস, প্লিনী, প্লুটার্ক, স্ট্রাবো প্রভৃতি যাঁরা মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণের উপর ভিত্তি করে তাঁদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা সকলেই প্রাসাই এবং গঙ্গারিডাইদের হস্তিবাহিনীর কথা জানিয়ে গেছেন।

অনুমান করা যেতে পারে, বিশেষভাবে এই দুর্ধর্ষ হস্তিবাহিনীর আতঙ্কেই আলেকজাণ্ডার আর পূর্বভারতে বিজয় অভিযান পরিচালনা করতে সাহসী হন নি।

পুণ্ড্র দেশের রাজারা আর্যশাস্ত্রে ও সাহিত্যে প্রথমে দাস, দস্যু বলে চিহ্নিত এবং অপমানিত হলেও পরবর্তী আর্যসমাজ এঁদের সৎ ক্ষত্রিয় বলে স্বীকার করেছেন। তবে আর্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের চোখে এরা বরাবরই ব্রাত্য—এদের শূদ্রত্বের মোচন হবার পরেও। মহাপদ্ম নন্দ, যাঁকে সিংহলীয় 'মহাবংশ' গ্রন্থে উগ্রসেন বলা হয়েছে, পুরাণে শূদ্রগর্ভোদ্ভূত বলা হয়েছে এবং গ্রীক ও জৈন সূত্রে নাপিতপুত্র বলে বলা হয়েছে, পিতৃ ও মাতৃ কুলের দিক থেকে যথাক্রমে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় উভয় জাতির প্রতিনিধি ছিলেন বলে মনে করা অসঙ্গত নয়। মহাপদ্ম নন্দ ক্ষমতাশালী হয়ে তাঁর হীনজন্মের প্রভাবেই ক্ষত্রিয় নিধনে তৎপর হয়েছিলেন। এই বিষয়টি আরও বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

নির্দেশিকা

১। গৌড়ের ইতিহাস —রজনীকান্ত চক্রবর্তী।

২। গঙ্গারিডি : নাম ও স্থান প্রসঙ্গ—('কৌশিকী' শারদীয়া সংখ্যা ১৩৯৩) —সুহৃদকুমার ভৌমিক।

৩। গৌড়ের কথা —অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

৪। Burton's —History of Bengal.

৫। বর্ধমানের ইতিকথা—(প্রাচীন ও আধুনিক) —নগেন্দ্রনাথ বসু।

৬। গৌড় কাহিনী—(প্রাচীন যুগ) —শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ।

৭। উত্তরবঙ্গের ইতিহাস —সুকুমার দাশ।

৮। বাংলাদেশের ইতিহাস —ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

৯। উত্তরবঙ্গের ইতিহাস —সুকুমার দাশ।

১০। "The ancient name of northern Bengal was Pundra-Vardhana and the identification of its capital Pundra Nagara with Mahasthan in Bogra district is certain after the Publication of the Mahasthan Inscription in old Brahmi". 'The Early History of Bengal' —Promode Lal Paul.

১১। বিদেশীর চোখে ভারত—হিউ-এন-সাঙ—(সংকলন)—প্রেমময় দাশগুপ্ত।
১২। The Early History of Bengal —Promode Lal Paul.
১৩। বাংলার ইতিহাস (১ম ভাগ) —রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৪। অর্থশাস্ত্র —কৌটিল্য।
১৫। উত্তরবঙ্গের ইতিহাস —সুকুমার দাশ।
১৬। গৌড় কাহিনী (প্রাচীন যুগ) —শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ।
১৭। বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাস —ধনঞ্জয় দাশ মজুমদার।
১৮। উত্তরবঙ্গের ইতিহাস —সুকুমার দাশ।
১৯। বিশাখ দত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' দ্রষ্টব্য
২০। বাঙ্গালীর ইতিহাস —কমল মজুমদার।
The Fundamental unity of India
—Dr. Radha Kumud Mukherjee.
"Anga, Karusa, Prachya and Kalinga are also mentioned as sources of supply of elephants".

তাম্রলিপ্ত

'প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্ত বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। তাদের মধ্যে তাম্রলিপ্ত (মহাভারত), তাম্রলিপ্তি (ভারতকোষ), বেলাকূলং তাম্রলিপ্তং, তমোলিপ্তি, তমালিকা (ত্রিকাণ্ডশেষঃ), দামলিপ্তং, তমালিনী, স্তম্বপুর বিষ্ণুগৃহং (হেমচন্দ্রঃ), তমোলিপ্ত (শব্দরত্নাবলী) ও তমোলিপ্তী (শব্দকল্পদ্রুমঃ), বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন কালে তাম্রলিপ্ত ছিল কলিঙ্গ দেশের অন্তর্গত।'[১]

"বৃহৎবঙ্গ" গ্রন্থে (পৃ: ১১১৪) ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন এই মত সমর্থন করেছেন যে পুরাকালে তাম্রলিপ্তে বাসকারী "দামিল" নামে এক জাতির নাম অনুসারে, এই দেশের নাম হয়েছিল তাম্রলিপ্ত। এবং এই দামিল জাতিই দক্ষিণ ভারতে তামিল দেশের সৃষ্টি করেন।

তাম্রলিপ্ত প্রাচ্যভারতের অন্যতম প্রাচীন জনপদ। 'কিন্তু মনুসংহিতা বা রামায়ণে তাম্রলিপ্তের নাম নাই। অনুমান, তখনও তাম্রলিপ্তে দ্রাবিড় জাতির প্রাধান্য ছিল'।[২]

মহাভারতে কয়েকবার তাম্রলিপ্তের অথবা তাম্রলিপ্তের রাজার উল্লেখ আছে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় তাম্রলিপ্তরাজ উপস্থিত ছিলেন। মহাভারতীয় যুগের পরবর্তীকালে তাম্রলিপ্তের রাজা ময়ূর বংশীয় ময়ূরধ্বজ বলিরাজার পুত্র সুহ্মের বংশধর বলে অভিহিত ছিলেন। (বঙ্গের অনন্ত সামন্ত চক্র ও ইসলাম রাষ্ট্রের ইতিহাস—ধনঞ্জয় দাশ মজুমদার)।

সুহ্ম দেশের কথা স্বতন্ত্রভাবে বলেছে মহাভারত, যার থেকে মনে হয় তাম্রলিপ্ত ও সুহ্ম এক এবং অবিচ্ছিন্ন ছিল না। দুই পৃথক সত্তায় তারা তাদের পরিচয় বহন করছিল। স্বাধীন তাম্রলিপ্তের সীমা মহাভারতের যুগে নর্মদা নদী পর্যন্ত পৌঁচেছিল বলে, কেউ কেউ অনুমান করেন।[৩] পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রাকালে তাম্রলিপ্তরাজ তাম্রধ্বজ নর্মদা তীরেই পাণ্ডব বাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। বর্তমান তমলুকের মাহিষ্য ধ্বজ বংশ নিজেদের এই তাম্রধ্বজের বংশধর বলে দাবি করে।[৪]

যাই হোক, এই সুহ্মই ছিল রাঢ় দেশের পূর্বসূরী, মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন, সুহ্মাঃ রাঢ়াঃ। তাম্রলিপ্ত ছিল সুহ্মের অন্তর্গত স্বতন্ত্র জনপদ অথবা রাজ্য।

ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে তাম্রলিপ্ত নাটকের যবনিকা উত্তোলিত হয় খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ পঞ্চম শতকে। সিংহলীয় 'মহাবংশ' থেকে আমারা কলিঙ্গদেশের অন্তর্গত রাঢ়ের অধীশ্বর সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহের সিংহল যাত্রার কাহিনী জানতে পারি। পিতা কর্তৃক নির্বাসিত হয়ে রাঢ়ের যুবরাজ বিজয় সিংহ তাম্রলিপ্ত বন্দরে প্রস্তুত তিনখানি অর্ণব-পোতে সদলবলে উঠে যাত্রা করেছিলেন।

সিংহবংশ যে সমগ্র রাঢ়ে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল, এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয়, এবং সেই আধিপত্যের কালে তাম্রলিপ্ততে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়া

অসম্ভব ছিল না। মধ্য রাঢ়ে শিবি ও চেত রাজ্য সিংহপুরের এই রাজ্যের চেয়ে প্রাচীন বলেই মনে হয়। পুন্ড্রেরা রাঢ় দেশে কর্তৃত্ব স্থাপনের সময়ে রাঢ়ের প্রধান রাজশক্তি সিংহবংশই তাদের বশ্যতা স্বীকার করেছিল।[৫]

পরবর্তী যুগে অর্থাৎ মৌর্য্য বিজয়ের আগে পর্যন্ত, তাম্রলিপ্তকে ইতিহাসে সুহ্মদেশের রাজধানীরূপে দেখা যায়। আগে বলা হয়েছে যে তাম্রলিপ্ত কলিঙ্গ দেশের মধ্যে অবস্থিত বলে মনে হয়। অশোকের বৌদ্ধ স্তূপ বা বিজয়স্তম্ভ হিউ-এন-সাঙ দেখেছিলেন, তাম্রলিপ্ত শহরের উপকণ্ঠে। কিন্তু এই শহর অশোকের কুক্ষিগত হয়েছিল, এমন কোন চূড়ান্ত নিদর্শন নেই। তবে সিংহলী 'মহাবংশ' গ্রন্থে সিংহলের রাজদূতকে বিদায় দিতে তাম্রলিপ্তিতে অশোকের উপস্থিতির কথা উল্লিখিত আছে।

অশোকের ধর্মবিজয়ের সময়ে অশোকের ভ্রাতা মহেন্দ্র, কন্যা সংঘমিত্রা বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য সিংহলে যাবার সময় এই তাম্রলিপ্তিতে জাহাজে আরোহণ করেছিলেন। সুতরাং হয় তাম্রলিপ্ত তখন কলিঙ্গের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং অশোকের সামাজ্যভুক্ত ছিল, নয় গঙ্গারিডিদের রাজধানী ও প্রধান বন্দর ছিল এবং গঙ্গারিডিদের উপর মগধের আধিপত্যের সূত্রেই হোক অথবা বন্ধুত্বের সূত্রেই হোক, তাম্রলিপ্তিতে অশোকের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল।

তবে গঙ্গারিডি যে অশোকের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই মগধ সাম্রাজ্যের অধীনতা পাশ থেকে মুক্ত হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কলিঙ্গরাজ দ্বিতীয় খারবেল (খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী) যে গঙ্গারিডিদের বিরুদ্ধে কোন সামরিক অভিযান করেছিলেন, এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ ইতিহাসে নেই, যদিও তিনি মগধের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কয়েকবার মগধ আক্রমণ করেছিলেন।[৬] তবে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে লিখিত প্লিনীর (মেগাস্থিনিসের উপর নির্ভরশীল) বিবরণ থেকে গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ী নামে এক জাতির খবর পাওয়া যায়, যারা অবশ্যই খাঁটি কলিঙ্গীদের থেকে স্বতন্ত্র, কিন্তু যারা মনে হয় বৃহত্তর গঙ্গারিডি অথবা বৃহত্তর কলিঙ্গীদের অন্তর্ভুক্ত এবং সম্পর্কযুক্ত।

তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) ছিল এখনকার মেদিনীপুর জেলায় এবং মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার (কলিঙ্গের উত্তর ও মধ্য অংশ যাদের প্লিনী হয়তো গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ী এবং মদ্গালিঙ্গি হিসেবে বর্ণনা করেছেন) যোগসূত্র অনেক দিনের। তাম্রলিপ্তের খ্যাতি সুদূর যবদ্বীপ এবং চীনদেশে প্রসারিত হয়েছিল। 'পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বর্তমান তমলুক নগরটি প্রাচীন দমোলিপ্ত বা তাম্রলিপ্ত নামের হীন পরিণতি'।[৭]

জৈন ধর্মের তাম্রলিপ্ত শাখার নাম থেকে তাম্রলিপ্তের নামকরণ হয়েছে। আবার কারো মতে মহাভারতে কথিত তাম্রধ্বজ রাজার নাম থেকেই তাম্রলিপ্তের নামকরণ হয়েছে।[৮]

একজন বিদেশী লেখকের গ্রন্থ থেকে এই কথা প্রতীয়মান হয় যে প্লিনীর অভিমত অনুযায়ী তাম্রলিপ্ত ছিল প্রাচী (প্রাসাই) রাজ্যের অন্তর্গত।[৯] এর অন্যতম কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন যে এই রাজ্য (প্রাসাই) থেকে সিংহল মাত্র সাতদিনের সমুদ্র

যাত্রা। সুতরাং সেই যাত্রা তাম্রলিপ্ত থেকেই শুরু হওয়াই সম্ভব, পাটলিপুত্র থেকে নয়। কিন্তু আমরা জানি, সেই যুগে উজানে জাহাজ অঙ্গদেশের চম্পা এবং প্রাচ্য (মগধ) দেশের পাটলিপুত্র পর্যন্ত চলে যেত। কিন্তু সাত দিনেও তাম্রলিপ্ত থেকে সিংহলে পৌঁছানো যেত কিনা, সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কেউ কেউ এই সমুদ্র যাত্রায় কুড়ি দিন সময় লাগবে বলে মনে করেছেন।[৩] সুতরাং পাটলিপুত্র থেকে, না চম্পা থেকে, না তাম্রলিপ্ত থেকে কুড়ি দিনে সমুদ্র ভ্রমণে সিংহলে পৌঁছানো যেতো, তা আজ নিঃসংশয়ভাবে কিছু বলা যায় না।

বিদেশী লেখক কর্তৃক বিবৃত অভিমত চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, ক্রমশঃ দ্রুতগামী জাহাজ নির্মিত হয়েছিল, এবং তাম্রলিপ্তও কোন রাজ্য বিশেষের বন্দর না হয়ে, ভারতের প্রাচ্য ভূভাগে সর্বসাধারণের ব্যবহৃত বন্দর ছিল, যদিও মহাভারতের যুগ থেকে তাম্রলিপ্ত কখনও স্বাধীন, কখনও সুহ্মের অন্তর্গত, কখনও বা কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাম্রলিপ্তকে স্বাধীন বলে জানা যায়। পরবর্তীকালে বঙ্গদেশ (রাঢ় ?) এবং উড়িষ্যার মধ্যে মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের আধিপত্যের জন্য প্রতিযোগিতা চলেছিল।

দেশীয় আর্ষসাহিত্য, জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্য প্রভৃতি কখনই তাম্রলিপ্তকে মগধ তথা প্রাচ্যদেশ তথা প্রাসাইয়ের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে নির্দেশ করে নি। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং তৎসান্নিহিত তদানীন্তন কলিঙ্গের কিছু অংশ গঙ্গারিডির মূল বিষয় হলে, রাঢ়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সমুদ্রোপকূলস্থ তাম্রলিপ্ত কখনই প্রাচী (মগধ) রাজ্যের অংশ বলে বিবেচিত হতে পারে না।

তাম্রলিপ্ত ও সুহ্মের (দক্ষিণ রাঢ়) উত্তরে প্রসুহ্ম ও পুণ্ড্ররাজ্য (গৌড়সমন্বিত ?) পূর্বে বঙ্গরাজ্য, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে প্রাসী এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে কলিঙ্গরাজ্য। তখন বর্তমান মেদিনীপুর জেলার উত্তর ও পূব ভাগ বেশীটাই (সুবর্ণরেখা না হলেও কাঁপশা পর্যন্ত) সুহ্ম ও তাম্রলিপ্তের মধ্যেই ছিল। অতি অল্পই (তমলুকের দক্ষিণ-পশ্চিমস্থিত) কলিঙ্গরাজ্যের মধ্যে ছিল।

মহাপদ্ম নন্দ অন্ততঃ একবার কলিঙ্গ বিজয়ের জন্য অভিযান করেছিলেন,[৪] এবং নিশ্চয়ই প্রাসী এবং গঙ্গারিডি রাজ্যের সংলগ্ন কলিঙ্গদেশের অংশবিশেষ কুক্ষিগত করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাম্রলিপ্ত জয় করেছিলেন এবং তাম্রলিপ্তকে প্রাসী রাজ্যের মধ্যে গ্রাস করেছিলেন, এমন কোন সংবাদই ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় না। তিনি গঙ্গারিডিদের রাজা ছিলেন, সেই হিসেবে সুহ্ম ও তাম্রলিপ্ত অথবা শুধু সুহ্ম (তাম্রলিপ্ত ব্যতীত) তাঁর অধীনে ছিল। কিন্তু তাম্রলিপ্ত তখন পাটলিপুত্রকেন্দ্রিক মগধরাজ্যের ভিতর যায় নি। হয়তো গ্রীক বর্ণিত সার্বভৌম প্রাসী (মগধ সাম্রাজ্য) তাম্রলিপ্তের উপর আধিপত্য বিস্তার করে থাকবে।

মহাপদ্ম নন্দের উত্তরাধিকারীরা কেউ যে তাম্রলিপ্ত জয় করেছিলেন, এমন ঘটনা কুত্রাপি লিপিবদ্ধ হয় নি। আলেকজাণ্ডার ভারত ত্যাগ করার পরে, মগধ রাজ্যে

রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল এবং তার ফলে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। মনে হয় বঙ্গদেশের এবং কলিঙ্গের কিছু অংশ তিনি নন্দ-রাজাদের সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে পেয়েছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসারের সময়ে তাঁর সাম্রাজ্যে এক বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছিল বলে জানা যায়। সেই কারণেই হয়তো ক্ষমতায় উন্মত্ত চণ্ড স্বভাবের অশোকের বিশাল বাহিনীসহ কলিঙ্গ অভিযান এক রক্তস্রাবী হিংস্র সংগ্রামের এবং ধ্বংসের তাণ্ডবলীলায় পরিণত হয়েছিল।

অশোকের মগধকেন্দ্রিক প্রাসাই-গঙ্গারিডাই যুক্তরাষ্ট্রের তথা ভারত সাম্রাজ্যের চরম শক্তি পরীক্ষা হলো বিদেশী বর্ণিত গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ী এবং কলিঙ্গীদের সঙ্গে। রণক্ষেত্রে কলিঙ্গীদের পক্ষভুক্ত তাম্রলিপ্তবাসী বাঙ্গালীদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল সম্রাট অশোকের সর্বভারতীয় বিরাট সৈন্যবাহিনীর, যার মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক বাঙ্গালী সৈন্য অবশ্যই ছিল, সন্দেহ নেই। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর "বৃহৎবঙ্গ" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের (এগারশত পৃষ্ঠায়) বলেছেন, 'অশোক যে যুদ্ধে অসংখ্য লোক বিনষ্ট করিয়া কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন, সেই কলিঙ্গের সৈন্যগণ বোধহয় তাম্রলিপ্তবাসীরাই ছিলেন। ইহারা অত্যন্ত দুর্দান্ত ছিলেন।'

তাম্রলিপ্তের শহর ও বন্দর এবং তাদের সন্নিহিত এবং বিশেষভাবে সাগরকূলের স্থানসমূহ সেই সময়ে দাক্ষিণপুণ্ড্রের দুর্ধর্ষ জাতির দ্বারা অধ্যুষিত ছিল এবং বারেন্দ্র এবং কলিঙ্গের মানুষদের নিয়ে এক প্রতিপত্তিশালী, বীর্যবান এবং সহায় ও সম্পদ-সম্পন্ন সামুদ্রিক জাতিতে পরিণত হয়েছিল। গঙ্গার একটি শাখা সরস্বতী নদী রূপনারায়ণ ও দামোদরের মিলিত প্রবাহে যুক্ত হয়ে তাম্রলিপ্ত বন্দরের পাশে খাড়ির মধ্য দিয়ে সাগরে লীন হতো।

সম্রাট অশোক তাম্রলিপ্ত নগরের প্রান্তভাগে কলিঙ্গযুদ্ধের বিজয়সূচক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন (Rock Edict xiii)। চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ তাম্রলিপ্ত পরিক্রমাকালে সেই স্তম্ভ লক্ষ্য করেছিলেন, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে।[১২] হিউ-এন-সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় যে তিনি নিজে পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট হয়ে রাঢ় দেশের ভিতর দিয়ে তাম্রলিপ্তে উপনীত হয়েছিলেন।

প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করলে জানা যায় যে মহাভারতীয় যুগের পরে মাহিষ্যগণ তাম্রলিপ্ত অধিকার করেন। নর্মদাতীরস্থ মাহিষ্মতী রাজ্যের ক্ষত্রিয়গণের উত্তরপুরুষেরাই এই মাহিষ্য বলে মনে হয়। খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় তৃতীয়/চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে তাম্রলিপ্তের কলেবরগত ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছিল।

তাম্রলিপ্ত ছিল প্রথমে একটি রাজ্য। কিন্তু ঐতিহাসিক যুগের সূচনায় এবং বৌদ্ধ প্রাধান্যের যুগে তাম্রলিপ্ত তা ছাড়াও প্রাচ্য দেশের অন্যতম বৃহৎ বন্দর এবং আন্তর্জাতিক পোতরূপে আত্মপ্রকাশ করে বিপুল খ্যাতির অধিকারী হয়েছিল। এক সময়ে 'উড়িষ্যার প্রায় পশ্চিম সীমাস্থিত সুবর্ণরেখার মুখ হইতে সুন্দরবনের মুখ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী সমস্ত দেশ তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।[১৩]

বঙ্গদেশের অন্যতম প্রাচীন ভূখণ্ড এই তাম্রলিপ্ত—যা হয়তো প্রথমে সাগর উপকূলস্থ

একটি দ্বীপের আকারেই ছিল, তা পরে ক্রমশঃ মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তাম্রলিপ্তের বেলাকূল নামটি সেই হিসেবে সার্থক। 'সেই সুপ্রাচীনকালে তাম্রলিপ্তের সন্নিকটেই গঙ্গাসাগর তীর্থ প্রতিষ্ঠিত ছিল। কারণ গঙ্গা এবং সমুদ্রের সঙ্গমস্থলেই নির্দিষ্ট হয়েছিল সাগরতীর্থ'।[১৪]

ঐতিহাসিককালে গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রাচীনতম পথ পূর্ণিয়ার দক্ষিণে রাজমহল অতিক্রম করে সাঁওতালভূমি-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূমের নিম্নে সোজা দক্ষিণবাহিনী হয়ে সমুদ্রে মিলিত হতো এবং এই প্রবাহেই ছিল অজয়-দামোদর-রূপনারায়ণের সংগম। এই প্রবাহের দক্ষিণতম সীমায় ছিল তাম্রলিপ্ত বন্দর এবং রাজ্য যার সঙ্গে গ্রীক ও ল্যাতিন লেখকদের গঙ্গারিডি অথবা গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ীর বর্ণনা অনেকাংশে মিলে যায়।

এই নদীর (গঙ্গার) শেষভাগ যে রাজ্যের মধ্য দিয়ে গেছে, এবং যে রাজ্যের সমুদ্রের কূলে কালিঙ্গেয়ীদের বাস—এই দুটি শর্তের অধীনে রাঢ়দেশসহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গই নিঃসন্দেহে গঙ্গারিডি, এবং এক বৃহৎ অংশের তৎকালীন বাঙ্গালীর আদিম আবাসভূমি। এই জনগোষ্ঠী যে বঙ্গদেশের অন্যত্র অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে এবং উত্তরবঙ্গে পরিব্যাপ্ত হতে পারে না বা হয় নি, তা নয়। তবে প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই যে বলেছেন যে গ্রীকেরা গঙ্গার পূর্ব তীর থেকে সমুদ্র পর্যন্ত নিম্নবঙ্গকে গঙ্গারিডি নাম দিয়েছিলেন—তা শুধু সত্যের অপলাপ মাত্র!

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ—গঙ্গানদী যার হৃদয়স্বরূপ—যে বিদেশী বর্ণিত গঙ্গারিডি সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। গঙ্গা-ভাগীরথীই গঙ্গার প্রাচীনতম প্রবাহ পথ এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগের অভ্যুদয়ে নিম্ন গঙ্গার এই মূল প্রবাহই বিদেশী পর্যটক ও লেখকদের দৃষ্টি এবং মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। 'মৎস্যপুরাণে আছে কৌশিক (উত্তর বিহার) ও মগধ (দক্ষিণ বিহার) পার হইয়া গঙ্গা বিন্ধ্য-পর্বতের গাত্রে (রাজমহল-সাঁওতালভূমি-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম শৈলমূলে) প্রতিহত হইয়া ব্রহ্মোত্তর অর্থাৎ মেটোমুটি উত্তররাঢ়, বঙ্গ এবং তাম্রলিপ্ত দেশের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত। ভাগীরথীর পূর্ব তীরে বঙ্গ পশ্চিম তীরে তাম্রলিপ্ত, উত্তরের প্রবাহে উত্তররাঢ়'। (বাংলার নদনদী—নীহাররঞ্জন রায়, বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত)। সুতরাং প্রাচীন যুগে সুহ্ম (দক্ষিণ রাঢ়) দেশকে তাম্রলিপ্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধরলে, গঙ্গারিডি তথা নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চল সমগ্র বর্তমান পশ্চিমবঙ্গকেই বোঝায়।

তাম্রলিপ্তের অস্তিত্ব মহাকাব্যীয় যুগের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্তের মধ্যে গ্রথিত আছে। জৈনধর্মের প্রাদুর্ভাবের সময়ে এবং বৌদ্ধদের রাজনৈতিক আধিপত্যের সময়ে তাম্রলিপ্ত এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, উত্তর-পূর্ব ভারতের বিশিষ্ট সামুদ্রিক বন্দর। জৈন কল্পসূত্র থেকে জানা যায় যে খৃঃ পূঃ অষ্টম শতকে তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে পুণ্ড্র, রাঢ় ও তাম্রলিপ্তে চতুর্থ যাম ধর্ম প্রচার করেন ('বাংলা-দেশের ইতিহাস', প্রাচীন যুগ—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার)।

'আর্যপ্রভাব পড়ার আগে তাম্রলিপ্তের খুব জাঁকজমক ছিল। আর্যপ্রভাবমুক্ত

এই জায়গার নাম তাঁরা (আর্যেরা) অবজ্ঞা করে বলতেন তমোলিপ্ত। বৌদ্ধ ভারতের প্রাচীন সংঘারামও অবস্থিত ছিল এখানে। পবিত্র বোধিদ্রুম এখান থেকেই সিংহলে পাঠানো হয়েছিল।'[১৫] প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ সিংহলীয় 'মহাবংশে' বলা হয়েছে খৃঃ পূঃ ৩০৭ অব্দে তাম্রলিপ্ত একটি প্রসিদ্ধ সমুদ্রবন্দর ছিল।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিমতে (প্রাচীন বাংলার গৌরব) বঙ্গদেশে দ্রাবিড় জাতির বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক নগর) তাদের একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র এবং বন্দর ছিল। এই দ্রাবিড়েরাই দামল বা তামল জাতি, যার থেকে প্রাচীন সংস্কৃতে এই স্থানেব নাম পাওয়া যায় দামলিপ্তি এবং পরে তাম্রলিপ্ত। পালি ভাষায় তাম্রলিপ্তির রূপ হয় তামলিপটি।

তামিল শব্দ এই তাম্রলিপ্তি থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলেই বোধ হয়। গুপ্তযুগের আগে তাম্রলিপ্ত আর্য্যাধিকারে আসে নি। পুণ্ড্র, রাঢ় এবং কলিঙ্গদের দ্রাবিড় সংস্কৃতি ও ভাষার প্রভাব তাম্রলিপ্তেও ছিল। এবং সেই পৌরাণিক যুগ থেকেই তাম্রলিপ্ত ছিল উত্তরভারতে প্রাক-আর্য সভ্যতার এক ঘাঁটি। ঐতিহাসিক যুগের সূচনার ঠিক আগেই এখানে শৈবধর্ম প্রথমে প্রভাব বিস্তার করলেও, মৌর্য সম্রাট অশোকের সময় থেকে তাম্রলিপ্তে বৌদ্ধপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ক্রমে ক্রমে দামলজাতি দক্ষিণ ভারতে বিতাড়িত হয়। এর পরে দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছিল। লংকা পর্যন্ত সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তৃত হয়েছিল। অনেক ঐতিহাসিকই পণ্ডিত কনকসভাই পিল্লের এই যুক্তি সমর্থন করেছেন যে তামিলেরা তাম্রলিপ্ত থেকে দক্ষিণ ভারতে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, এবং দাড়ী, নাড়ী প্রভৃতি বাঙ্গলা শব্দ ব্যবহার করতো। এই মর্মে এক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছিলেন—'যেমন বিজয়সিংহ হইতে সিংহলের নামকরণ হইয়াছে বুঝিতে পারি, তেমনই বঙ্গের এক সময়ের রাজধানী তাম্রলিপ্তের নামানুসারে তামিল দেশের নামকরণ হইয়াছিল বুঝা যায়।'[১৬]

এই প্রসঙ্গটি আর অধিক আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। রাঢ়দেশের অন্তর্গত তাম্রলিপ্তের ইতিহাস শুধু যে প্রাচীন, তাইই নয়। তাম্রলিপ্তবাসীদের জীবন বিশেষভাবে ঐতিহ্যপূর্ণ এবং উন্নত। তারা বাহুবলসম্পন্ন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, সিংহল, সুবর্ণভূমি, চীন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্যের দ্বারা সংযুক্ত, সুসভ্য এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন।[১৭]

চৌনিক পরিব্রাজকদের বিবরণ পাঠ করলে মনে হয় যে তাম্রলিপ্ত নগরীতে বহু ধনবানের বাস ছিল। সামরিক জাহাজ এবং বাণিজ্য জাহাজ নির্মাণের কারখানা ছিল। মোট কথা তাম্রলিপ্ত ছিল প্রগতিশীল, সমৃদ্ধিশালী এবং জনবহুল। বৌদ্ধ যুগে তাম্রলিপ্তের খ্যাতি বহু দূর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। গ্রীকেরা এই তাম্রলিপ্তসহ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গা-কেন্দ্রিক ভূভাগকে গঙ্গারিডি আখ্যা দিয়েছিলেন—সন্দেহ নেই।

সুপ্রাচীন কাল থেকে তাম্রলিপ্ত প্রাচ্য ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

বিভিন্ন তথ্য থেকে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে তাম্রলিপ্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়েছিল, যেমন, ব্যবসায় ও বাণিজ্যকেন্দ্র, শিক্ষাকেন্দ্র, রাজধানী, বন্দর। এই তাম্রলিপ্ত একটি পুরাতন এবং উচ্চস্তরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাকে পুষ্ট করে, ইতিহাসে তার স্থান চিরস্থায়ী করে নিয়েছিল। একটি উন্নত প্রাগার্য্য সভ্যতার স্রোতকে দৃঢ়ভাবে বহন করে তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে এবং সুপরিকল্পিত-ভাবে দক্ষিণের দিকে ব্যাপ্ত করে দিয়েছিল, এই প্রাচীন জনপদ। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি তাম্রলিপ্তের গৌরবময় অতীতের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করে ঃ—

"প্রাগৈতিহাসিক যুগে উত্তর ভারতে আর্য সভ্যতা বিস্তৃত হইবার বহুকাল পূর্বে তাম্রলিপ্তের সভ্যতাই দেশে বিদেশে পরিব্যাপ্ত ছিল। তাম্রলিপ্তের অধিবাসীরাই দাক্ষিণাত্যে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে গিয়াই তাঁরা খৃষ্টের জন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্বে সুদূরে বাবিরুষ ও অসুরে বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক হল অনুমান করেন, ভূমধ্য সাগর হইতে বঙ্গোপসাপর পর্যন্ত তাহাদের অধিকার বিস্তৃত ছিল। তাহারা তখন ধাতব অস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত এবং অঙ্কিত সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ ছিলেন। নানাবিধ শিল্পও তাঁহাদিগের আয়ত্ত হইয়াছিল। (Hall's Ancient History of Near East P. 171-174)"[১৮]

কয়েকজন বিদেশী ভারততত্ত্ববিদ এবং সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের অভিমত অনুযায়ী তাম্রলিপ্তের অধিবাসীদের সঙ্গে প্রায় তিন হাজার বৎসর আগে মিশরের গভীর সম্পর্ক ছিল। যেমন, এক—গাঙ্গেয় নৌশিল্পের সঙ্গে মিশরের নৌশিল্পের সাদৃশ্য আছে। দুই—বাংলার দুর্গোৎসব এবং মহিষাসুর বধের কাহিনীর মধ্যেও মিশরের সংস্রব রয়েছে। মহিষাসুর বা শ্রেষ্ঠ অসুর ছিলেন প্রাক-আর্য এক শক্তিশালী নরপতি যিনি বাঙলাকেন্দ্রিক পূর্ব ভারতকে বৈদিক ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছিলেন। মহিষ অর্থে শ্রেষ্ঠ এবং মহিষের রূপ থেকে মহিষাসুর পুনরায় আবির্ভূত হতেন। মিশরে প্রাপ্ত একটি জনপ্রিয় চিত্রের ব্যাখ্যায় মিশরতত্ত্ব সংক্রান্ত পুস্তকগুলি বলেছেন যে এক রাজা কখনো মহিষের রূপ ধারণ করে শত্রুর চোখে ধূলি দিয়ে জয়লাভ করেছে।

কিন্তু তাম্রলিপ্তে বিদেশীয় রক্তের উপস্থিতির উপর্যুক্ত কারণের বিপরীত অন্য একটি বিশেষ ধারণা প্রচলিত আছে। ব্যাবিলন, মিশর ও সুমেরীয় প্রভৃতি সভ্যতার সঙ্গে প্রাচীনকালে ভারতের সিন্ধু অঞ্চলের এবং তাম্রলিপ্তের মধ্যে যে যোগাযোগ ছিল, তার কারণ হলো ভারতীয় অসুর সভ্যতা। এই অসুর সভ্যতার মূল কেন্দ্র ছিল, রাঢ়ভূমি। মেদিনীপুরের পশ্চিমাঞ্চলে ও সিংভূম জেলায় অসুর সভ্যতার বিস্তর নিদর্শন পাওয়া গেছে।

এইখানে এই কথা স্মরণযোগ্য যে মহাভারতে (বনপর্বে) অঙ্গরাজ কর্ণ অর্জুনকে বধের প্রতিজ্ঞায় আসুর ব্রত উদযাপন করেছিলেন, মদ এবং মাংস স্পর্শ না করে। বলাই বাহুল্য, এই আসুর শব্দটি সেই অঞ্চলের তৎকালীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা বহন

করেছিল। মহিষ শব্দ থেকে মাহিষ্য জাতির উৎপত্তি। এই শব্দটি ক্ষত্রিয়েরই নামান্তর বলে অনেকে মনে করেন।[১৯]

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত তাম্রলিপ্ত রাজ্যকে বঙ্গদেশের পাঁচটি রাজ্যের অন্যতম বলে এই রাজ্যকে "সমগ্র দক্ষিণ বাঙ্গালা ব্যাপী" বলে বর্ণনা করেছেন। তাম্রলিপ্তের পশ্চিমদক্ষিণে ছিল কলিঙ্গ রাজ্য। 'তমলুক ও ময়ূরভঞ্জ, এই দুই দেশের মধ্যে বিশেষ সংস্রব ছিল বলিয়া মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় দেশের অন্তর্গত তাম্রলিপ্ত, এবং ময়ূরভঞ্জেও অদ্যাবধি রাঢ় নামের রেশ রয়েছে—এ সবই গঙ্গারিডি রাজ্যের বিষয়ীভুক্ত ছিল।'[২০]

'ময়ূরভঞ্জ উৎকলবাসীদিগের নিকট অদ্যাপি রাঢ় নামে পরিচিত'।[২১]

গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমিতে তাম্রলিপ্ত কখনও এক বৃহদায়তন নগরী, কখনও এক বিশাল রাজ্য, কখনও যুগপৎ নগর ও রাজ্য। কখনও এক মুখ্য বন্দর এবং পরবর্তীকালে সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ও পীঠস্থান।

১৯৫৫ সালে ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে তমলুকের কাছে খননকার্য পরিচালিত হয়, এবং একটি লিপি খোদাই করা মৃৎপাত্র পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা এই লিপিকে ব্রাহ্মী অথবা খরোষ্ঠী বলেছেন এবং পরেশ দাশগুপ্ত (পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন অধিকর্তা) উক্তলিপির পাঠোদ্ধার করে বলেছিলেন যে খরোষ্ঠী লিপিতে ঐ মৃৎপাত্রে লেখা ছিল—তমলিপ্তস্।[২২] ব্রাহ্মী অথবা খরোষ্ঠী লিপি মৌর্য সম্রাট অশোকের সময়েই প্রচলিত হয়।

পুন্ড্রদেশের মতোই তাম্রলিপ্তের হস্তী-সম্পদের কথা মহাভারত থেকে জানা যায়। মহাভারতের সভাপর্বে তাম্রলিপ্তাধিপতির রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে রাজচক্রবর্তী যুধিষ্ঠিরকে বহুসংখ্যক রণকুঞ্জর উপঢৌকন প্রদানের কথা বর্ণিত হয়েছে। এর থেকে এ কথা বেশ বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রতিপাদন করা যায় যে তাম্রলিপ্তের চারপাশের অঞ্চলে এবং বিশেষভাবে রাঢ়দেশের (বর্তমান হুগলী, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া জেলা) বিস্তীর্ণ অরণ্যের অভ্যন্তরে এবং পার্বত্যভূমিতে বন্য হস্তীগুলি অবাধে বিচরণ করতো। অবশ্য রাঢ়দেশ বলতে প্রাচীনকালে বিভিন্ন সময়ে পূর্ব বিহারের কোন কোন অংশ এবং বর্তমান উড়িষ্যার কিছু অংশকেও বোঝাতো।

বিদেশী লেখকদের বর্ণিত গঙ্গারিডিদের সামরিক বাহিনীর অন্তর্গত হস্তীর দল ছিল গাঙ্গেয় উত্তর পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব বিহার এবং উত্তর পশ্চিম উড়িষ্যার অরণ্যচারী দুর্ধর্ষ পশু, যাদের বিচিত্র পন্থায় পোষ মানানো হতো।[২৩] কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এই হস্তিবিদ্যা সম্বন্ধে বিবরণ পাওয়া যায়।

টলেমি বলেছেন, গঙ্গার মোহনায় ছিল গঙ্গারিডিদের বাস। তিনি গঙ্গার পাঁচটি মুখের কথা উল্লেখ করেছিলেন, অবশ্যই স্বচক্ষে দেখে নয়, কারও কাছে শুনে, আগেকার বিবরণগুলি পাঠ করে এবং কিছুটা অনুমান করে। এই অনুমিত পাঁচটি মুখ টলেমি রচিত আন্তর্গাঙ্গেয় (India Intra Gangem) ভারতের মানচিত্রে অস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত, যদিও তিনি পাঁচটি মুখের এক একটি নামকরণ করেছিলেন।

কিন্তু সেই বন্দরগুলিতে সমুদ্র এবং নদীর (গঙ্গার?) সঙ্গম ঠিক কোন স্থানে ছিল তা অভ্রান্তভাবে নির্ণয় করা আজ কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। সেই সময়ে টলেমির নিজের পক্ষেও ছিল কিনা সন্দেহ! কিন্তু প্রাচীন তাম্রলিপ্তই যে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তীয় মোহনাটি ছিল, এ' কথা বৌদ্ধ জাতকগ্রন্থ, মৌর্যসম্রাট অশোকের স্তূপ প্রভৃতি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে।

এই সুপ্রসিদ্ধ বাণিজ্য-বন্দর সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"By far the most important emporium of ancient Bengal was Tamralipta, the great Buddhist harbour of the Bengal seaboard. It is referred to in the Mahavamso (chxix) as Tamlitta. and was probably meant by the author of Periplus······. The place is of great antiquity and existed prior to the days of Asoka, for it figures even in the sacred writing of the Hindus. ·····"[২৪]

টলেমি এবং 'পেরিপ্লাসে'র রচয়িতা উভয়েই তাম্রলিপ্তের নাম উল্লেখ করেছেন। প্লিনী প্রাচ্যদেশে গঙ্গার পশ্চিমকূলে তালুক্তেয়ী বলে এক জনগোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন। মেগাস্থিনিসের লেখার বিক্ষিপ্ত অংশগুলির অনুবাদক ম্যাকক্রিন্ডল কর্তৃক এদের তাম্রলিপ্তবাসী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।[২৫]

টলেমি টামালিটেসদের অবস্থিতি ভ্রান্তিবশতঃ দেখিয়েছেন পালিবোথ্রা তথা পাটলিপুত্রের নিচেই। এর অর্থ এই রকম হতে পারে যে তাম্রলিপ্ত রাজ্যটি পশ্চিমে প্রায় মগধের সীমা অবধি বিস্তার লাভ করেছিল, এবং পূর্ব সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত এবং গঙ্গার মোহনার কাছে অবস্থিত এই তাম্রলিপ্ত রাজ্যই মেগাস্থিনিসের সময় থেকে পেরিপ্লাস গ্রন্থকার এবং টলেমির সময় পর্যন্ত গঙ্গারিডি বলে অভিহিত হয়েছে।

একটা বিষয় খুবই পরিষ্কার যে গঙ্গারিডি বলতে মগধ তথা প্রাসীর পূর্বদিকে অবস্থিত এবং গঙ্গার সাগর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকাকেই বুঝিয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাতীরবর্তী এবং সুন্দরবনসহ সাগর সংলগ্ন ভূভাগই যে গঙ্গারিডি, সেটা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। আরও হয় না এই কারণে যে বিদেশী লেখক বর্ণিত কালিঙ্গেয়ী জাতির একটি গোষ্ঠী দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের সাগর-তীরের অধিবাসী ছিল।

বঙ্গদেশের বিখ্যাত কার্পাস বস্ত্র, যাকে অনেকেই মসলিন বলেছেন এবং যার কথা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে, তা এই তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকেই সিংহল হয়ে পূর্বদিকে সুবর্ণভূমি, যবদ্বীপ, চীন প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হতো। আগের সেই সিংহল থেকে অথবা পশ্চিম ভারতের ভারুকচ্ছ বা সোপারা বন্দর হয়ে আরব সাগরের মধ্য দিয়ে পশ্চিম এশিয়ার ভিতর দিয়ে স্থলপথে অথবা লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে ভূমধ্য সাগর হয়ে রোম, ক্রীট প্রভৃতি দেশে বিক্রীত হতো।[২৬]

একজন ইতিহাসবিদ তাম্রলিপ্তের বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, "তাম্রলিপ্ত হইতে জাহাজগুলি একদিকে যেমন সিংহল দ্বীপ ও ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের

বন্দরগুলিতে যাতায়াত করিত, তেমনই আবার অন্যান্য জাহাজগুলি বঙ্গোপসাগরের তীর স্পর্শ করিয়া অথবা প্রয়োজন বোধে বঙ্গোপসাগর ভেদ করিয়া সোজা অথবা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ হইয়া মালয় উপদ্বীপ ইন্দোচীন, দ্বীপময় ভারত প্রভৃতি স্থলে উপনীত হইত।"[২৭]

তাম্রলিপ্ত ছিল এক আন্তর্জাতিক বন্দর। বিদেশী বণিকেরা জাহাজে এসে এখানকার আকর্ষণীয় ও দুষ্প্রাপ্য পণ্য যথা—রেশম, কাপাসবস্ত্র, জটামাংসী, তেজপাতা, স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু, হীরকখণ্ড ও মুক্ত প্রভৃতি সংগ্রহ করে মধ্য প্রাচ্যের এবং প্রতীচ্যের বাজারে উচ্চমূল্যে বিক্রী করতো এবং প্রভূত বিত্ত অর্জন করতো।

তাম্রলিপ্তের এই গৌরবময় অস্তিত্ব দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়েছিল। "বিশাল বাঙ্গালী" গ্রন্থে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বলেছেন—'প্রায় দুই হাজার বৎসর ধরিয়া গঙ্গোপকূলবর্তী তাম্রলিপ্ত এশিয়ার সর্বপ্রধান বন্দর ছিল। বাংলার জাহাজ বঙ্গোপসাগর হইতে বাংলার শিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রী, বাংলার ধর্ম, কৃষ্টি ও বাংলার চারুশিল্পকলা সুদূর প্রাচ্যদেশ সমূহে যুগ যুগ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে।'

'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে পাওয়া যায় যে 'কোলান্দিয়া এক ধরনের জাহাজ বঙ্গোপসাগরে পাড়ি দিয়ে যেত সিংহলে, চীনে। মার্কক্রিণ্ডিলও অনুমান করেছেন, কোলান্দিয়া চীনের উপকূলে যেত।···তাম্রলিপ্ত থেকে কোলান্দিয়া নামে পণ্যতরী নিয়মিত দাক্ষিণাত্যে যেত বলেই অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করা যায় বাঙলাদেশের সঙ্গে রোমের ব্যবসা বাণিজ্য চলতো'।[২৮]

এই লেখকের বিবরণের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে 'বাংলাদেশের সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতের বন্দর দামিরিকা হয়ে সুদূর রোমেও যে পরোক্ষ বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল, তার আভাস পাওয়া যায় প্লিনী, টলেমি ও পেরিপ্লুসের গ্রন্থে।···রোমের বাজারে চাহিদা ছিল গাঙ্গেয় জটামাংসীর (Gengetic spikenard)।···'

বাঙ্গালীর সেই গৌরবময় যুগে গ্রীক ও রোমক গ্রন্থ রচয়িতা এবং লিপিকারদের কাছে এই নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকা ও সমভূমি সমন্বিত প্রাচীন ভূখণ্ডটিই গঙ্গারিডি বলে পরিচিত হয়েছিল। বঙ্গভূমির বিভিন্ন অংশে আর্য ব্রাহ্মণদের অনুপ্রবেশ মৌর্য যুগ থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা এখানকার ভিন্নতর সভ্যতা ও সংস্কৃতির বশীভূত হয়ে, আপনাদের আর্যসত্তাটি পর্যন্ত সময়ে সময়ে হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলেন। গঙ্গারিডি তথা বাঙালীরা সেই যুগে আর্যীভূত না হয়েও অনেক দিক থেকেই আগ্রাসী আর্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ ছিল।

তাদের কৃষি ছিল উন্নত, জীবনধারণের প্রণালী ছিল বৈচিত্র্যময়। তাদের ধ্যান, ধারণা, পূজাপদ্ধতি, আচার, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল তাদের মানসিক উৎকর্ষ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মার্জিত রুচি এবং ব্যবহারের শালীনতা। তদানীন্তন বৈদিক আর্যদের থেকে, বাঙ্গালী ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরনের।[২৯]

বাঙ্গালী ছিল সম্পদশালী এবং গঙ্গারিডি দেশ ও জাতি অনেক কারণেই বিদেশীদের মনে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়েছিল। না হলে মেগাস্থিনিস এবং পরবর্তী

বৈদেশিক লেখকেরা তাদের লিখিত বিবরণে বিশেষভাবে গঙ্গারিড়ি, প্রাসী এবং তার সঙ্গে কালিঙ্গেয়ীদের নাম বার বার উল্লেখ করতেন না। এদের বাহুবল ও সম্পদ দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার এবং তাঁর অপরাজেয় সৈন্যবাহিনীর মনে যে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল, তা শুধু গঙ্গারিড়ি প্রভৃতি প্রাচ্য দেশ ও জাতিসমূহের শৌর্য, বীর্য, এবং ঐশ্বর্যের পরিচায়ক। তাম্রলিপ্তির সমৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি গঙ্গারিড়ির সমৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠা, এবং খ্যাতির সমার্থক বললে অত্যুক্তি হবে না।

সরস্বতী প্রবাহের জলের অভাব হওয়ায়, তাম্রলিপ্ত বন্দরের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছিল, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে। তাম্রলিপ্তের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর সামুদ্রিক কর্মকাণ্ডের সমাপ্তি সূচিত হয়। এই বিখ্যাত ব্যবসায় ও বাণিজ্যকেন্দ্র হারিয়ে বাঙ্গালীর বহুমুখী প্রতিভা ও কার্যকলাপ স্তিমিত হয়ে এসেছিল। বিশাল সমুদ্রে বাঙ্গালী সওদাগরের নৌবহর আর দেখা গেল না। জাভা, বালি, সিংহলের সমুদ্র পথে বাঙালী সওদাগরের পণ্যবাহী জাহাজ প্রায় বিরল দৃশ্যে পরিণত হলো। বাঙ্গালীর ক্রিয়াশীলতা এই সময় থেকে অন্তর্মুখীন হয়েছে এবং ক্রমশঃ বাঙালী এক কৃষিজীবি জাতিতে পরিণত হয়েছে।

পরে অবশ্য মনসামঙ্গল (বিপ্রদাস) এবং কবি কঙ্কনের 'চণ্ডীতে' বাঙ্গালী পণ্যসম্ভারে সওদাগরকে পরিপূর্ণ সামুদ্রিক যানে সাগর পাড়ি দিতে দেখা গেলেও এবং সপ্তগ্রাম, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বন্দর বাঙালীর বাণিজ্যের প্রবণতা এবং সাগরমুখিতা প্রতিষ্ঠা করলেও, প্রাচীন যুগের সেই দীপ্তিময় ও প্রাণচঞ্চল সমুদ্রবাণিজ্যের ব্যাপক পুনরাবৃত্তি আর হয় নি।

নির্দেশিকা

১। বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস —যুধিষ্ঠির জানা।
২। মেদিনীপুরের ইতিহাস (ঐতিহাসিক বিবরণ) —যোগেশচন্দ্র বসু।
৩। মেদিনীপুরের ইতিহাস (ঐতিহাসিক বিবরণ) —যোগেশচন্দ্র বসু।
৪। বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস —যুধিষ্ঠির জানা।
৫। গৌড় কাহিনী (ঐতিহাসিক যুগের উন্মেষ) —শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ।
৬। খারবেলের হাতিগুম্ফা শিলালিপি অনুযায়ী।
৭। মেদিনীপুরের ইতিহাস (ভৌমিক বিবরণ) —যোগেশচন্দ্র বসু।
৮। বঙ্গসংস্কৃতির কথা (মেদিনীপুর) —প্রসিত রায়চৌধুরী।
৯। The Early History of Bengal —F. J. Monahan.
১০। Ibid.
১১। খরবেলের হাতিগুম্ফা শিলালিপি
১২। হিউ-এন-সাঙের দেখা ভারত (সংকলক)—প্রেমময় দাশগুপ্ত।
'রাজ্যটি আকারে ১৪০০ থেকে ১৫০০ লি মতো। রাজধানীর আয়তন দশ লি খানেক। এ রাজ্যটিও সাগরের কূলে। ভূমি নীচু ও সরস।

নিয়মিতভাবে চাষবাসের কাজ হয়। দেদার ফুল ও ফলের ছড়াছড়ি। আবহাওয়া গরম ধাঁচের। লোকজনেরা চটপটে ও ব্যস্তবাগীশ। বেশ পরিশ্রমী ও সাহসী। সত্যধর্মানুরাগী ও অন্যধর্মী—দুইই আছে। শহরের কাছ ঘেঁষে অশোক রাজার একটি স্তূপ রয়েছে।'

[১৫০০ লি মানে প্রায় ১৫ ক্রোশ]

১৩। তমলুকের ইতিহাস (পৃঃ ৮) —সেবানন্দ সরস্বতী।
১৪। বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস —যুধিষ্ঠির জানা।
১৫। মেদিনীপুর —তরুণদেব ভট্টাচার্য।
১৬। পৃথিবীর ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১৬০) —দুর্গাদাস লাহিড়ী।
১৭। বাণিজ্যে বাঙ্গালী—একাল ও সেকাল —সুভাষ সমাজদার।
১৮। মেদিনীপুরের ইতিহাস (ঐতিহাসিক বিবরণ) —যোগেশচন্দ্র বসু।
১৯। বাঙ্গালীর জাতিতত্ত্ব ও কৃষিজীবি সম্প্রদায় —ডঃ সুহৃদকুমার ভৌমিক।
২০। বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস —যুধিষ্ঠির জানা।
২১। বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাস —নগেন্দ্রনাথ বসু।
২২। বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস —যুধিষ্ঠির জানা।
২৩। আনন্দবাজার পত্রিকা ৭ই আগষ্ট, ১৯৮৪—"পাঁচ হাজার বছরের পুরানো হাতির মাথা পাওয়া গেল হুগলীতে। প্রায় ফসিল হয়ে যাওয়া এই খুলি দেখে ভূবিজ্ঞানীরা মনে করেছেন, এটি 'এলিফাস ম্যাক্সিমাস'।—পশ্চিমবঙ্গে এ জাতের প্রাচীন হাতির চিহ্ন আগে মেলেনি। আজকালকার হাতির এটি পূর্বপুরুষ। সোমবার কলকাতার যাদুঘরের পক্ষ থেকে একটি বিশেষজ্ঞ দল হুগলী জেলার মেরিয়া গ্রামে গিয়ে প্রায় এক কুইণ্টাল ওজনের এই হাতির মাথার অংশ নিয়ে এসেছেন।…"
২৪। Indian Shipping —Dr. Radha Kumud Mukherjee.
২৫। Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian —J. W. McCrindle P. P. 140.—"The Taluctae are the people of the kingdom of Tamralipta mentioned in the Mahabharata……corresponding to the Tamluk of the present day".
২৬। বিশাল বাঙ্গালী —রাধাকমল মুখোপাধ্যায়।
২৭। হিন্দুযুগে দ্বীপময় ভারতের সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক পটভূমিকা। হিমাংশুভূষণ সরকার।
২৮। বাণিজ্যে বাঙালী—একাল ও সেকাল —সুভাষ সমাজদার।
২৯। বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী —রাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

গঙ্গারিডি বিবেচনায় নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় সিন্ধু সভ্যতার প্রভাব বিশ্লেষণ

এই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এবং তার সঙ্গে সুহ্ম, পুণ্ড্র, প্রাগজ্যোতিষ সমন্বিত বিশাল প্রাচ্যভূমিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অনেক পরে। বঙ্গদেশ এবং তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, যা সুহ্ম, রাঢ়, গৌড় প্রভৃতি নামে যুগে যুগে অভিহিত হয়েছে, সকলের শেষে আর্য ধর্ম গ্রহণ করেছিল, সংস্কৃত ভাষা এবং তার লৌকিক সংস্করণের বিজয় অভিযানের ফল হিসেবে।

'পুরাতত্ত্ববিদগণ বলেন, বৈদিক যুগে বাংলা দেশে আর্য জাতির বসতি ছিল না। বেদের সংহিতাভাগে বঙ্গাদি দেশের নাম নাই। অথর্ববেদে মগধের বগধ এবং ঋক সংহিতায় কীটক নাম আছে। ইহা বুঝা যায় বৈদিক কালের পরে অঙ্গাদি দেশে আর্য জাতির বসতি হয়। অঙ্গদেশ হইতে আর্য সভ্যতা পুণ্ড্র, বঙ্গ, সুহ্মাদি দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল।'[১]

চাতুর্বর্ণ্যবিশিষ্ট আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বহুলভাবে জনসাধারণ কর্তৃক স্বেচ্ছায় গৃহীত হবার আগে, বঙ্গদেশে চাতুর্বর্ণ্য সমাজ-বিন্যাস অনুপস্থিত। 'প্রথম ছিল কৌম-গোষ্ঠিক সমাজ। তারপর যে সমাজের উদ্ভব হয়েছিল, তাতে জাতিভেদ ছিল না, ছিল পদাধিকার বৃত্তিভেদ।'[২]

দ্রাবিড় গোষ্ঠী ও তার পূর্ববর্তী কোল গোষ্ঠীর সমন্বিত রূপই ছিল সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতাকে আত্মসাৎ করে ব্রাহ্মণশাসিত আর্য সমাজ ধীরে ধীরে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পরবর্তীকালে এই মিশ্রিত সভ্যতা থেকে উদ্ভূত আর্যেরা দ্রাবিড়দের রাক্ষস ও অস্ট্রিকদের অসুর বলে অভিহিত করতো। দক্ষিণ-ভারত দ্রাবিড়দের দ্বারা এবং পূর্বভারত অস্ট্রিকদের দ্বারা অধ্যুষিত। সেই সূত্রে জরাসন্ধ, কংস, কংসের ভাগ্নে শ্রীকৃষ্ণ সকলেই অস্ট্রিক বা কোল গোষ্ঠীর বা অসুর গোষ্ঠীর। তাম্রলিপ্ত সভ্যতায় আমরা অবশ্য দ্রাবিড় সংস্কৃতির উপস্থিতি লক্ষ্য করি এবং বাঙ্গালীর নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, যুগপৎ আদি-অস্ত্রাল ও দ্রাবিড় উপাদানের চিহ্ন পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, বাঙ্গালীর জাতিগত ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্যে এই দুই উপাদানের প্রাধান্যই সমধিক।[৩]

হরপ্পা, মহেন-জো-দারোর[৪] অনেক আগে থেকেই বঙ্গদেশে মানুষ বাস করতো এবং তারা প্রত্নপলীয় যুগের কৃষ্টির ধারক ছিল বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে। মেদিনীপুর জেলার রামগড়ের অদূরবর্তী সিজুয়ায় এক মানব চোয়ালের অশ্মীভূত অংশ পাওয়া গিয়েছে। প্রত্নপলীয় যুগ ও নবপলীয় যুগের মধ্যবর্তী যুগের কৃষ্টিকে nasolithic culture বলে অভিহিত করা হয়। বর্ধমান জেলার বীরভনপুর থেকে মেসোলিথিক কৃষ্টির প্রচুর নিদর্শন স্বাধীনোত্তর যুগে কেন্দ্রীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ আবিষ্কার করেছেন।

এর পরে নবপলীয় যুগেই কৃষি, পশুপালন, বয়ন, মৃৎপাত্র নির্মাণ এবং স্থায়ী আবাস পরিকল্পনা প্রভৃতি প্রবর্তিত হয়েছিল। এক ক্রমিক বিবর্তনের ধারায় মানুষ নতুন নতুন আবিষ্কারের সাহায্যে ধাপে ধাপে জীবন যাত্রায় বিবিধ উন্নত সোপানগুলি অতিক্রম করে এক উচ্চতর সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছিল। নবপলীয় যুগের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অস্ত্র, মসৃণ পরশু দার্জিলিং জেলার কালিম্পঙ প্রভৃতি স্থানে পাওয়া গেছে।[৫]

নবপলীয় যুগে গ্রামীণ সভ্যতার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল, তা আমরা লক্ষ্য করি। এর স্বাভাবিক পরিণতিতে কৌমভিত্তিক সমাজে স্থায়ী বাসভূমি, জমি প্রভৃতি ভূসম্পত্তি উদ্ভব হওয়ায় এবং রাজন্যবৃত্তির সৃষ্টি হওয়ায়, মানুষ নগর নির্মাণের উপযোগিতা অনুভব করে। ক্রমে এই অনুভূতি চিন্তায় রূপান্তরিত হয়ে পরে এক প্রবণতায় পরিণত হয়। এইবার বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে ধাতুগত ব্যবহারের পার্থক্য সূচিত হয়।

নবপলীয় যুগের পরে কালের বিবর্তনে মানুষ তামার ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং তাম্রাশ্ম যুগের অভ্যুদয়ের মধ্যে সভ্যতার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়। বৃহত্তর বঙ্গের সিংভূমে ছিল তাম্রের সর্ববৃহৎ উৎসস্থল, এবং বঙ্গদেশের বণিকেরা প্রাচীন যুগে অন্যান্য প্রকৃতি ও শিল্পজাত দ্রব্য সম্ভারের সঙ্গে দেশজ তাম্রও দূর দেশে রপ্তানি করতে অভ্যস্ত ছিল। যেহেতু তাম্রের বৃহত্তম ভাণ্ডার বঙ্গদেশেই ছিল, এর থেকে অনুমান করা যায় যে সভ্যতার বিবর্তনে তাম্রাশ্ম যুগের নগর সভ্যতার অভ্যুদয় এই মেদিনীপুর অঞ্চলেই সংঘটিত হয়েছিল। (বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন —ডঃ অতুল সুর)।

মেদিনীপুরের লোকেদের সামুদ্রিক পারদর্শিতা প্রমাণিত হয়েছে পান্না গ্রামে এক পুষ্করিণী খননের সময়ে ৪৫ ফুট গভীর তল থেকে পাওয়া সমুদ্রগামী এক নৌকার কঙ্কাল বিশেষ থেকে (বাংলার সামাজিক ইতিহাস—ডঃ অতুল সুর)। তিনি মনে করেন যে তাম্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ বঙ্গদেশেই হয়েছিল।

নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় এবং গঙ্গার দুই উপকূলেই এবং আসামেও তন্ত্রবিশ্বাস ও সাধনার আধিক্য দেখা যায়। সমগ্র বাঙ্গালী জাতিই মাতৃপূজো তথা শক্তি আরাধনায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ। এই ভাবুক মানসিকতার একটি গূঢ় কারণ নিশ্চয়ই আছে। আর্যদের সঙ্গে প্রাচ্য ভারতের, বিশেষ করে বঙ্গদেশের, কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক বৈসাদৃশ্য এবং তার জন্য সংঘর্ষের অন্যতম কারণ ছিল বাঙ্গালীর শক্তিসাধনার প্রতি হৃদয়গত আকর্ষণ।

অনেকেই তন্ত্র সাধনাকে বেদমূলো বলেন। কেউ কেউ মনে করেন, সাধারণ লোকেদের মন জয় করার পদ্ধতি হিসেবে বৌদ্ধরা তন্ত্রসাহিত্যের উদ্ভাবন করেছিল। এই কথা স্বীকার করতে হলে কিন্তু এটাও নির্ধারণ করা প্রয়োজন হয় যে বঙ্গদেশে এবং বিশেষভাবে গঙ্গারিডি অধ্যুষিত গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ সেই সময়ে প্রচলিত বিশ্বাস কি ছিল এবং সেই বিশ্বাস কেমনভাবেই বা সৃষ্ট হয়েছিল।

মহেন-জো দারো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত মৃন্ময়ী স্ত্রীমূর্তিগুলি প্রমাণ করে যে শক্তিসাধনা বৈদিক যুগের অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষে প্রচলিত। সিন্ধু সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে আবিষ্কৃত এই মৃন্ময়ী মূর্তির অন্তরালে মাতৃকা পূজার সম্ভাবনা সম্বন্ধে এক প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকের মন্তব্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

'পশ্চিম এশিয়ার মতো এই দেশের সামাজিক জীবনে মাতৃজাতির প্রাধান্যের সময়ে এই মাতৃকা পূজার সূত্রপাত হয় এবং এতদ্দেশীয় অনার্যদের জাতীয় দেবতা-মণ্ডলীর মধ্যে এই পূজার অক্ষুণ্ণ প্রভাব ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।··· শাক্তধর্ম মাতৃকা পূজার (Cult of mother Goddess) অঙ্গীভূত। শাক্তধর্মের কোন পৃথক অস্তিত্বের সাক্ষাৎ প্রমাণ মোহেন-জো-দড়ো কিম্বা হরপ্পাতে অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ইহা ভারতের প্রাচীনতম ধর্মসমূহের অন্যতম। শক্তিপূজা শৈবধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবাপন্ন।

···লিঙ্গপূজা যে সিন্ধু উপত্যকায় বিশেষভাবে প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ইহা অনার্য এবং প্রাগ-আর্য সভ্যতার নিজস্ব মৌলিক বস্তু বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করেন। ঋগ্বেদে শিশ্নদের প্রতি যথেষ্ট ভৎসনা বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতেই বুঝা যায়, ইহা অবৈদিক ধর্ম।'[৬]

পরবর্তীকালে বঙ্গদেশসহ ভারতবর্ষের অন্যান্য কয়েক স্থানে এই সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন অল্প বিস্তর পরিলক্ষিত হয়েছে। অনেকেরই এই অনুমান যে শক্তিতত্ত্ব ও শাক্তাচার আদৌ অপ্রাচীন নয় এবং বেদের ভগবতী সূত্রগুলি প্রমাণ করে যে তান্ত্রিকতার স্বাক্ষর বৈদিক সাহিত্যেও ছিল। কিন্তু মাতৃ অথবা শক্তিতন্ত্রের প্রভাব বঙ্গদেশের মতো কুত্রাপি এত বিপুলভাবে অনুভূত হয় নি। সুতরাং এগুলি বাঙ্গালী কোন বিশেষ সুপ্রাচীন সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেই পেয়েছিল।

'বাঙ্গালীরা আজও সিন্ধু সভ্যতাকে আঁকড়ে ধরে আছে'। বলেছেন ডঃ অতুল সুর, তাঁর "বাঙলার সামাজিক ইতিহাস" গ্রন্থে। ডঃ সুরের মতে বাঙ্গালীই তার মাতৃপূজার ঐতিহ্যকে (যা সিন্ধু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য) সুমের, মেসোপটেমিয়া, ক্রীট প্রভৃতি স্থানে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। বাংলার ও সুমেরের মাতৃদেবীর কল্পনার মধ্যে আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, যথা, উভয় দেশেই মাতৃদেবীর বাহন সিংহ এবং তাঁর ভর্তার বাহন বৃষ। ভারতের মতোই সুমেরের মাতৃদেবীকে 'পর্বতের দেবী' বলা হয়েছে।

মহেন-জো-দারো এবং হরপ্পা নগরী বিধ্বস্ত হলে, সেখানকার অধিবাসীরা, যাদের সাধারণভাবে দ্রাবিড় বলেই মনে করা হয় এবং যারা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে হয়তো জলপথেই এসেছিল, ভারতের নানা প্রান্তে বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। আর্যাবর্তের উত্তর পশ্চিমাংশ এবং মধ্যভাগ (মধ্যদেশ ?) ইতিমধ্যে আর্যদের অধিকারভুক্ত হওয়ায়, এই বিজিত এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জর্জরিত নরগোষ্ঠী গুজরাট, মহারাষ্ট্র, দক্ষিণ-ভারত, বঙ্গদেশ প্রভৃতিতে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করেছিল।

এই স্থানান্তরে বসবাসের জন্য স্বদেশ পরিত্যাগের সময়ে তারা ছিল উন্নত মানের

জীবন ধারণে অভ্যস্ত এবং নগর সভ্যতার পথিকৃৎ। নতুন উপনিবেশে তারা নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে যত্নবান হয়েছিল, এবং অনেক বিষয়েই নিজেদের উৎকর্ষতার জন্য স্থানীয় লোকেদের এই সব বৈচিত্র্যময় ধর্ম, আচার, ব্যবহার, শিল্প প্রভৃতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। এই উদার এবং সমুন্নত সাংস্কৃতিক ভাবধারার সংস্পর্শে এসে বাঙ্গালীর ধর্মে, কর্মে, চিন্তায় একটা ভাবপ্রবণতার এবং একটা উচ্চমন্যতার মানসিকতা জন্ম গ্রহণ করেছিল।

সিন্ধু সভ্যতায় লৌহের ব্যবহার অজ্ঞাত থাকায় এবং অশ্বের কোন চিহ্ন না থাকায়, অনুমান করা হয়েছে যে ঋগ্বেদে পুরন্দরের (ইন্দ্র) অসভ্য ও বর্বরদের উপর বিজয় লাভ এবং তাদের দুর্গ ধ্বংস করার কাহিনী বৈদিক আর্যদের স্থানীয় অধিবাসীদের উপর জয়লাভেরই প্রতীক। আর্যেরা লৌহাস্ত্র এবং অশ্ব এই দুইয়ের ব্যবহারেই পারদর্শী ছিল।

আর্য জগতের বহির্ভূত বঙ্গদেশে এবং বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গে সুদূর অতীত থেকেই লৌহের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল। বীরভূম, বর্ধমান, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলায় খনিজ লৌহপিণ্ড থেকে লৌহ নিষ্কাশনের দেশীয় প্রণালীতে উৎপাদন সম্পন্ন হতো এবং নানা প্রকার যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মিত হতো।[৭] এখানেও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের সুসভ্য জনগোষ্ঠীর উন্নত মানের জীবনধারাই প্রমাণিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও স্মরণযোগ্য যে রাঁচী, সিংভুম, পালামৌ প্রভৃতি বৃহৎ বঙ্গের অসুর সম্প্রদায়ের বর্তমান কালেও মূল জীবিকা লৌহ আকর থেকে লোহা প্রস্তুত করা।

সিন্ধু উপত্যকার মহেন-জো-দারো এবং হরপ্পায় যে মিশ্র জাতির বাস ছিল, তার মধ্যে প্রোটো অস্ট্রেলিয়ড়, ভূমধ্যসাগরীয়, মঙ্গোলীয় এবং এলপীয়রাই প্রধান। এরাই সকলে গুজরাটী, মারাঠী এবং বাঙ্গালীদের পূর্বপুরুষ। কেউ কেউ বলেছেন যে সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা হয় দ্রাবিড় জাতি, নয় দ্রাবিড়দের সদৃশ কোন জাতি। এই সিন্ধু সভ্যতাই আমাদের বঙ্গদেশে এবং বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পাণ্ডুরাজার ঢিবির একটি স্তরে এই দ্রাবিড় সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। পাণ্ডুরাজার ঢিবির সন্নিহিত কুনুর, কোপাই, বক্রেশ্বর নদীর উপত্যকা, এবং দক্ষিণ-বাংলার হরিনারায়ণপুর, চন্দ্রকেতুগড় প্রভৃতি স্থানগুলিতে তাম্রাশ্মীয় (Chalcolithic) যুগের অর্থাৎ সিন্ধুসভ্যতার যুগের প্রত্নতত্ত্বসমূহ বিপুলভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করেই সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছিলেন যে এতদিন আর্য উপনিবেশ স্থাপনকেই বঙ্গদেশে উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সূচনা মনে করা হতো, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ষাট দশকের প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে এটা সুপ্রমাণিত হয়েছে যে আর্যদের আধিপত্যের অনেক আগে থেকেই বঙ্গদেশের কয়েক স্থানে খৃঃ পূঃ দু হাজার বৎসরের ন্যায় সুদূর অতীতেও উন্নতর সভ্যতার অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া গেছে।[৮] এখানেও স্পষ্টতঃই গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের কথাই বলা হয়েছে।

আগেই পশ্চিমবঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার দ্রাবিড় প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। পরবর্তী কালে পশ্চিমবঙ্গসহ সমগ্র বঙ্গদেশে এই দ্রাবিড় কৃষ্টির উপর আর্যদের প্রভাব পড়েছিল এবং এই কৃষ্টির পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। যাই হোক, বঙ্গদেশে আদিবাসীদের মধ্যে দ্রাবিড়রা ছিল বিশেষ উন্নত এবং এই দ্রাবিড়রা সিন্ধু সভ্যতার এই সংস্কৃতিকে এই দেশে বহন করে এনেছিল এবং স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করেছিল। তাম্রলিপ্ত যে ঐতিহাসিক যুগের সূচনায় দ্রাবিড়দের একটি কেন্দ্র ছিল, তা আগেই বলা হয়েছে।

বাণেশ্বর ডাঙ্গায় (বর্ধমান খনন কার্যের ফলে) যে সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, অনুমান করা যায় যে তার বয়স ৩৫০০ বৎসর। মিশর, ক্রীট, মেসোপটেমিয়ার সদৃশ মৃৎপাত্রই এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। সুতরাং অজয় নদীর অববাহিকায় এই সভ্যতা যে হরপ্পা ও মহেন-জো-দারোর সমকালীন, তা অত্যন্ত স্পষ্ট।[৯] বাঙ্গালীর এই প্রাক আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি বাঙ্গালীকে এক ঐশ্বর্যশালী ঐতিহ্যের অধিকারী করেছে।

বাঙ্গালী সম্পূর্ণভাবে আর্যরক্তসম্ভূত নয়। বাঙ্গালী এক মিশ্র ও বর্ণসংকর জাতি, যারা অবশ্য কোন অংশেই উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় বিশুদ্ধ আর্যদের অপেক্ষা শিক্ষায়, দীক্ষায়, জ্ঞানে কম গৌরবান্বিত নয়। এই সম্পর্কে একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন—"আনুমানিক ৩২০০ ৩৫০০ বর্ষের অতীতের জনশ্রুতি 'পাণ্ডুরাজার ঢিবি' (এবং বাণেশ্বর ডাঙ্গার) নগর সভ্যতার গৌরবকাহিনীমণ্ডিত সমাজ কোন আর্যসম্ভূত সমাজ নহে; পাণ্ডুরাজার ঢিবি কোন আর্যসভ্যতার নিদর্শন নহে। বাঙ্গালী অমৃতস্য পুত্র নহে, আর্যতুর্কীর বংশধর নহে।"[১০]

বাঙ্গালীর মাতৃপূজা ও তন্ত্র সাধনার প্রবলতা এই দ্রাবিড় সিন্ধুসভ্যতা থেকেই উদ্ভূত। বঙ্গদেশে এই প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে পরবর্তীকালে সমন্বিত হয়েছিল বৌদ্ধ ধর্মভাব, কিন্তু তথাপি রাঢ়দেশে তথা পশ্চিমবঙ্গের মূল সাংস্কৃতিক রূপ বৌদ্ধধর্মের সুদীর্ঘ প্লাবনেও নিশ্চিহ্ন হয় নি। বরং রাঢ়ের সংস্কৃতির সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে মিশ্রিত হয়ে এবং এই সংস্কৃতিকে প্রচুর পরিমাণে আত্মসাৎ করে বৌদ্ধধর্ম তদানীন্তন জনমনের স্বাধীন চেতনার নিবটবর্তী হয়ে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। বৌদ্ধ প্রভাব স্তিমিত হলে যে শক্তিবাদ ও তান্ত্রিকতা আত্মপ্রকাশ করেছিল, বিশেষভাবে এই পশ্চিমবঙ্গে, তা কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার প্রাক-আর্য সংস্কৃতির সম্প্রসারণেরই প্রত্যক্ষ ফল।[১১] পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যবাদ তথা হিন্দু ধর্মকে এই শক্তিবাদ এবং তান্ত্রিকতার সঙ্গে সন্ধি করতে হয়েছিল।

শুধু শিব-পশুপতির প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় এবং মাতৃসাধনার গভীরতায় ও তন্ত্রসাধনার কঠোরতায় বলেই নয়, নানারূপ কলা, শিল্প, মৃৎশিল্প (মাটির কলসী, জালা, স্থালী, বাটী, ঘট, কমণ্ডলু, তেলের কুপি), স্থাপত্য (মরুজাতীয় গৃহ, শিবমন্দির, গৃহের ইষ্টক নির্মিত প্রাচীর), ধাতুশিল্প (তামার হাঁড়ি, কলসী—দেবপূজায় ব্যবহৃত), বয়নশিল্প প্রভৃতির উৎকর্ষ প্রকাশেও বঙ্গদেশে এই সিন্ধুসভ্যতার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছিল।[১২]

বয়নশিল্পের কথা বিশদভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, 'সিন্ধু নগরীর নারীদের ন্যায় বঙ্গনারীগণও বস্ত্রবয়নের জন্য তুলা হইতে সূতা কাটিতেন—পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেক বাড়ীর সঙ্গে একটি করিয়া তুলার ক্ষেত থাকিত'।

মূর্তিশিল্পের প্রবহমানতার প্রসঙ্গে বলা যায় যে, 'বঙ্গদেশের মূর্তির সহিত যে চালচিত্র থাকে তাহাও মহেন জো-দারোর চালচিত্রের অবিকল নকল। বঙ্গে সিন্ধু নগরীর ন্যায় মৃন্ময় ও ধাতুময় দুই প্রকার মূর্তিরই ব্যবহার আছে। অস্ত্রশিল্পের দিক থেকে দেখা যায় যে সিন্ধু নগরীর ন্যায় বঙ্গদেশের অস্ত্র-শিল্পীরাও তীর, ধনু, বল্লম, তূণ, ও ঢাল প্রস্তুত করেন'।[১৩]

সিন্ধুসভ্যতায় মূর্তিপূজার (পশুপতি ও মাতৃপূজাসহ) অস্তিত্ব ও প্রচলন সংশয়াতীত ভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। এই প্রভাব সিন্ধুসভ্যতার পতনের পরে অন্যত্র সংক্রামিত হয়েছে। বঙ্গদেশে এই সব পূজার প্রবর্তন বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। উদাহরণ-স্বরূপ, মূর্তিপূজা এবং মাতৃ উপাসনা বঙ্গদেশে যত প্রচলিত, ভারতবর্ষের আর কোন অংশে তেমন নয়।

"এখানে যজ্ঞের প্রাধান্য নয়। এখানে বৈদিক অগ্নির স্থান অধিকার করিয়া আছেন মা কালী, শিব ও বিষ্ণু।......বেদের দেবগণ উপাসনা হইতে দূরে থাকেন। কিন্তু বঙ্গে কি শিব, কি কালী, কি বিষ্ণু সকল দেবতাই ভক্তের আপনজন, তাহার নিকট আত্মীয়। তাহার পিতা, মাতা, বন্ধু, ভাই, পুত্র কন্যা ইত্যাদিরূপের যে কোন একটি ধারণ করিয়া তাঁহারা ভক্তের সেবা গ্রহণ করেন।"[১৪]

এ যেন রবীন্দ্রনাথের "বৈষ্ণব কবিতার" সেই অবিস্মরণীয় পঙক্তিটি মনে করিয়ে দেয়ঃ—

"দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।" (বৈষ্ণব কবিতা—সোনার তরী)

সিন্ধু সভ্যতায় পরিলক্ষিত বৈদিক ও অবৈদিক মতের সমন্বয় থেকে অনুমান করা যায় যে মহেন-জো-দারো নগরীর অধিবাসীরা আধুনিক তান্ত্রিকদের পূর্বসূরী। অবশ্য, এ কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শে এসেই শেষ পর্যন্ত শাক্ত-তন্ত্র একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহণ করেছিল, এবং সিন্ধু সভ্যতার বিলুপ্তির বহু শতাব্দী পরে এই অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল।

তন্ত্রের উৎপত্তিস্থল গৌড়-বঙ্গভূমি। 'গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা'। মাতৃভাব বাঙ্গালীর মজ্জাগত, তাই বাঙ্গালীকে মা-পাগল জাত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাচীনতম তন্ত্রের অনেকগুলি গ্রন্থ এই বঙ্গদেশেই আবিষ্কৃত হয়েছে। শক্তিপীঠগুলি গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গেই কেন্দ্রীভূত, যদিও বঙ্গদেশের অন্যান্য অঞ্চলে এবং পাশের দেশেও অনেকগুলি পীঠ বিদ্যমান। এ সবেরই বীজ সিন্ধু সভ্যতার মধ্যেই উপ্ত হয়েছিল, সন্দেহ নেই।

সিন্ধু উপত্যকা থেকে তৎকালীন আর্য উপনিবেশের বহির্দেশে এসে এক প্রাচীন জনগোষ্ঠী বঙ্গদেশে বসতি স্থাপন করেছিল। সেই কারণেই বাঙ্গালীর দেশে বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রচলিত হয় নি। বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসীরা তাদের জন্মভূমি সিন্ধু উপত্যকা

থেকে আনীত একটি শিথিল-গ্রন্থী সমাজের বন্ধন মেনে চলতো। সিন্ধু উপত্যকার গোষ্ঠী-প্রাধান্য এখনও পর্যন্ত বঙ্গদেশে বর্তমান। এই স্বাধীন গোষ্ঠীসমূহই পরবর্তী কালে মধ্যদেশীয় আর্য পুরোহিতদের লিখিত স্মৃতিগ্রন্থে মিশ্র ও হীন জাতিতে পরিণত হয়ে অসম্মান ও অশ্রদ্ধার পাত্র হয়েছে।

এই সব সত্ত্বেও বঙ্গদেশের প্রাচীন সমাজের গোষ্ঠী-প্রাধান্য খর্ব করা যায় নি। বাঙ্গালীর সমাজে সাধারণতঃ বিবাহ এখনও একটি জাতি বা গোষ্ঠীর ভিতরই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এইটি সিন্ধু সভ্যতার শিথিলবন্ধ সমাজব্যবস্থার অবশিষ্ট মাত্র।[১৫]

নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় ও অববাহিকায় সিন্ধুসভ্যতার স্বাক্ষর ও প্রতিপত্তি অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা, এমন কি গুজরাট ও মহারাষ্ট্র সমন্বিত ভারতের পশ্চিম অঞ্চল অপেক্ষাও অনেক বেশী। সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছায়া এখনও বাঙ্গালীর এবং বিশেষভাবে হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে আচ্ছন্ন করে আছে। ডঃ অতুল সুর প্রমুখ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে বাঙ্গালীরাই এখান থেকে পশ্চিম এশিয়া প্রভৃতি স্থানে গিয়ে সিন্ধু সভ্যতার পত্তন করেন (বাঙলা ও বাঙ্গালী —ডঃ অতুল সুর)।

সিন্ধু উপত্যকায় পরিলক্ষিত যুগপৎ অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবই উক্ত ঐতিহাসিকদের এই ধারণায় উদ্বুদ্ধ করেছিল, সন্দেহ নেই। সেই পণ্ডিতদের অভিমতে এই বাঙ্গালীরাই মধ্য এশিয়া, ভূমধ্যসাগর প্রভৃতি সুদূর অঞ্চলে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গিয়ে উপনিবেশিত হয়েছিল, এবং নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার করেছিল।[১৬]

অসুর পূজক ইন্দো-ইরাণীরা ভারতবর্ষ থেকে ইরাণে গিয়েছিল না ইরাণ থেকে ভারতে এসেছিল, এই প্রশ্নটি অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক, এবং এই বিষয়ে যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। এই বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। গঙ্গারিডিদের বাণিজ্যের খ্যাতি যেমন বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে পাওয়া যায়, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ এবং সাহিত্য থেকে পাওয়া যায়, তেমনই তাদের যুদ্ধের খ্যাতিও কয়েকটি বিদেশী গ্রন্থে পাওয়া যায়।

কোন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদ বাঙ্গালীর সুদূর অতীতের শৌর্যবীর্য ও কৃতিত্বের কাহিনী ও ঘটনাকে অলীক এবং অকিঞ্চিৎকর বলে গণনা করেছেন।[১৭] কিন্তু বাঙ্গালীর গৌরবের এই কাহিনীগুলি নিতান্তই অগ্রাহ্য করা যায় না।

পারস্য সম্রাট জ্যারেক্সিসের (xerxes) আন্তর্জাতিক ভাড়াটিয়া সৈন্য-সমাবেশে তার ভারত সাম্রাজ্যে সংগৃহীত সৈন্যদলের মধ্যে দুর্ধর্ষ গঙ্গারিডি জাতির যোদ্ধা থাকা অসম্ভব ছিল না।

ভেলেরিয়াস ফ্লাকাশ তাঁর 'আরগণটিকা' পুস্তকে লিখে গেছেন যে গঙ্গারিডির বাঙ্গালী বীরেরা কৃষ্ণসাগরের উপকূলে ১৫৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দে (ঋগ্বেদ রচয়িতা নর্ডিক আর্যদের পঞ্চনদে এসে উপস্থিত হবার সমসাময়িক কালে) কলচিয়ান ও জেসনের অনুগামীদের সঙ্গে বিশেষ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।

গঙ্গারিডিদের শৌর্য্য ও বীর্য্যের কিংবদন্তীমূলক এই কাহিনীর মধ্যে বিদেশী লেখক যে সম্পূর্ণ অসত্য এবং অলীক বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন, এমন মনে করার কোন কারণ নেই। পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে মহাভারত যুগে অথবা তার আগেও এদেশে বলবীর্যসম্পন্ন নরগোষ্ঠী বাস করেছে।

আগে আমরা বাঙ্গালীদের বহির্ভারতীয় প্রাচীন উপনিবেশগুলির উল্লেখ করেছি। এই প্রসঙ্গে এই মন্তব্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে 'এ সকল বাঙ্গালীদের সেখানে উপনিবেশ ছিল। এখানে তারা শিবের আরাধনা এবং কালীর পূজা করতো।'[১৮] বাঙ্গালীর, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের আর্যপূর্ব উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচায়ক এই শক্তিতন্ত্রের অস্তিত্ব।

মহেন জো-দারোয় যে হাতির প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে, তার থেকে এ কথা স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে প্রাচ্য ভারত তথা বাঙ্গালীর সঙ্গে এই হাতির সম্পর্ক আছে। পালিত পশু হিসেবে হাতির আদিম নিবাস এই বঙ্গদেশেই। গঙ্গারিডিদের বিশাল হস্তীসৈন্যের বিশ্বাসযোগ্য বিবরণই এই সম্পর্কের অনুমানের ভিত্তি। 'এখানে উল্লেখযোগ্য যে মোহেন জো-দাড়োর ঐ হাতির প্রতিকৃতির সঙ্গে বাংলার পাঞ্চমার্কযুক্ত মুদ্রায় উৎকীর্ণ হাতির বিশেষ মিল আছে।'[১৯]

সুতরাং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে সিন্ধু উপত্যকার দ্রাবিড় ও আর্যসভ্যতা এশিয়া মাইনরে, ক্রীট মিনেসের দ্বীপে ছড়িয়েছে তা নয়, পশ্চিমবঙ্গের অজয় নদীর তীরের পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকেও পাণ্ড্য, পাণ্ডা, পৌণ্ড্র গোষ্ঠী তৈরী হয়ে ভারতবর্ষের দক্ষিণে ও উত্তরে এবং ক্রীটেও ছড়িয়েছে।

"......সরস্বতী এখন লুপ্ত। তার তীরেই বঙ্গজনের উপনিবেশ 'কালিবঙ্গের' নগর সভ্যতার চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পাণ্ডুরাজার ঢিবির আধা-গ্রামীণ, আধা নাগরিক সহর সভ্যতার মতোই তা প্রাচীন কিম্বা তার চাইতে নবীন। নিষাদ শবর কিরাত জনগণ পূব থেকেই পশ্চিমে গেছেন। তাঁদের মিশ্রণে মেলোনেশিয়ান জাতির দ্রাবিড় সংস্কৃতি। দ্রাবিড় জনগণ হতেই আর্য সভ্যতার উৎপত্তি। সিন্ধুনগর মোহেঞ্জোদারোতে ও পাঞ্চাল-নগর হরপ্পায়।"[২০] এইসব উক্তি নিতান্তই নিরর্থক নয়!

সিন্ধু সভ্যতার মহেন-জো-দারো এবং হরপ্পার সভ্যতা যদি আর্য যুগের প্রারম্ভেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার সূচনা আর্যদের ভারত আগমনের বেশ আগেই ঘটেছিল। সুতরাং ভারতে আর্য সভ্যতার যে বিকাশ, তার অপেক্ষা সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা এবং দেশের অন্যত্র আবিষ্কৃত অনুরূপ সভ্যতার অস্তিত্ব এবং প্রসার নিশ্চিতভাবে প্রাচীনতর। পাণ্ডিতদের মতানুসারে, ভারতে আর্য সভ্যতার বিকাশ চার থেকে সাড়ে চার হাজার বছর আগের নয় এবং সে সভ্যতাও প্রাগার্য্য সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

সেই প্রাগার্য সভ্যতা যে এই সিন্ধু উপত্যকায় ও সেই প্রকার উন্নত মানের সভ্যতা এবং সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে ও রূপায়ণে যে বেদবহির্ভূত বাঙ্গালীর অবদানও অকিঞ্চিৎকর নয়, তা আমরা বিশেষভাবে অনুধাবন করতে পারি। কিন্তু

সেই বাঙ্গালীকে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ভিত্তিতে আমরা বিশেষভাবে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গেই লক্ষ্য করি, যাদের ঐতিহাসিক যুগের অভ্যুদয়ে গ্রীকেরা গঙ্গারিডি বলে অভিহিত করেছিলেন। সেই সময়ে নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় ও সমভূমিতে প্রাচ্য দেশের পরেই ছিল গঙ্গারিডিদের দেশ যাদের উত্তর-পশ্চিমের ভারতীয়েরা গঙ্গার বা গঙ্গাল বলে উল্লেখ করেছিল।

এদের গঙ্গাভিত্তিক রাষ্ট্র ও জীবনধারণ প্রণালীর গুরুত্ব এবং তাদের সমৃদ্ধি ও উন্নত সংস্কৃতির কথা এই উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদের কাছ থেকে জেনেই, বিদেশী লেখকেরা তাদের গঙ্গারিডি বা গঙ্গারিডাই নামে চিহ্নিত করেছিলেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের অনুমান যে গ্রীকগণ বঙ্গ নামের সঙ্গে গঙ্গা নাম গুলিয়ে ফেলে গঙ্গারিডি নাম সৃষ্টি করেছিল, [১] আদৌ ঐতিহাসিক প্রতীতি উৎপন্ন করে না।

বঙ্গাল নাম অনেক পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গের এবং তার অধিবাসীদের উদ্দেশে নির্দিষ্ট হয়েছিল, তা আমরা জানি। কিন্তু, সেই সুদূর অতীতে যখন সমগ্র বঙ্গদেশ আদৌ আবির্ভূত হয় নি এবং বৈদিক আর্যেরা এই দেশকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখতো, তখন গঙ্গার মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং অসম্পূর্ণ ভূভাগ বৃহত্তর বঙ্গীয় বদ্বীপ অথবা পূর্ববঙ্গ সম্বন্ধে উত্তর-পশ্চিম ভারতের আর্যদের তেমন স্বচ্ছ ধারণা না থাকলেও বঙ্গ নামটি সুপ্রাচীন কাল থেকে পরিচিত। কারণ, সেখানকার আর্যপূর্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি উচ্চমানসম্পন্ন ছিল।

সুতরাং গঙ্গানদীর উপত্যকায় বসবাসকারী যাদের কথা ভারতীয় আর্যেরা বলেছিল এবং গ্রীকেরা যাদের বুঝেছিল, সেই গঙ্গারিডি দেশ গঙ্গার প্রাচীনতর এবং মূল ধারার দ্বারা সঞ্জীবিত গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ (গঙ্গার দুই উপকূলেই বিস্তৃত), যা সাগর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যদিও সাগর সঙ্গম ছিল অনেক উত্তরে। [১৩]

মহাভারতকালে এখনকার গঙ্গাসাগর তীর্থের অস্তিত্ব ছিল কিনা এবং থাকলেও সেই সাগরসঙ্গম কোথায় ছিল, তা সম্পূর্ণভাবে কুহেলিকাবৃত। কারণ, সমুদ্র তখন বর্তমান রাজমহলের নিকট ছিল, বলা হয়েছে।

নির্দেশিকা

১। মেদিনীপুরের ইতিহাস —যোগেশচন্দ্র বসু।
২। বাংলার সামাজিক ইতিহাস —ডঃ অতুল সুর।
৩। বাঙ্গালীর জাতিতত্ত্ব ও কৃষিজীবি সম্প্রদায়— ডঃ সুহৃদকুমার ভৌমিক।
৪। 'মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা তাম্রপ্রস্তর যুগের। এখানে লৌহের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি'—"প্রাগৈতিহাসিক মোহন-জো-দাড়ো" —কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী।
৫। প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষ —ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

৬। প্রাগৈতিহাসিক মোহন-জো-দাড়ো —কৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামী
৭। বাংলার সামাজিক ইতিহাস — ডঃ অতুল সুর।
৮। History of Ancient Bengal – Dr. R C. Majumdar.
৯। বাঙ্গালীর ইতিহাস —কমল মজুমদার।
("আগরতলায় সদ্য সমাপ্ত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ৪৭তম অধিবেশনে বাংলাদেশ হাই কমিশনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ডঃ সিরাজুল ইসলাম হরপ্পা ও মহেন-জো-দারোর সভ্যতা থেকে বাঙ্গালীর ইতিহাসকে প্রাচীনতর বলিয়া উল্লেখ করিয়া বাস্তবানুগ ভাষণ দিয়াছেন—যুগান্তর ৩০ ১২।৭৪")।
১০। বাঙ্গালীর ইতিহাস —কমল মজুমদার।
১১। বঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার বিস্তার —স্বামী শংকরানন্দ।
১২। ঐ ঐ ঐ ঐ
১৩। ঐ ঐ ঐ ঐ
১৪। ঐ ঐ ঐ ঐ
১৫। ঐ ঐ ঐ ঐ
১৬। বাংলার সামাজিক ইতিহাস —ডঃ অতুল সুর।
১৭। সামাজিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ—(সামাজিক ইতিহাসের চর্চা)
—ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার।
১৮। বাংলার সামাজিক ইতিহাস —ডঃ অতুল সুর।
১৯। ঐ ঐ ঐ ঐ
২০। অজানা বঙ্গকে জানো —সঞ্জয় ভট্টাচার্য।
২১। সামাজিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ (সামাজিক ইতিহাসের চর্চা)
—ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার।
২২। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (৩য় খণ্ড) —বিনয় ঘোষ।

মহাপদ্ম নন্দের গঙ্গারিডি পরিচয়

মহানন্দ নন্দ, যাঁকে পুরাণে মহাপদ্মপতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে, ছিলেন মগধের নন্দ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ঐতিহাসিক যুগের (অর্থাৎ ৩২৬ খৃঃ পূঃ) অল্প আগেই তিনি জীবিত ছিলেন। বায়ুপুরাণ অনুযায়ী তিনি প্রায় ২৮ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। অন্যান্য সূত্রেও এই রকম হিসেবই পাওয়া যায়।[১]

পশ্চিমে বিপাশা নদী থেকে পূর্বে সমুদ্র পর্যন্ত আর্যাবর্তের সমস্ত ভূখণ্ড জয় করে তিনি একরাট হয়েছিলেন।[২] আর্যাবর্তের প্রায় সকল ক্ষত্রিয় নৃপতিকে পরাজিত ও বিনষ্ট করে তিনি 'সর্বক্ষত্র্যান্তক' হিসেবেও অভিহিত হয়েছিলেন।[৩] এইভাবে নিজের শৌর্য্য, বীর্য্য এবং বুদ্ধিমত্তায় মহাপদ্ম নন্দ এক সুবিশাল সাম্রাজ্যের নিঃসপত্ন অধিকার লাভ করেছিলেন।

এই মহাপদ্ম নন্দই জৈন গ্রন্থাদিতে এবং গ্রীক সূত্র অনুযায়ী ঘৃণ্য নাপিত-পুত্র বলে বর্ণিত এবং গঙ্গারিডি-প্রাসী যুক্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মহাপদ্ম নন্দের শেষ বংশধরই আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ে মগধের সার্বভৌম নরপতি ছিলেন, যাঁকে বৈদেশিক বিবরণে দুটি ভিন্ন নামে পরিচিত করা হয়েছে।[৪]

শূদ্রদের উপর নির্য্যাতনে ক্ষিপ্ত হয়ে মহাপদ্ম নন্দ সমগ্র উত্তর ভারতকে ক্ষত্রিয়-শূন্য করেছিলেন এবং শূদ্র তথা অনার্যদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ছিলেন। যাই হোক, গঙ্গারিডাই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই পূর্ব ভারতের এই রাজশক্তির মহাভারতীয় যুগের অপূর্ণ অভিলাষ পূর্ণ হলো।[৫] অশোকের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের উচ্ছেদের আগে পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য (আর্য) শক্তি আর প্রাচ্য অঞ্চলে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

এই শক্তিমান নরপতির গঙ্গারিডি তথা বাঙালী হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। অনেক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সেই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন। নন্দবংশীয়দের বিভিন্ন দিক থেকেই বাঙ্গালী বলে অভিহিত করা হয়েছে; এই বিষয়টি ইতিহাসগতভাবে বিশদ পরীক্ষার দাবি করে।

এই বিষয়ে অধিকতর আলোচনা এবং আলোকপাতে সচেষ্ট হওয়ার আগে আমাদের মৌর্য সাম্রাজ্যের পত্তন এবং তার আগের যুগে বাঙ্গালী জাতির ঐতিহ্য, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা কর্তব্য। আর্য শাস্ত্র, সাহিত্য, এবং পুরাণে বাঙ্গালীর কথা নেই বললেই চলে, যেমন নেই আর্যসীমা বহির্ভূত অন্য অনেক রাজ্যের কথাই।

বৌদ্ধধর্ম এবং জৈন ও অজীবক ধর্মকে অনেকে আর্যধর্ম বলে বিবেচনা করেন। জৈন ধর্মের প্রভাবে বঙ্গদেশে আর্যীকরণ সম্পন্ন হয়েছিল—এই মর্মে কেউ কেউ মন্তব্যও করেছিলেন। কিন্তু, এইসব ধর্মের উৎপত্তি অনার্য পূর্বভারতে। বিশেষভাবে, জৈন

ধর্মের প্রবর্তকদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যমণি রাঢ় দেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এ কথা জৈন সূত্র থেকেই পাওয়া যায়।

মহাপদ্ম নন্দ খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে আর্যাবর্তের 'মধ্য দেশ' এবং কলিঙ্গসহ প্রাচ্য দেশকে নিঃক্ষত্রিয় করার পরে, শূদ্র রাজার প্রভাবাধীনে দেশের কি অবস্থা হয়েছিল, তা বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য। এই কথা স্মরণীয় যে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে গাঙ্গেয় উপত্যকায় আর্যদের বিস্তার ছিল অব্যাহত। কিন্তু, ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে বিদেহ আর্যীভূত হবার পরে, আরও পূর্বদিকে আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রসরণ কয়েক শত বৎসর ব্যাহত হয়েছিল।[৬] মগধ ক্রমশঃ আর্যদের কুক্ষিগত হলেও, বঙ্গদেশ গুপ্ত যুগের আগে সম্পূর্ণভাবে আর্যীভূত হয় নি।

পুরাণের সাক্ষ্য অনুযায়ী মহাপদ্ম নন্দের অধীনে শূদ্ররাজশক্তি শেষবারের মতো প্রজ্বলিত হয়ে আর্যক্ষত্রিয়দের বিনষ্ট করেছিল। এর অর্থ এই যে, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিগতভাবে শূদ্র অথবা অনার্যশক্তি প্রচণ্ডভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিস্তৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। এই সংঘাতের ফলে পূর্বভারতের জনমানসে বৈদিকধর্মের ক্রিয়াকাণ্ডের এবং আর্যদের উন্নাসিকতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। বৈদিক ধর্মের কাঠিন্য এবং শুষ্কতা ভেদ করে মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য, যন্ত্রণা, মৃত্যু প্রভৃতির সঙ্গে মানবিক যোগসূত্র স্থাপন করতে মগধ, অঙ্গ প্রভৃতি জনপদের পূর্বদিকে আর্য পূর্ব অধিবাসীদের কাছে হৃদয়ের ধর্ম বলবত্তর হয়েছিল।

যেহেতু মগধে আবহমান কাল থেকে শক্তিশালী নরপতিরা রাজত্ব করেছে এবং মগধ ক্রমশঃ আর্যসভ্যতার প্রভাবাধীন হয়েছে (বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন) এবং বিম্বিসারের সময় থেকেই মগধ এক ক্ষমতাসম্পন্ন রাজ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে, সেই বেদ বিরোধিতা এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনায়, বঙ্গদেশ—যা পুণ্ড্র, বঙ্গ, সুহ্ম (রাঢ়), তাম্রলিপ্ত প্রভৃতিতে বিভক্ত ছিল, তথা বাঙ্গালীর অবদানই সমাধিক, এমন মনে করা অন্যায় নয়।

এই কথা বলার বিশেষ কারণ এই যে প্রাচ্য দেশীয় অঙ্গ রাজ্য (পূর্ব বিহার) তখন মগধের (দক্ষিণ বিহার) অন্তর্গত, সুতরাং আর্যসভ্যতার প্রভাবাধীন।[৭] বিদেহে (উত্তর বিহার) আগেই আর্যীকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। কলিঙ্গে আর্য প্রভাব অতি সামান্য (পরবর্তীকালে, খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে কলিঙ্গরাজ খারবেল নিজেকে আর্য বলে দাবি করেছেন, এবং কলিঙ্গদেশীয়েরা বাঙ্গালীদের মতোই শবর, পুলিন্দ, কিরাত, এবং দাস, দস্যু বলে ঘৃণিত। সুতরাং সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে এবং সম্পদে সমুন্নত গঙ্গারিডি বলে অভিহিত নিম্ন গাঙ্গেয় সমতলভূমির এবং সমুদ্রের নিকটবর্তী বাঙ্গালীরাই তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রভাবে বৈদিক ধর্ম প্রসারের প্রধান অন্তরায় হয়েছিল।

এই কথার এই অর্থ নয় যে বঙ্গদেশ এই সময়েও আর্যদের সংস্পর্শে আসে নি। বৈদিক ব্রাহ্মণেরা বারবার এবং বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গে প্রাগার্য ধর্ম ও সংস্কৃতির

প্রভাবের বিরুদ্ধে নিজেদের অসহায় বোধ করেছেন এবং জনমত আকর্ষণ করার জন্য নানা প্রকারের আপোষ করেছেন, অবৈদিক ভাবধারার সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই আর্য সংস্কৃতির বিজয় সুসম্পন্ন হয়েছিল। 'মধ্য'দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে আর্যেরা বঙ্গদেশে, কলিঙ্গে এবং প্রাগজ্যোতিষে / কামরূপে বাহুবলে জয়ী হতে পারে নি। দক্ষিণ ভারত অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য অনেক পরে আর্যীভূত হলেও, আজ পর্যন্ত দ্রাবিড় প্রভাব থেকে মুক্ত হয় নি।

মহাপদ্ম নন্দের গঙ্গারিডির অধিবাসী হওয়ার পক্ষে প্রধানতম যুক্তি এই যে তিনি পুরাণের মতে শূদ্রকুলোদ্ভব। বৈদেশিক (গ্রীক/লাতিন) সাক্ষ্য অনুযায়ী নাপিতপুত্র হলেও, তিনি চাতুর্বর্ণ্যভিত্তিক আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ধ্বজাধারীদের চোখে শূদ্র। আমাদের পুরাণগুলি তাঁর এই শূদ্র জন্মের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছে। গ্রীক লেখকদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে তিনি ও তাঁর পুত্র / পুত্রেরা প্রজাদের নিকট ঘৃণা ও বিদ্বেষের পাত্র ছিলেন। সম্ভবতঃ নন্দবংশীয় নৃপতিগণ এই ঘৃণা ও বিদ্বেষের সম্মুখীন হয়েছিলেন যখন বহিরাগত হয়েও বলপ্রয়োগ করে তাঁরা মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। সিংহলীয় কিম্বদন্তী অনুসারে নন্দ বংশীয় রাজা ধন নন্দ প্রজাদের গুরু করভারে নিপীড়িত করে নিষ্ঠুর শোষণের দ্বারা প্রভূত ধনসম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন।[৮]

উপর্যুক্ত ঘৃণা এবং বিদ্বেষ দুটি লক্ষণ নির্দেশ করে। (১) এক বিদেশীর অতর্কিতভাবে এবং জোরপূর্বক পাটলিপুত্রের সিংহাসন দখলের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ। (২) আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাবাধীন মগধবাসীরা এক হীনজাতির ক্ষমতালাভে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং সেই ধূমায়িত বিক্ষোভকে নানাভাবেই প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সবল রাজশক্তির ভয়ে শেষ পর্যন্ত কোন তীক্ষ্ন প্রতিবাদ জানাতে অথবা সক্রিয় প্রতিরোধ গঠন করতে সক্ষম হন নি।

পুরাণে, শূদ্রবংশীয় মহাপদ্ম নন্দ 'তথাকথিত ক্ষত্রিয়' হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন।[৯] অর্থাৎ তিনি ছিলেন আর্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কাছে ব্রাত্য। কিন্তু, শিশুনাগ-বংশীয় ক্ষত্রিয় নরপতি মহানন্দীর শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র হলে, (যে কথা পুরাণে লিপিবদ্ধ হয়েছে) মহাপদ্ম নন্দ নিশ্চয়ই শূদ্র বলে চিহ্নিত হতেন না, যদিও আর্য অভিজাতদের চোখে তাঁর আর্য ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকৃত হতো না, হলেও অম্লান থাকতো না। তা ছাড়া, শিশুনাগ বংশীয় নরপতি মহানন্দীর পুত্র বলে পরিচিত হলে, মহাপদ্ম নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে খ্যাতিলাভ করতেন কিনা সন্দেহ আছে।

সুতরাং শিশুনাগ বংশীয় নরপতির সঙ্গে মহাপদ্ম নন্দের কোন রক্তের সম্পর্ক ছিল না, এই কথাই প্রমাণিত হয়। আরও হয় এইজন্য যে শিশুনাগ বংশের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক থাকলে মগধের প্রজারা মহাপদ্ম নন্দের ও তাঁর বংশধরদের প্রতি অবজ্ঞার এবং বিদ্বেষের ভাব পোষণ করতেন না, হয়তো।

মহাপদ্ম নন্দকে জৈন সূত্রে গণিকার পুত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১০] মগধের সুশৃঙ্খল শাসনের মধ্যে রাজপ্রাসাদের এবং তার চার পাশের কোন স্থান থেকে

রাজবংশীয় কোন শূদ্রের অথবা কোন গণিকাপুত্রের রাজশক্তি অধিকার করার কল্পনাও অত্যন্ত সুদূরপরাহত।[১১] এই কথাই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় যে কোন বিদেশী শত্রু রাজপ্রাসাদে এক সুপরিকল্পিত চক্রান্তের সুযোগে অপ্রত্যাশিত আক্রমণের দ্বারা রাজা এবং তাঁর পুত্রদের হত্যা করে, পুরানো রাজবংশকে উচ্ছেদ করেছিল এবং তাদের স্থান অধিকার করেছিল। শিশুনাগবংশীয় এই শেষ নৃপতি ছিলেন কালাশোক কাকবর্ণ। বাণভট্টের 'হর্ষ চরিতের' বিবরণ অনুসারে কাকবর্ণ শৈশুনাগীর গলায় একটি ছুরিকা বিদ্ধ করা হয়েছিল।[১২]

সুতরাং এই সিদ্ধান্তই যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয় যে সিংহলীয় কিম্বদন্তীতে (মহাবোধিবংশ) উগ্রসেন বলে পরিচিত[১৩] শূদ্রোকুলোদ্ভব মহাপদ্ম নন্দ, যিনি মহাপদ্মপতি বলেও সম্মানিত হয়েছেন[১৪], সেই সময়ে আর্য্য সীমার বহির্ভূত বঙ্গদেশ থেকে মগধে এসেছিলেন। পরে, নিজের বুদ্ধিবলে ও পরাক্রমের সাহায্যে অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা সম্ভবতঃ শিশুনাগ বংশীয় অপদার্থ নরপতিকে হত্যা করে ক্ষমতা হস্তগত করেছিলেন এবং পাটলিপুত্রে তাঁর কেন্দ্রীয় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। বঙ্গদেশীয় নৃপতি মহাপদ্ম নন্দের রাজধানী ছিল পুন্ড্রবর্ধন এবং তিনি গ্রীকবর্ণিত গঙ্গারিডি রাজ্য থেকে গিয়ে মগধ দেশ জয় করেছিলেন। এখানে এই কথা স্মরণযোগ্য যে মহাপদ্ম নন্দ হয়তো জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং সেই প্রাক-মৌর্য্য যুগে মহাপদ্ম নন্দের রাজধানী বলে উল্লিখিত পুন্ড্রবর্ধন জৈন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল।[১৫]

মগধ বিজয়ের পরে মহাপদ্ম নন্দ রাজ্য বিস্তারে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি মগধ এবং অন্যান্য আর্য্য রাজ্যের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ঘৃণা, অবজ্ঞা এবং বিদ্বেষের প্রতিবাদস্বরূপ এবং বিশেষভাবে মগধের উচ্চকোটীর ব্যক্তিদের বিদ্বেষ ও অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের বাসনায়, তিনি বিপাশা নদী পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্তের সকল ক্ষত্রিয় রাজবংশকে যুদ্ধে পরাজিত করে, তাদের উচ্ছেদ করেছিলেন। মহাপদ্ম নন্দের এই ক্ষত্রিয় নিধনের ভূমিকা তাঁর আর্য্যাধিকার বহির্ভূত সুদূর প্রাচ্যের তথা বঙ্গদেশের শূদ্র অর্থাৎ অন-আর্য্য উৎপত্তির সমর্থক। এই বিষয়টি পরে আরও বিশদভাবে আলোচিত হবে।

মহাপদ্ম নন্দ মগধের রাজ্য ও সিংহাসন কুক্ষিগত করার আগে নিশ্চয়ই নিজেই একজন রাজা ছিলেন এবং সৈন্য পরিচালনায় ও শাসন ব্যবস্থার পরিচালনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অন্যথায় অর্থাৎ রাজ্য শাসন করার ক্ষমতা ব্যতীত, তিনি এত বৃহৎ এক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হতে পারতেন না এবং তাঁর পক্ষে এই বিশাল ভূখণ্ডকে শাসন করাও সম্ভব হতো না। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য যখন শেষ নন্দরাজাকে পরাজিত করেন, তখন তিনি একটি বিরাট সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। অবশ্য চন্দ্রগুপ্ত বাহুবলে ও নিজের বিচক্ষণতার দ্বারা এই বিশাল সাম্রাজ্যকে অধিকারভুক্ত রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। কলিঙ্গ চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল কিনা, সঠিক বলা কঠিন।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "বাংলার ইতিহাস" গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন,

"আর্যোপনিবেশের পূর্বে যে প্রাচীন জাতি ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, তাহারাই বোধহয় ঋগ্বেদের দস্যু এবং তাহারাই ঐতরেয় আরণ্যকে বিজেতৃগণ কর্তৃক পক্ষীনামে অভিহিত হইয়াছে। এই প্রাচীন দ্রাবিড় জাতিই বঙ্গ ও মগধের আদিম অধিবাসী।" বস্তুতঃ, আর্যদের সঙ্গে এদের ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত বিভেদই অধিক ছিল। অবশ্য, মগধ বঙ্গদেশের বহু আগেই আর্য-সভ্যতার অঙ্গীভূত হয়েছিল।

দ্রাবিড়দের আগে অস্ট্রিকরা এদেশে বাস করতো, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। মহাপদ্ম নন্দ সম্ভবতঃ দ্রাবিড় বংশসম্ভূত ছিলেন, কারণ পুণ্ড্রবর্ধন সেই সময়ে দ্রাবিড় শক্তির অধীনে ছিল। "এত বড় রাজার পুণ্ড্রবর্ধনে রাজধানী থাকায় মনে করা অন্যায় হবে না যে তিনি ছিলেন পুণ্ড্রবংশীয় দ্রাবিড় সন্তান, যে পুণ্ড্রবংশ প্রথমে দাস দস্যু জাতি বলে ধিক্কৃত হলেও পরবর্তী আর্য সমাজ যাদের সৎ ক্ষত্রিয় বলে মেনে নিয়েছিল। তাই দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক দ্বিবিধ সংকর উগ্রসেনকে শূদ্র বলেই চিহ্নিত করলেন পুরাণকারগণ, নারদীয় মনু বচনের নির্দেশ (শূদ্রায়াং ক্ষত্রিয়াজ্জাতো নাপিতো বর্ণসংকরঃ) অমান্য করেও।"[১৬]

গ্রীকগণ কথিত মহাপদ্ম নন্দের নাপিতপুত্র হওয়ার ঘটনাও নিতান্ত কাকতালীয় নয়। এই কথা আগেই বলা হয়েছে যে মহাপদ্মের মাতৃকুল দ্রাবিড় হওয়াও অসম্ভব ছিল না। বাঙ্গালীর রক্তে তখনও আর্য রক্তের সংমিশ্রণ হয় নি। বাঙ্গালী তাই মধ্যদেশীয় ব্রাহ্মণদের চোখে শূদ্র তথা হীন, ঘৃণ্য, অবৈদিক।

গঙ্গারিডির রাজা এসে মগধ তথা প্রাসী জয় করাতে মেগাস্থিনিস এবং তাঁর পরবর্তী গ্রীক / লাতিন লেখকেরা মহাপদ্ম নন্দ এবং তাঁর শেষ বংশধরকেও (যাঁকে জান্দ্রামেস অথবা অগ্রাম্মেস বলে বর্ণনা করা হয়েছে) গঙ্গারিডি এবং প্রাসীর রাজা বলে চিহ্নিত করেছেন। বলাই বাহুল্য, এই অগ্রাম্মেস কথাটি স্পষ্টই উগ্রসেন্য শব্দ থেকে বিকৃত ভাবে এসেছে এবং গ্রীক উচ্চারণে পরে কারোর কাছে জান্দ্রামেসে পরিণত হয়েছে, যেমন চন্দ্রগুপ্ত শব্দটি পরিণত হয়েছিল সান্ড্রাকোটাসে।[১৭]

গঙ্গারিডি প্রাচ্য দেশের মধ্যে অবস্থিত হলেও এবং প্রায় সমগ্র আর্যাবর্তের ক্ষত্রিয় বিজেতা প্রাসী অথবা প্রাচ্য (যার রাজধানীর নাম পাটলিপুত্র) দেশের অন্তর্গত বলে ঘোষিত ও স্বীকৃত হলেও, গ্রীকেরা কেন গঙ্গারিডিকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেছেন? তাঁরা তো বললেই পারতেন যে বিপাশা নদীর পরে সমগ্র প্রাচ্য দেশের রাজা ছিলেন অগ্রাম্মেস / জান্দ্রামেস। সুতরাং মনে হয় পঞ্চনদের অধিবাসীদের এবং ফেগেলাস ও পুরু প্রভৃতি স্থানীয় নৃপতিদের কাছে তাঁরা প্রাসী এবং গঙ্গারিডি, দুটি রাজ্যের প্রবল শক্তির সংবাদ পেয়েছিলেন। তাই তাঁরা দুটি দেশকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেছেন।

এই স্বতন্ত্র উল্লেখও তৎকালীন মগধরাজের (আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ে) গঙ্গারিডি দেশ থেকে উদ্ভূত হওয়ার সম্ভাবনাই অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে। গঙ্গারিডি পাটলিপুত্রের রাজার স্বদেশ হওয়ায়, বৈদেশিক গ্রন্থকারদের

বিবরণে বিশেষ সম্ভ্রমের স্থান পেয়েছিল, এই যুক্তি ব্যতীত গঙ্গারিডি নামোল্লেখের কোন সার্থকতাই নেই। স্পষ্টই বোঝা যায় যে প্রাসী রাজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও, গঙ্গারিডির কথা বিশিষ্টভাবে বিবৃত না করে কোন উপায় ছিল না।

এই সম্পর্কে এক প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য—"স্পষ্টই বোঝা যায়, প্রাচীন ইউরোপীয় লেখকেরা Gangarid জাতিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। এর কারণ হয়তো এই যে নন্দরাজগণ Gangarid বা বঙ্গজাতীয় ছিলেন।"[১৮] বঙ্গজাতীয় বলতে প্রাচীন বঙ্গের অন্তর্গত না বুঝিয়ে বৃহত্তর বঙ্গভূমির অন্তর্গত বলেই অনুমান করা সঙ্গত।

তৃতীয়তঃ আমরা লক্ষ্য করি যে মহাপদ্ম নন্দ কর্তৃক পদানত ক্ষত্রিয় রাজ্যগুলির মধ্যে পুণ্ড্র, বঙ্গ, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতির নাম নেই। অবশ্য এই রাজ্যগুলি ক্ষত্রিয় রাজ্য ছিল না সেই সময়ে। কারণ, মহাপদ্ম নন্দের সময়ে এই রাজ্যগুলি পুণ্ড্রদের ক্ষমতাধীন ছিল বলেই মনে হয়। পুণ্ড্ররাজাই সেই সময়ে প্রবল ছিল, এ'কথা আগেই বলা হয়েছে। মহাপদ্মের অভিযানের মধ্যে কলিঙ্গ জয়ের কথাও আছে, পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী, কিন্তু বঙ্গদেশের কোন অঞ্চলের কথাই নেই। অথচ মহাপদ্ম নন্দের পুত্রকে (বংশধর) গঙ্গারিডি ও প্রাসীর রাজা বলা হয়েছে।

এই সূত্রটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই বিবেচনা করা যায়। মহাপদ্ম নন্দের বাঙ্গালী পরিচয়ের এক যুক্তিগ্রাহ্য স্বীকৃতি এই তথ্যের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। গঙ্গারিডি মহাপদ্ম নন্দেরই বশীভূত অথবা অধিকারভুক্ত ছিল, এবং স্বাভাবিকভাবে গঙ্গারিডির অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলগুলির বিরুদ্ধে মহাপদ্মের কোন সামরিক অভিযান পরিচালিত হয় নি।

চতুর্থতঃ মহাপদ্মনন্দের গঙ্গারিডি তথা বাঙ্গালী উৎপত্তির যৌক্তিকতা প্রমাণে আমাদের একটি ইতিহাস-স্বীকৃত লক্ষণ অথবা বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। আমরা বৈদিক যুগের সূচনায় কোন বর্ণ অথবা শ্রেণী বৈষম্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করি না। কিন্তু ক্রমশঃ আর্য গোষ্ঠী-সমূহ যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করে কৃষি এবং অন্যান্য কুটিরশিল্পের উদ্ভাবনে নিজ নিজ আবাসে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে, প্রথমে কর্মভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ প্রবর্তিত হতে থাকে।

রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীর যুগে বৈদিক সভ্যতা পরিপূর্ণতা লাভ করলেও, আর্য সমাজে চাতুর্বর্ণ্যের প্রাদুর্ভাব হয়। ক্রমে রাষ্ট্রীয় চেতনার উৎপত্তি ও উন্নতির মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অলিখিত চুক্তির ভিতর দিয়ে সামাজিক কাঠামো কতগুলি অনুশাসনের বশবর্তী হয়।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ক্ষমতালাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস যেমন দীর্ঘ তেমনই রোমাঞ্চকর। বৈদিক যুগের সমাপ্তির পরে ব্রাহ্মণ্য যুগের উদয়ে শূদ্রদের মধ্যে শ্রেণীগত অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। ভারতের পূর্ব অঞ্চলে বেদ ও ব্রাহ্মণ বিরোধিতার প্রবল বন্যায় অনেকগুলি নতুন ধর্মের অভ্যুদয় ঘটেছিল। সে নতুন ধর্মগুলি মানুষের মধ্যে বর্ণগত প্রভেদের মূলে কুঠারাঘাত করেছিল। আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনিবার্য

স্রোত পূর্বাভিমুখী হলে, নিম্নবর্ণের অর্থাৎ শূদ্রদের মধ্যে এক গভীর আলোড়নের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত প্রাচ্য দেশের বাঙ্গালী অধ্যুষিত ভূখণ্ডেই শূদ্র তথা অনার্যদের বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়, এবং বৈদিক আভিজাত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

মহাপদ্ম নন্দের ক্ষত্রিয়বিধ্বংসী সংগ্রাম এবং তার সঙ্গে রাজ্যবিজয়ের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে শূদ্রদের রাষ্ট্রনৈতিক অত্যাচার, অপমান ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা গ্রহণের প্রবৃত্তিরই বিস্ফোরণ ঘটেছিল। প্রাচীন যুগে (ঐতিহাসিক যুগের সূচনার ঠিক আগেই) মহাপদ্ম নন্দের এই নিঃক্ষত্রিয়করণের নিদারুণ যজ্ঞকে শ্রেণী সংগ্রামের এক জ্বলন্ত নিদর্শন বলে অভিহিত করা যায়।[১৯]

পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী মহাপদ্মের মাতা ছিলেন শূদ্রা রমণী। 'সম্ভবতঃ উগ্রসেন (মহাপদ্ম নন্দ) শূদ্র মাতার গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসজাত ছিলেন। পুরাণকারগণ শূদ্ররক্তজাত বলে উগ্রসেনকে পুরোপুরি শূদ্র বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়দের শূদ্রা স্ত্রী থাকা অবিধেয় ছিল না।[২০] যাই হোক, আগেই বলা হয়েছে যে মগধের ক্ষত্রিয় নরপতির শূদ্রজাত সন্তান তিনি ছিলেন না, এবং কেন ছিলেন না তার কারণও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সুতরাং অনার্যা জননীর পুত্র (নাপিতপুত্র বলে বর্ণিত) এই মহাপদ্ম পরে সৎ (ব্রাত্য) ক্ষত্রিয় বলে পরিগণিত হলেও, আপন বীরত্বের অভিমানে ব্রাহ্মণ্য সমাজ কর্তৃক আরোপিত হীন শূদ্রত্বের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিতে প্রজ্বলিত হয়েছিলেন। মগধরাজ জরাসন্ধের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের কামনা এবং অঙ্গাধিপতি সূতপুত্র কর্ণের জাত্যভিমানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের বাসনার সমন্বয় সাধন করে, এক ভয়ংকর সংহারশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি আর্য ক্ষত্রিয়দের নিধন করেছিলেন। আর্যসীমা বহির্ভূত গঙ্গারিডি দেশ থেকে উদ্ভূত হয়ে প্রচণ্ড শৌর্য ও বীর্যের অধিকারী মহাপদ্ম নন্দ এইভাবে পরবর্তী দেড়শ দু'শ বছরের উপর অক্ষত্রিয় এবং অব্রাহ্মণদের রাজকীয় ক্ষমতায় এবং মহিমায় স্থাপন করেছিলেন।

গঙ্গারিডি অধিপতির নেতৃত্বে এই বিরাট গণ-অভ্যুত্থানের কাহিনীকে ব্রাহ্মণ পুরাণকারেরা অস্বীকার অথবা উপেক্ষা করতে পারেন নি। কিন্তু তথাপি মহাপদ্ম নন্দকে আর্যীভূত মগধের সন্তান বলে প্রমাণ করতে পুরাণকারেরা তাঁকে শিশুনাগবংশীয় রাজা মহানন্দীর শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পুরাণের এই সিদ্ধান্তের অসারতা যে সহজেই প্রমাণিত হয় সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

এই সত্যই ইতিহাসের পাতায় থেকে যায় যে সেই সময়ে আর্য (ব্রাহ্মণ্য) ধর্মের জাতিভেদমূলক চাতুর্বর্ণ্য প্রথার কাঠিন্য ও যাগযজ্ঞের প্রবণতা এবং শূদ্রদের (যারা বৈদিক সাহিত্যে দাস, দস্যু, ম্লেচ্ছ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে) প্রতি ঘৃণা ও অত্যাচারকে কেন্দ্র করে অবশিষ্ট অনার্য প্রাণশক্তির শেষ শিখা আর্য সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহায় প্রজ্বলিত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে আর্য ও অনার্য শক্তির সামগ্রিক সংগ্রামের এই তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়টি সম্বন্ধে এক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের মন্তব্য উদ্ধার করা হচ্ছে—"মগধে শূদ্র বংশের

অভ্যুত্থান ও আর্যাবর্তে পুনর্বার নিঃক্ষত্রিয় করণের অর্থ বোধহয় এই যে এই সময়ে বিজিত অনার্যগণ অবসর পাইয়া পুনরায় মস্তকোত্তলন করিয়াছিলেন এবং মহাপদ্ম নন্দের সাহায্যে ক্ষত্রিয় রাজকুল নির্মূল করিয়াছিলেন। মহাপদ্ম নন্দের পূর্বে কোন রাজা সমগ্র আর্যাবর্ত অধিকার করিয়া "একরাট" পদবী লাভ করিতে পারে নাই।"[২১]

গঙ্গারিডি জাতি থেকে উদ্ভূত হয়ে মহাপদ্ম নন্দ মগধ জয় করে যেমন আর্যাবর্তে শূদ্রদের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের কলিঙ্গ, অন্ধ্র, কর্ণাটক প্রভৃতি দেশের অংশবিশেষেও প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন,[২২] তেমনই তাঁর পুত্র গঙ্গারিডি ও প্রাসীর অধীশ্বররূপে ভারতবর্ষকে আলেকজাণ্ডার তথা গ্রীক বৈদেশিক শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন।

অবশ্য এই নন্দরাজা বিনা যুদ্ধেই গ্রীকদের ভারত থেকে বিতাড়িত করার দুর্লভ সম্মান লাভ করে ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম চিরস্থায়ী করে গেছেন। গ্রীক পণ্ডিতদের লেখনীতে ভারতের পরবর্তী অধীশ্বর মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত কখনও গঙ্গারিডির রাজা বলে অভিহিত হন নি। কিন্তু নন্দ রাজারা গঙ্গারিডিরও অধিপতি বলে অভিহিত হয়েছিলেন। এর কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। নন্দবংশীয়েরা গঙ্গারিডি দেশ / জাতির অন্তর্গত ছিলেন। কিন্তু মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত তা ছিলেন না, তাই তাঁকে গঙ্গারিডির রাজা কখনই বলা হয় নি। এইখানে প্রাসঙ্গিকভাবে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের নিম্ন লিখিত উক্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

"অধিকাংশ গ্রীক লেখকদের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া মোটের উপর এই সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন হইবে না যে, যে সময়ে আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন, সেই সময়ে বাংলার রাজা মগধাদি দেশ জয় করিয়া পাঞ্জাব পর্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। গ্রীক ও লাতিন লেখকগণ এই রাজার যে নাম ও বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে অনেকেই অনুমান করেন যে ইনি পাটলিপুত্রের নন্দবংশীয় কোন রাজা। ইহা সত্য হইলেও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে। কারণ নন্দরাজা বাংলা হইতে গিয়া পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করিবেন ইহা অসম্ভব নহে। পরবর্তীকালে বাঙ্গালী পালরাজাগণও তাই করিয়াছিলেন। পুরাণে নন্দবংশ শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইহাও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে। কারণ বাংলাদেশ বহুকাল পর্যন্ত আর্য সভ্যতার বহির্ভূত ছিল। এবং ইহার অধিবাসী আর্য ধর্মশাস্ত্র অনুসারে শূদ্র বলিয়া বিবেচিত হইবেন, ইহা খুব স্বাভাবিক। অবশ্য নন্দরাজা বাঙ্গালী ছিলেন ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায় না। কিন্তু এই সময় যে বাংলার রাজাই সর্বাধিক শক্তিশালী ছিলেন প্রাচীন গ্রীক লেখকদের উক্তি হইতে তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়—এবং যখন ইহার অব্যবহিত পরে শূদ্র নন্দরাজাকে আর্যাবর্তের সার্বভৌম রাজারূপে দেখিতে পাই তখন তাহাকে এই বাঙ্গালী রাজার সহিত অভিন্নরূপে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। অন্যথা স্বীকার করিতে হয় যে সহসা প্রবল গঙ্গারিডই রাজত্বের লোপ পাইয়া নন্দ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। আলেকজাণ্ডারের ভারত অবস্থান কালেই এই গুরুতর

পরিবর্তন হয় অথচ সমসাময়িক লেখকগণ ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিলেন না, অথবা জানিয়াও উল্লেখ করিলেন না এরূপ অনুমান করা কঠিন।"[২৩]

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার যে নির্ভরশীল যুক্তিটির উল্লেখ করেন নাই, তা এই যে শূদ্ররক্তসঞ্জাত মহাপদ্ম নন্দ আর্য ক্ষত্রিয়দের নিধন করেই আপন হীনজন্মের প্রতি আর্যদের (মগধবাসীর) ঘৃণা এবং অবজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন। সেই হিসেবেও মহাপদ্ম নন্দকে মগধ (প্রাসী) অপেক্ষা বঙ্গদেশ (গঙ্গারিডি) হতে সম্ভূত বলে মনে করা অধিকতর সঙ্গত। এই সর্বব্যাপক রক্তক্ষয়ী অভিযান মহাপদ্মের দুর্ধর্ষতা এবং নৃশংসতা প্রতিপন্ন করলেও, এই কথাও নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে তিনি শুধুমাত্র একজন দুঃসাহসিক ও দুর্জয় অভিযানকারীই ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন বীর্যবান, প্রতিভাসম্পন্ন যুদ্ধবিশারদ ও সৈন্যাধ্যক্ষ, একজন নরপতি স্থানীয়।

নির্দেশিকা

১। Political History of Ancient India
—Dr. H. C. RoyChowdhury।

২। মৎস্য পুরাণ, বায়ুপুরাণ (বঙ্গানুবাদ) —পঞ্চানন তর্করত্ন।

৩। মৎস্য পুরাণ " "

৪। The Classical Accounts of India —Dr. R. C. Majumdar।

৫। উত্তরবঙ্গের ইতিহাস —সুকুমার দাস।

৬। বাংলার সামাজিক ইতিহাস ডঃ অতুল সুর।

৭। "The conversion of Magadha took place long before the birth of Buddha but even at that time the Brahmanas had not attained there the supremacy which they possessed in the Indo-Aryan territories." Prehistoric India. —R. D. Banerjee।

৮। Political History of Ancient India
—Dr. H. C. RoyChowdhury।

৯। পালপূর্ব যুগের বংশানুচরিত —ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার।

১০। 'The Jaina Parishista Parvan on the other hand represents Nanda as the son of a courtesan by a barber'. Political History of Ancient India.
—Dr. H. C. RoyChowdhury।

১১। Political History of Ancient India.
—Dr. H. C. RoyChowdhury।

১২। ” ” ”

১৩। ভারত কোষ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ)

১৪। Political History of Ancient India
—Dr. H. C. RoyChowdhury।

১৫। গৌড় কাহিনী —শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ।

১৬। গৌড় কাহিনী —শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ।

১৭। The Classical Accounts of India (Justin)
—Dr. R. C. Majumdar।

১৮। অশোকের বাণী —ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার।

১৯। Studies in Indian Polity (Epochs in Indian History)
—Dr. Bhupendra Nath Datta।

২০। উত্তর বঙ্গের ইতিহাস —সুকুমার দাস।

২১। বাংলার ইতিহাস —রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

২২। Political History of Ancient India.
—Dr. H. C. RoyChowdhury।

২৩। বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন ইতিহাস) —ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।

গঙ্গারিডি তথা বাঙ্গালীর প্রথম বিদ্রোহ ও তার ফলাফল

বাঙ্গালী যে বিদ্রোহী তা শুধু একালেই নয়, চিরকালই। গঙ্গারিডি তথা প্রাচীন বাঙ্গালী (তখনও বাংলা ভাষাভাষী বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি হয় নি) প্রায় ছ'শ বছর কি তার বেশীই আর্যধর্মের প্রবল বন্যাকে প্রতিরোধ করেছিল। কিন্তু পরে আর্যদের কাছে যে পরাজয় স্বীকার করেছিল, তা বস্তুতঃ সাংস্কৃতিক।

আর্যদের সাংস্কৃতিক বিজয়ের আগে আর্য ব্রাহ্মণদের বেশ অনেকখানি আপোষ করতে হয়েছিল এখানকার বৌদ্ধধর্ম, তন্ত্রধর্ম, শিব, শক্তি, বিষ্ণু প্রভৃতির সঙ্গে এবং বহুদিন প্রচলিত বিভিন্ন আচারের ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে। এমনকি মাগধী প্রাকৃত থেকে যে আর্য ভাষা বাংলা উদ্ভূত হয়েছিল, প্রথম থেকেই সেই ভাষা অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় শব্দ-সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েছিল।

গঙ্গারিডি জাতির তথা বাঙ্গালীর যে বিক্ষোভ আর্যধর্মাবলম্বী অভিজাত ও কুলীনদের বিরুদ্ধে সেই যুগে বিস্ফুরিত হয়েছিল, তা আগেই বিবৃত হয়েছে। গঙ্গারিডিরা প্রাসীর (মগধ) সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সিন্ধু নদের অববাহিকা ব্যতীত প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্তই জয় করেছিল। পূর্বতন আর্য রাজ্য, যথা মৎস্য, কুরু, পাঞ্চাল, শূরসেন, কোশল, কাশী, মিথিলা, সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল।

পরবর্তীকালে অর্থাৎ মৌর্যেদের যুগে আর মৎস্য, শূরসেন, কুরু, পাঞ্চাল, কোশল, কাশী প্রভৃতি মধ্যদেশীয় আর্য রাষ্ট্রগুলির সন্ধান পাই না। তখন মালব, থানেশ্বর, কনৌজ, গৌড় প্রভৃতি রাজ্যের অভ্যুদয় হয়েছে। কিন্তু গঙ্গারিডির নাম গ্রীক ও লাতিন ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক প্রভৃতিদের সাক্ষ্যে অন্ততঃ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। গঙ্গারিডি যে শেষের দিকে মগধ সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, এ কথাও বোঝা যায়।

আমরা সমসাময়িক তথ্য থেকে যা জানতে পারি তার থেকে এই কথা সহজেই অনুমেয় যে শূদ্র মহাপদ্ম নন্দের বিক্ষোভ, সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং রাজ্য বিজয় অন্ততঃ মধ্যদেশে এবং প্রাচ্যদেশে এক মহাশক্তিশালী রাষ্ট্রতন্ত্র গঠনের মধ্যে পরিণতি লাভ করেছিল। ইংরাজ যেমন প্রথমে বাংলা ও পরে বিহার ও উড়িষ্যার সম্পদে সমৃদ্ধ ও বলশালী হয়ে ক্রমশঃ সমগ্র ভারতবর্ষ অধিকার করেছিল, মহাপদ্ম নন্দও ইংরাজদের ভারত জয়ের প্রায় বাইশ / তেইশ শত বছর আগে তেমনই গঙ্গারিডি ও প্রাসীর কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যসমৃদ্ধ ঐশ্বর্য্য করায়ত্ত করে, উত্তর ভারতের প্রায় গরিষ্ঠ অংশই বশীভূত করেছিলেন।

এই কৃতিত্বের ফলে এবং গুরু করভার স্থাপন করে প্রজাদের শোষণের দ্বারা, তিনি এবং তাঁর পুত্রেরা প্রভূত সম্পত্তি এবং সামরিক শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। নন্দরাজগণ অপরিসীম ধনসম্পদের অধিকারী ছিলেন। বোধহয় এই জন্যও তাঁদের প্রজাদের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল। কারণ, এই ধনরত্ন হয়তো প্রজাপীড়নের দ্বারা

সংগৃহীত হয়।"[১] কথা-সরিৎ সাগর, হিউ-এন-সাঙ, সিংহলীয় প্রাচীন কাহিনী প্রভৃতি সূত্রগুলি নন্দরাজাদের প্রভূত ধনসম্পত্তির সাক্ষ্য প্রদান করে।

শুধু শোষণের কারণেই যে নন্দরাজগণ প্রজাদের কাছে অপ্রিয় হয়েছিলেন, এমন মনে হয় না। বৈদেশিক সাক্ষ্য অনুযায়ী প্রজাদের নিকট তাঁরা বিদ্বেষ ও ঘৃণার পাত্র ছিলেন। এই ঘৃণা তাঁদের শূদ্রত্বের কারণে, অর্থাৎ কৌলীন্যের অভাবের জন্য হবার এবং মগধ রাজ্যে তথা পাটলিপুত্রে অনধিকার প্রবেশের জন্যও হবার সম্ভাবনা ছিল। তাঁরা বলপূর্বক ক্ষত্রিয় রাজবংশকে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন। মগধবাসীর ঘৃণা ও বিদ্বেষ সেই কারণেও তাঁদের উপর পুঞ্জীভূত হয়ে থাকতে পারে।

যাই হোক, প্রভূত সম্পদশালী শেষ নন্দরাজার[২] অধীনে গঙ্গারিডি এবং প্রাসী সুসংবদ্ধভাবে এবং সম্মিলিত শক্তিতে পরোক্ষভাবে প্রবল বৈদেশিক শত্রু আলেকজান্ডারকে বিনা যুদ্ধেই ভারত থেকে বিতাড়িত করেছিল। সুতরাং এটা ইতিহাসগতভাবে সত্য যে মহাপদ্ম নন্দকে বাঙ্গালী মনে করলে, বাঙ্গালীর প্রথম বিদ্রোহ এবং তার ফলস্বরূপ বিরাট রাষ্ট্রবিপ্লবই তদানীন্তন ভারতকে অসাধারণ রণশক্তিসম্পন্ন ও প্রতাপান্বিত বৈদেশিক আক্রমণকারীর কাছে পরাজয় এবং নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে আর্যাবর্তে মহাপদ্ম নন্দের সার্বভৌম নৃপতির (একরাট) আখ্যা অর্জন অন্য আর এক দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। মহাভারতীয় যুগে এবং তার পরেও আমরা লক্ষ্য করেছি যে প্রচলিত ক্ষত্রিয় বিধি অনুযায়ী সার্বভৌম নরপতি সামন্ত তথা অধস্তন নৃপতিদের রাজ্যচ্যুত করতেন না। তাঁদের রাজ্য ও সিংহাসন বজায় থাকতো, যদিও তাঁদের অধীন রাজ্য বলে গণনা করা হতো। কিন্তু বিদ্রোহী মহাপদ্ম নন্দ এই ক্ষত্রিয় বিধি পালন করেন নি।

মহাপদ্ম নন্দের শূদ্রত্ব তাঁকে এই বিষয়ে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করেছিল। যতদূর জানা যায়, তিনি প্রাচীন ক্ষত্রিয় বংশগুলি নির্মূল করেছিলেন। উত্তর ভারতের এক বিশাল অংশ পুনরায় একবার নিঃক্ষত্রিয় হয়েছিল। এই কারণে, বঙ্গদেশে মাহিষ্য, কৈবর্ত প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জাতিরা প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং পরে কতগুলি রাজবংশেরও সৃষ্টি হয়েছিল।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে প্রাচীন কলিঙ্গ জাতিই (যার মধ্যে গঙ্গারাঢ়ী জাতিও অন্তর্ভুক্ত) বঙ্গদেশের এই মাহিষ্য কৈবর্ত প্রভৃতির সমগোত্রী। পরবর্তী সময়ে এই জাতিগুলিই বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজপুতানায় রাজপুত জাতি নামে পরিচিত হয়েছিল।

ঐতরেয় আরণ্যকে "বঙ্গ-মগধ-চের জনপদ" উল্লেখের আবরণে এই রাজ্যগুলি এবং তাদের অধিবাসীদের প্রতি কটূক্তির প্রয়োগ আর্যদের চোখে এদের হীনত্বই প্রতিপন্ন করে। চের শব্দটি ছোটনাগপুরের পাহাড়ী আদিবাসী ওঁরাও চের প্রভৃতি জাতিদের নাম বলেই মনে হয়। এরা বিহার ও ছোটনাগপুরের কৃষিজীবি গোষ্ঠী, কিন্তু এরাও পরবর্তীকালে জাতিগতভাবে উন্নত হয়েছিল।

আর্য ও অনার্যের সংমিশ্রণে নতুন সামাজিক কাঠামো গঠন ও নিয়ন্ত্রণের সময়ে, মাহিষ্য, কৈবর্ত, বাগদী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য যুগের ব্রাত্য ও হীনগণ্য জাতিগুলি উচ্চমানের হিন্দুরূপে পরিগণিত হয়েছিল। 'ডালটন বলেন এরা এক সময়ে বাস করতো গাঙ্গেয় উপত্যকায়, এখন এদের অনেকে হয়েছে রাজপুত (vide Risley—The tribes and castes of Bengal PP 199-201)', একথা উল্লেখ করেছেন ডঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত, তাঁর "বাংলার ইতিহাস" (আর্যযুগ) গ্রন্থে।

বিদ্রোহী গঙ্গারিডির গৌরবময় কাহিনীর প্রথম অধ্যায় নন্দ সাম্রাজ্য উচ্ছেদের সঙ্গে শেষ হয়েছিল। কিন্তু বাঙ্গালীর বিদ্রোহ পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিকেও প্রভাবিত করেছিল। বঙ্গদেশ ব্যতীত কলিঙ্গদেশেও অক্ষাত্রিয় রাজবংশের উদ্ভব হয়েছিল। খারবেলের মতো বীর্যবান এবং ক্ষমতাসম্পন্ন নরপতি পুরাতন ক্ষাত্রিয় বংশের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল।

কলিঙ্গের এই তৃতীয় রাজবংশকে অনেকেই দ্রাবিড়জাতির অন্তর্গত বলে বিবেচনা করেছেন।[৪] যখন মগধের সিংহাসনে শুঙ্গবংশীয় (ব্রাহ্মণ) নৃপতি অধিষ্ঠিত, খারবেল কলিঙ্গ থেকে মগধ আক্রমণ করেছিলেন। এই আক্রমণ একাধিকবার সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং এই যুদ্ধ এবং খারবেল কর্তৃক পাটলিপুত্রের সুগাঙ্গেয় প্রাসাদ অধিকার,[৫] এই গঙ্গারিডি কর্তৃক প্রবর্তিত বিদ্রোহের ধ্বজার পুনরুত্তোলন বলেই মনে হয়। কলিঙ্গে তখন জৈন ধর্ম প্রবল, সুতরাং ব্রাহ্মণ বিরোধিতার তরঙ্গ যে তীব্র প্রতিশোধের আকারে মগধের উপর প্রবাহিত হবে, এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

কিন্তু এর অনেক আগে, মগধেই এই পূর্ব বিদ্রোহের স্পর্শ এক তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মগধের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের সক্রিয় সহযোগিতায় এবং এক অতি বিচক্ষণ এবং কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণের পরিচালনায় তথাকথিত 'নাপিত পুত্রের' বংশকে পরাজিত করে মগধের সিংহাসন অধিকার করেছিলেন, সন্দেহ নেই। চন্দ্রগুপ্তের আর্য কৌলীন্যের দাবি কতখানি সত্য তা নির্ণয় করা কঠিন। অনেক ঐতিহাসিকই চন্দ্রগুপ্তের ক্ষত্রিয়ত্ব অসার বলেই বিবেচনা করেছেন এবং চন্দ্রগুপ্তকে মহাপদ্ম নন্দের শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান বলেছেন।[৬]

পুরাণে মৌর্যদের শূদ্র বলা হয়েছে।[৭] মুদ্রারাক্ষস (খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বিশাখা দত্ত প্রণীত) নাটকে চন্দ্রগুপ্তকে বৃশাল (শূদ্র) বলা হয়েছে। এবং চণ্ডীতে (মার্কণ্ডেয় পুরাণের একটি অংশ) মৌর্যদের দৈত্য বলা হয়েছে।[৮] সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও তাঁর বংশধরদের শূদ্র অথবা অন-আর্য বলাই সঙ্গত। সিংহলের প্রাচীন কাহিনী 'মহাবংশে' এবং গ্রীক লেখক জাষ্টিনের বর্ণনায় চন্দ্রগুপ্তের হীন জন্মের পরিচয় পাওয়া যায়।[৯]

আমরা জানি মহাপদ্ম নন্দকেও পুরাণে শিশুনাগ বংশীয় রাজা মহানন্দীর শূদ্রা স্ত্রীর সন্তান বলে নির্দেশ করা হয়েছে। অবশ্য এবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, সে বিষয়ে আগেই আলোকপাত করা হয়েছে। যাই হোক, মহাপদ্ম নন্দ যেমন দ্রাবিড়-রক্তসম্ভূত ছিলেন বলেই ইতিহাসগতভাবে অনুমান করা যায়, তেমনই একথাও বলা যায় যে মহাপদ্ম নন্দের পৌরাণিক জন্মবৃত্তান্ত সত্য হলে, তিনি পিতৃ পরিচয় (রাজ-

বংশীয়) ত্যাগ করে, নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চন্দ্রগুপ্তও নন্দবংশের পিতৃগৌরব ত্যাগ করে মৌর্যবংশের পত্তন করেছিলেন। মুরার (চন্দ্রগুপ্তের মায়ের নাম) পুত্র বলে মৌর্যবংশ নাম হয়েছিল (মুদ্রারাক্ষস দ্রষ্টব্য)। এই সবের মধ্যেই বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ নিহিত ছিল।

মনে হয় মহাপদ্ম মাতৃনামে নতুন বংশ স্থাপন করেছিলেন, কারণ দ্রাবিড়রা মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অধীন ছিল। চন্দ্রগুপ্তেরও অনুরূপভাবে অনার্য (দ্রাবিড়) বংশ থেকে উদ্ভূত হওয়ার সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করা যায় না। কেন যায় না, তার অন্য কারণও আছে।

চন্দ্রগুপ্ত এক আর্য ব্রাহ্মণের নির্দেশে এবং প্রভাবে আর্যীভূত মগধের অধিপতি হয়ে পাঞ্জাবসহ আর্যাবর্ত এবং দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অংশের অধীশ্বর হয়েছিলেন। অবশ্য এই সাম্রাজ্যের অনেকটাই তিনি নন্দদের কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন। মেগাস্থিনিসের এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বিবরণ থেকে লক্ষ্য করা যায় যে বিজিত রাজ্যগুলি শাসনের জন্য মৌর্য সম্রাট কতগুলি রাজপ্রতিনিধির পদ সৃষ্টি করে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম—চারটি মূল কেন্দ্র থেকে সাম্রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন।[২০]

মৌর্যসম্রাটের পুত্র এবং নিকট আত্মীয়দের এই প্রতিনিধিদের পদে অভিষিক্ত করা হয়েছিল বলেই জানা যায়। অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য আদি ক্ষাত্র বিধি অমান্য করেছিলেন এবং বোধহয় নিজের শূদ্রত্বের কারণেও বিজিত রাজ্যের নরপতিদের উচ্ছেদ করেছিলেন। অবশ্য সম্রাটের প্রভাবাধীন নরপতিদের অস্তিত্ব কোথায়ও কোথায়ও ছিল। সুতরাং মহাপদ্ম নন্দের ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং সংগ্রাম পুরানো আর্যক্ষত্রিয় ঐতিহ্যকে চূর্ণ করে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তাঁর ব্রাহ্মণ মন্ত্রী চাণক্যের প্রভাবে এবং মগধের আর্য উচ্চকোটীর সমর্থনে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলেই অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু শেষ বয়সে তিনি জৈন ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ইতিহাস বলে যে তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করে গুরুর সমভিব্যাহারে দাক্ষিণাত্যে গিয়েছিলেন এবং সেইখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজ্যত্যাগের পিছনে কতগুলি প্রবল কারণ ছিল, মনে করা যেতে পারে। এক, তিনি ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর সহায়তায় মগধ রাজ্য জয় এবং সাম্রাজ্য বিস্তার করলেও আর্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের নিকট যথোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হন নি। দুই, তিনি আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপর বিতৃষ্ণ হয়েছিলেন এবং সারা জীবন যুদ্ধ ও বিগ্রহের বিভীষিকায় জর্জরিত হয়ে শেষ বয়সে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন। তিন, তিনি জৈন ধর্মের অহিংসা এবং অন্যান্য মানবিক নীতিগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে জৈন আচার্য ভদ্রবাহুর সঙ্গে শ্রাবণ বেলগোলার জৈন তীর্থে শেষ জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। জৈনদের রীতি অনুসরণ করে অনশন ব্রতের মাধ্যমে চন্দ্রগুপ্ত মৃত্যুবরণ করেছিলেন। পরবর্তী কালের জৈন গ্রন্থাদি থেকে আমরা এই বৃত্তান্ত জানতে পারি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন পরমতসহিষ্ণু এবং নিজের ধর্ম তিনি প্রজাদের উপর চাপাতে আগ্রহী ছিলেন না। গঙ্গারিডি রাজ্য সম্পূর্ণরূপে তাঁর বশীভূত না হলেও তিনি উত্তরবঙ্গে গৌড় ও পুণ্ড্রবর্ধনসহ পুণ্ড্রদেশে কর্তৃত্ব বিস্তার করেছিলেন।[১১] খুব সম্ভবতঃ এই গঙ্গারিডির প্রভাব এবং পুণ্ড্রবর্ধনে জৈনধর্মের প্রতিপত্তি তাঁকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির নাগপাশকে ছিন্ন করে জৈন সন্ন্যাসীর প্রবজ্যা গ্রহণে প্রণোদিত করেছিল।

আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে গঙ্গারিডি প্রথমেই যে বিদ্রোহের বীজ বপন করেছিল, এই বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ চন্দ্রগুপ্তের এই জৈন ধর্ম গ্রহণের মধ্যেও প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম মগধে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা সম্পূর্ণভাবে না হারালেও, জাতিভেদহীন অবৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতি পুনরায় উজ্জীবিত হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসারও ব্রাহ্মণ্যধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায় না। সুতরাং আর্য ক্ষত্রিয় শিশুনাগ বংশের পতনের পরে মগধের নরপতিরা আর কেউই আর্যধর্মাবলম্বী হন নি। নন্দবংশীয়দের কথা বাদ দিলেও, চন্দ্রগুপ্তও নন, বিন্দুসারও নন, এমনকি অশোকও নন।

যতদূর জানা যায়, অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার আগে শৈবধর্মাশ্রয়ী ছিলেন।[১২] সুতরাং মগধের অধিকাংশ লোকই ইতিমধ্যে বংশ পরাম্পরায় আর্যধর্ম গ্রহণ করলেও, গঙ্গারিডিদেশভুক্ত মহাপদ্ম নন্দ কর্তৃক প্রভাবিত মগধের কেন্দ্রীয়রাজশক্তি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করেন নি এবং মৌর্যেরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধিতা না করলেও মগধকে সম্পূর্ণভাবে আর্যীভূত হতে সাহায্য করেন নি। সেই কারণে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে ও সাহিত্যে মগধের ললাটেও কলঙ্ক লেপিত হয়েছিল।

কলিঙ্গবাসীদের এক অংশ বৃহৎ বঙ্গেরই অধিবাসী। গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়দের কথা স্বতঃই আমাদের মনে উদয় হয়। গঙ্গারিডি ও প্রাসী যুক্তভাবে ভারতকে বিদেশী শত্রুর গ্রাস থেকে রক্ষা করেছিল। বাঙ্গালীর বিদ্রোহ এই গৌরবময় ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছিল—একথা স্বীকার করতেই হবে। তেমনই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পৌত্র চণ্ডাশোকের উৎপীড়ন, অত্যাচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ী প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল। এই যুগ্মশক্তি অথবা জাতি এক চুক্তির দ্বারা শক্তি বৃদ্ধি করে, এই দুর্জয় দেশীয় শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল এবং সেই গর্বিত ও নির্দয় সম্রাটের ক্ষমতাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছিল।

মদমত্ত ও স্বৈরাচারী অশোক এই সবল ও দুর্বিনীত শত্রুকে উপেক্ষা করেন নি। আরও করেন নি এই কারণে যে এদের দর্প চূর্ণ না করলে, হয়তো মৌর্য সম্রাটের খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে যথেষ্ট আঘাত আসতে পারতো। কিন্তু অশোকের উৎপীড়ন ও অত্যাচার মূলতঃ ব্রাহ্মণদের এবং আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসারের বিরুদ্ধে। অশোক জৈনদের উপরও অত্যাচার করেছিলেন বলে জানা যায়।[১৩]

আগেই বলা হয়েছে যে মৌর্য সম্রাট অশোকের সৈন্য গঙ্গারিডদের পীড়ন ও শোষণ করেছিল এবং কলিঙ্গ যুদ্ধের অভিযানের সময়ে গঙ্গারিডির এক বিশাল ভূখণ্ড দগ্ধ

করেছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিমতে অশোকের মৃত্যুর অল্প পরে তাঁর দুর্বল উত্তরাধিকারীদের সময়ে মৌর্য বংশের পতন হয়েছিল মূলতঃ ব্রাহ্মণদের উপর নিপীড়নের প্রতিবাদে।[২৭] বাঙ্গালী গঙ্গারিডি নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের সামিল হয়েছিল।

সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ যুদ্ধের আবশ্যকতা এবং সঠিক কারণ সম্বন্ধে ইতিহাসগত যথার্থ অনুসন্ধান এখনও হয় নি বলেই মনে করা যেতে পারে। অশোকের নিজের শিলালিপি এবং অনুশাসনগুলি থেকেও এ বিষয়ে কোন স্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। কলিঙ্গ দেশের ধৌলী এবং জৌগড়ায় যে শিলাস্তম্ভগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলি কলিঙ্গ যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট না হলেও অপ্রত্যক্ষভাবে অল্প কিছু আলোকপাত করে।

বারো সংখ্যক শিলালিপিতে রাজা প্রিয়দর্শী (অশোক) যা বলেছেন, তাতে তাঁর ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য ব্যক্তিগত অনুশোচনাও প্রতিফলিত। এর থেকে অনুমান করা যায় যে তিনি কলিঙ্গবাসীদের শক্তি ও সামর্থ্যে, এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানের আশঙ্কায় ক্রুদ্ধ এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে এই রাজ্যকে বশীভূত করতে কৃতসংকল্প হন। কিন্তু এই কথাও মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে তিনি কলিঙ্গ যুদ্ধের প্রাণী হত্যায় এবং রক্তক্ষয়ে গভীরভাবে মর্মাহত এবং অনুতপ্ত হয়ে তাঁর নিজের ধর্মীয় গোঁড়ামীকেই নিন্দা করেছিলেন। হয়তো কলিঙ্গবাসীদের জৈন ধর্মের প্রতি আনুগত্য, শৈবধর্মী এবং পরে ক্রমশঃ তথাগতের বৌদ্ধধর্মে আশ্রয়লাভের বাসনাকারী মৌর্য সম্রাট অশোকের কলিঙ্গবাসীদের শাস্তি বিধান করার এক অতিরিক্ত কারণ হিসেবে উপস্থিত হয়েছিল। অন্যথায় কেন তিনি বলবেন—"কোন ব্যক্তি তার নিজের ধর্মকেই উচ্চভাবে প্রশংসা করবে না। যদি প্রয়োজনবোধে কখনও এমন করতে হয়, তবে সে তার ভাষায় খুব সংযত হবে, অর্থাৎ মধ্যপন্থী হবে। অন্যান্য ধর্মের উৎকৃষ্ট দিকগুলির জন্য সে তাদের শ্রদ্ধা করবে..." (বারো সংখ্যক শিলালিপির কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ)।

সম্রাট অশোকের তের সংখ্যক শিলালেখ থেকে জানা যায় যে—"তাঁর রাজ্যাভিষেকের নবম বছরে তিনি কলিঙ্গ জয় করেছিলেন। সেই যুদ্ধে দেড় লক্ষ লোককে বন্দী করা হয়েছিল, এক লক্ষ লোক যুদ্ধে নিহত হয়েছিল এবং এর বহুগুণ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। তখন থেকেই সেই বিজয়ের ফলস্বরূপ দেবানাম প্রিয় সেই পবিত্র ধর্ম রক্ষায় এবং এই ধর্মের প্রতি ভালোবাসায় তার প্রচারের জন্য অতিশয় তৎপর হয়েছেন।"

সম্রাট অশোকের উপর্যুক্ত ত্রয়োদশ মুখ্য গিরিশাসন (শাহবাজগঢ়ী) পাঠ থেকে জানা যায় "কোন অবিজিত দেশ জয় করতে হলে সেখানে যত মানুষ নিহত হয়, মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং বন্দী অবস্থায় নির্বাসিত হয়, তা আজ দেবপ্রিয় অত্যন্ত বেদনার বিষয় ও গুরুতর ব্যাপার মনে করেন।......" পাঠ—"অশোকের বাণী"—ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার।

সম্রাট অশোকের এই শিলালিপি থেকে অনুমান করা যায় যে এই নির্বাসিত জন-

সমষ্টি সাম্রাজ্যের কোন জনবিরল অংশেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই নির্বাসন দণ্ড[২৫] কলিঙ্গী ও গঙ্গারিডিদের হীনবল করার উদ্দেশ্যেই প্রদত্ত হয়েছিল সন্দেহ নেই।

আধুনিক রাজস্থানের গঙ্গানগর, কালিবঙ্গ প্রভৃতি স্থানে এবং বর্তমান নাসিকের, হায়দ্রাবাদের, রাজস্থানের এবং বারাণসীর গঙ্গাপুর নাম, গ্রাম / শহরের মধ্যে এই সকল হতভাগ্য নির্বাসিতেরা স্থানান্তরিত হয়েছিল বলে মনে করা অসঙ্গত নয়। গাঙ্গেয় ভূমি থেকে এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করা হলেও, তারা তাদের নতুন উপনিবেশগুলিতে 'গঙ্গা' নামটি বহন করে নিয়ে গিয়েছিল, যেমন ভাবে আর্যেরা ভারতে আসার আগে আফগানিস্থানের পূর্বাঞ্চলে "হরখৈবতী" (জেন্দ আবেস্তা গ্রন্থে উল্লিখিত) নদীর তীরে বসবাসের স্মৃতি বহন করে এনে পঞ্চনদের এক নদীকে সরস্বতী নামে অভিহিত করেন।[২৬]

এই স্থানে অশোকের ত্রয়োদশ মুখ্যশাসন এক বিরাট জনগোষ্ঠীর নির্বাসনের যে ইঙ্গিত প্রদান করে, সেই সমন্ধে কিছু মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই স্থান পরিবর্তন বা অভিবাসনের ইঙ্গিত অশোকের শিলালেখে 'অপবুধি' শব্দটির মধ্যে নিহিত আছে।[২৭] কলিঙ্গীদের (গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ী সহ !) হীন বল করার উদ্দেশ্যে সেই দেশের যুদ্ধক্ষম জনসংখ্যাকে হ্রাস করার কুটনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে আধুনিক ভারতে ইংরাজদের বঙ্গ বিভাগের ব্যবস্থার তুলনা করা চলে।

এই সব লিপিবদ্ধ উক্তি থেকে স্বাভাবিকভাবে সম্রাট অশোকের মনের অনুশোচনা এবং অহিংস বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের ইচ্ছার মধ্য দিয়ে তথাগতের প্রেম ও মৈত্রীর বাণী সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের ঐকান্তিক বাসনাও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কলিঙ্গবাসীদের দুঃখ, দুর্দশা এবং ভয়াবহ মৃত্যুর বৃত্তান্ত, মানুষের হৃদয়ে বেদনার সঞ্চার করে। ইতিহাস বলছে হতাহত ছাড়াও কলিঙ্গে দেড় লক্ষ লোক বন্দী হয়েছিল। অনুমান করা যেতে পারে যে এই বিরাট সংখ্যক যুদ্ধবন্দীদের অন্যস্থানে প্রেরণ করা হয়েছিল—সম্রাট অশোক তাদের বন্দী করে কখনই তাদের নিজের দেশেই বাস করার সুযোগ দেন নি। দিলে শত্রুর হাতকে শক্তিশালী করাই হোতো।

সুতরাং সম্রাটের হৃদয়ের পরিবর্তনের সূত্রপাত এই কলিঙ্গ বিজয়ের গ্লানি থেকে হলেও, কলিঙ্গবাসীদের ব্যাপক ধ্বংস ও মৃত্যু কিন্তু তাদের হৃদয়ে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীকালে মৌর্য্য বংশের পতনের পরে মগধ সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কলিঙ্গবাসীরা রাজা খারবেলের অধীনে অশোকের এই অত্যাচার এবং নৃশংসতার প্রতিশোধ নিয়েছিল।

কিন্তু এই বিদ্রোহী এবং নির্ভীক কলিঙ্গবাসীরা গঙ্গারিডিদের সঙ্গে এক যুক্ত রাষ্ট্রের পরিকল্পনার মধ্যে সৌহার্দ এবং মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। প্লিনীর বিবরণে আমরা যে গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ীদের সম্মিলিত অস্তিত্বের কথা জানতে পারি, তা হয়তো অশোকের রাজত্বকালে বা তার আগে থেকেই ছিল।

অশোকের কোন শিলালিপি অথবা অনুশাসন বঙ্গদেশে কুত্রাপি পাওয়া যায় নি। চন্দ্রগুপ্তের বঙ্গদেশ বিজয়ের কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয় নি। যদিও এ'কথা মনে

করা অসঙ্গত নয় যে মহাপদ্ম নন্দের গঙ্গারিডি রাজ্য হয়তো চন্দ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু, চন্দ্রগুপ্তকে গঙ্গারিডির অধিপতি কুত্রাপি বলা হয় নি।

অন্য দিকে. বিন্দুসার উত্তরবঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[১৮] এর থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে অন্ততঃ পুন্ড্রদেশ মৌর্যদের অধীনেই ছিল, যদিও বঙ্গদেশে মৌর্যদের কোন আঞ্চলিক শাসনকেন্দ্র ছিল বলে জানা যায় যায় না। তবে, মগধ সাম্রাজ্যের 'খাস' সীমানার মধ্যে গঙ্গারিডি (বঙ্গদেশ) অন্তর্ভুক্ত হওয়া আশ্চর্য ছিল না, এবং এই ভাবে এই দেশ সম্রাট কর্তৃক শাসিত হতো।

অথবা, অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের পরে, কলিঙ্গের সরকারী শাসনকেন্দ্রের (তোসালি) সঙ্গে হয়তো বঙ্গদেশের কোন কোন অংশ যুক্ত ছিল, যেমন গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থ গঙ্গারিডি দেশ। রাঢ় দেশের কিছু অংশ পরে কলিঙ্গ দেশ অধিকার করে ছিল বলেই জানা যায়। এই সময় থেকেই, এবং বিশেষ করে কলিঙ্গ যুদ্ধের পরে পুনরায় স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে মগধের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং উৎপীড়নের প্রতিবাদে গঙ্গারিডি এবং কলিঙ্গের মধ্যে এক আত্মরক্ষামূলক মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে উঠে থাকবে।[১৯]

গঙ্গারিডিদের অন্যতম রাজধানী গঙ্গে নগর ও বন্দর মৌর্যদের প্রভুত্বের অবসানেই ক্রমশঃ খ্যাতি অর্জন করে বিদেশীদের চোখে প্রায় তাম্রলিপ্তের সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে অন্ততঃ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত কলিঙ্গের সীমা গঙ্গা নদী থেকে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[২০]

কলিঙ্গে এবং বঙ্গদেশে মগধের অন্যায় উৎপীড়ন এবং অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা এবং বিদ্রোহীভাব পোষণ বাঙ্গালীর জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও উদারনৈতিক মানসিকতা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। সুতরাং এসব ঘটনা পরম্পরায় গঙ্গারিডির অধিবাসীদের অশান্ত ও নির্ভীক চিত্তেরই প্রতিফলন হয়েছে।

প্রাগার্য বাঙ্গালীর দেহস্থিত লোহিতকণায় যে অষ্ট্রিক দ্রাবিড় প্রভৃতির উপাদান ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হয়েছিল, তারই বিস্ফোরণ ঘটেছে যখন আর্যদের রাষ্ট্রীয় শক্তি, সংস্কৃতি এবং চাতুর্বর্ণ্যের আগ্রাসী প্রবৃত্তির প্রতি বিরূপতা তাদের মনকে বিক্ষিপ্ত করেছে। ভারতের ইতিহাসে আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতিকে এত বেশী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন আর কোথায়ও হতে হয় নি। সেই হিসেবে গঙ্গারিডির প্রথম বিদ্রোহ এবং বিপ্লব ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নির্দেশিকা

১। পালপূর্ব যুগের বংশানুচরিত —ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার।

২। Political History of Ancient India (The Nandas) —Dr. H. C. RoyChowdhury.

"For contemporary reports we must turn to Greek writers. There is an interesting reference, in the

cyropaedia of Xenophon who died some time after 355 B C 'to the Indian King, a very wealthy man··"

৩। বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) —ধনঞ্জয় দাশ মজুমদার।

৪। History of Orissa —R. D. Banerjee.

৫। Do Do Do

৬। Cambridge History of India (Vol I) —E. J. Rapson

৭। বিষ্ণুপুরাণ —কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন (অঃ)

৮। Studies in Indian Social Polity —Dr. Bhupendra Nath Datta.

৯। Classical Accounts of India—(Justin) P. 193. —Dr. R. C. Majumdar.

১০। The Early History of Bengal (Candragupta) —F. J. Monahan.

The Central Government of Pataliputra (united Provinces and Bihar), the viceroyalties of Taksasila (the Punjab), Avanti or Ujjayini (western and central India, north of Tapti) and Kalinga (Orissa and the Ganjam District of Madras).

১১। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গৌড় এবং পুণ্ড্রের নাম উল্লেখ করেছে।

১২। মেদিনীপুরের ইতিহাস—(হিন্দু রাজত্ব-তাম্রলিপ্ত রাজ্য) —যোগেশ চন্দ্র বসু।

১৩। Vincent A. Smith —Asoka.

১৪। প্রাচীন বাংলার গৌরব —মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

১৫। বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাস —ধনঞ্জয় দাশ মজুমদার।

১৬। "হরধৈবতী" নদীর কথা শ্রীঅমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণের "সরস্বতী" নামক পুস্তকে বলা হয়েছে!

১৭। Asoka Maurya —B. H. Gokhale.

১৮। বাংলার সামাজিক ইতিহাস —ডঃ অতুল সুর।

১৯। Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal (Pre Muhammedan epochs) —Benoy Chandra Sen.

২০। History of North Eastern India —Dr. R. G. Bysack.

ইতিহাসের সন্ধানে

গঙ্গারিডির ইতিহাস প্রাচীন বাঙ্গালীর ইতিবৃত্ত ব্যতীত আর কিছুই নয়। অব্রাহ্মণ শূদ্র নরপতি মহাপদ্ম নন্দের পুত্র ধন নন্দ (সিংহলীয় প্রাচীন কাহিনী অনুযায়ী) যে ব্রাহ্মণ চাণক্যকে (কৌটিল্য) উপহাস, বিদ্রূপ ও অপমানে জর্জরিত করেছিলেন, এতে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই। নন্দবংশীয়েরা প্রচণ্ড ব্রাহ্মণবিদ্বেষী ছিলেন এবং খুব সম্ভবতঃ তাঁরা জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন, এবং সেই কারণে ব্রাহ্মণদের চোখে ঘৃণ্য ছিলেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও নন্দদের প্রতি অশ্রদ্ধাসূচক উক্তি আছে। নন্দদের বাঙ্গালীত্বের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ না থাকলেও, এই কথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয় যে পুরাণের সাক্ষ্য অনুযায়ী প্রথম নন্দ অর্থাৎ মহাপদ্ম নন্দ একজন ভাগ্যান্বেষী রাজা ছিলেন এবং মহাপদ্মের সেই রাজশক্তি মগধ থেকে উদ্ভূত হয় নি।

মগধবাসীর চক্ষে তিনি ছিলেন নাপিতপুত্র অথবা শূদ্র এবং আর্যধর্ম বহির্ভূত। সুতরাং মহাপদ্ম নন্দের পক্ষে বঙ্গভূমি থেকে উদ্ভূত হওয়াই সম্ভব এ কথা আগেই বলা হয়েছে।

মধ্যদেশীয় (পঞ্চনদ থেকে প্রয়াগ পর্যন্ত) আর্যদের চক্ষুশূল ছিল এই বাঙ্গালীরা, যাদের প্রাক্-আর্য ধর্ম, সংস্কৃতি, সমৃদ্ধি কোন অংশেই আর্যদের অপেক্ষা কম ছিল না। কিন্তু বাঙ্গালী চাতুর্বর্ণ্য, তথা জাতিভেদ স্বীকার করতো না এবং মাছ, মাংস ইত্যাদি আহার্যরূপে গ্রহণ করতো। আর্যশাস্ত্রে, সাহিত্যে ও পুরাণে তাই বাঙ্গালীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের কোন নির্ভরযোগ্য বিবরণ নেই। সেই কারণেই বাঙ্গালীর প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান অত্যন্ত অল্প এবং সীমাবদ্ধ।

বঙ্গদেশের ইতিহাসের ছিন্নসূত্র জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে ও সাহিত্যের মধ্যে অন্বেষণ করতে হবে। পরবর্তী সময়ে, যেমন অশোকের শিলাস্তম্ভে, বাঙ্গালীর তেমন কোন উল্লেখ নেই। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণয়নে চিরাচরিত পদ্ধতিরই অনুসরণ করেছেন, কারণ তাঁদের অধিকাংশই মনে করেছেন যে প্রাচীন বাঙ্গালীর কোন ইতিহাস নেই।

দুঃখের কথা, অনেকে এ কথাও বিশ্বাস করেছেন যে সেই যুগে বাঙ্গালী, বিশেষ করে গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী রাঢ়দেশের অধিবাসী অসভ্যতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু স্বাধীনোত্তরকালে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার রাঢ় দেশে তথা পশ্চিমবঙ্গে অতি সুদূরকাল থেকে এক উচ্চস্তরের সভ্যতার অস্তিত্বকে স্বীকার করেছে। তমলুক প্রভৃতি স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে অতীতের এমন নিদর্শন পাওয়া গেছে যার থেকে প্রমাণ হয় যে গঙ্গারিডি জনগোষ্ঠী সমুদ্রযাত্রায় পারদর্শী ছিল এবং বৈদেশিক

বাণিজ্যেও লিপ্ত ছিল। ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চল, এমন কি রোমের সঙ্গে পণ্য দ্রব্য বিনিময়ের প্রমাণও পাওয়া গেছে।

সুতরাং শুধুমাত্র রাঢ়দেশকেই গ্রীক ও লাতিন বিবরণে গঙ্গারিডি না বলা হলেও, এই সম্পদশালী, সংস্কৃতিসম্পন্ন, সুসভ্যজাতি-অধ্যুষিত প্রাচীন রাঢ়দেশের একটি প্রধান ভূমিকা সেই বিদেশীদের চোখে অবশ্যই ছিল। গঙ্গানদী তাঁদের ভীষণভাবে আকর্ষণ করেছিল এবং নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় বসবাসকারী গঙ্গারদের (অথবা গঙ্গরীদের) তাঁরা গঙ্গারিডি বলে অভিহিত করেছেন। গঙ্গানদীকে এই দেশের পূর্ব সীমা বলে নির্দেশ করেছেন। বিদেশীদের এই অনুমানের কারণ অত্যন্ত সঙ্গত। এই নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় এই পশ্চিমবঙ্গই অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনকে মানবসভ্যতার উন্নত স্তরের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং সংস্কৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত মন্তব্যের মধ্যে একটি অতিশয় মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়—"বাংলা দেশ বলতে আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে নদ নদীর পলিমাটি দিয়ে তৈরী একটি দেশ। কিন্তু সমগ্র বাংলার ভূভাগ নদীবাহিত পলিমাটি দিয়ে তৈরী নয়। পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলার প্রধান অংশ, বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমান জেলার অনেকটা ভূভাগ বৃষ্টিবায়ু ও হিমবাহ-বাহিত মাটি দিয়ে তৈরী। পলিমাটির দান যা আছে, তাও হিমালয় দুহিতা নদীর প্রাথমিক দান নয়।

হিমালয়-নির্গত নদীধারার আগে বিন্ধ্যপর্বত ও ছোটনাগপুরের পার্বত্য উপত্যকায় উৎপন্ন প্রাচীন নদনদীর পলি দিয়ে তৈরী হয়েছিল প্রাচীন আর্যাবর্তের (উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের) ও পশ্চিমবঙ্গের কিয়দংশ। পশ্চিমবঙ্গ বয়সে অনেক প্রবীণ, ভূতাত্ত্বিক দিগন্ত পর্যন্ত তার জীবনের লীলাক্ষেত্রের সীমানা। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক সংযোগ আদি-প্রস্তর যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত।"[৩]

যেমন পুন্ড্রদেশের ইতিহাস খুঁজতে গেলে আমাদের সুদূর মহাভারতের যুগ পর্যন্ত যেতে হয়, তেমনই রাঢ় অথবা সুহ্ম প্রসঙ্গের ইতিহাসের অনুসন্ধানে আমাদের মহাভারতের সাক্ষ্য থেকেই শুরু করা কর্তব্য। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন সুহ্মাঃ রাঢ়াঃ। মহাভারতে রাঢ়দেশের নামোল্লেখ নেই। রাঢ় নাম এসেছে অনেক পরে, কিন্তু পরবর্তী যুগে রাঢ়ের সীমা প্রাচীন সুহ্মের সীমা অতিক্রম করে গেছে।

দনুজ মাধব সেনের সময় রাঢ়দেশের সীমা বলতে অনেক বিস্তৃত অঞ্চল বোঝাতো। 'ইঁহার সময়ে রাঢ়দেশ শব্দে মেদিনীপুর, সিংহভূম, মানভূম, বাঁকুড়া, হুগলী ও হাওড়াসহ বর্ধমান, ২৪ পরগণা, খুলনা, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ ও চন্দ্রদ্বীপসহ দ্বীপপুঞ্জকে বুঝাইত।'[৪]

এক সময়ে মিথিলার পর থেকে গঙ্গা ও ভাগীরথীর পশ্চিমাংশে উড়িষ্যা পর্যন্ত প্রদেশই রাঢ় বলে খ্যাত ছিল। 'প্রাচীন জৈনগ্রন্থ আয়ারঙ্গ বা আচারাঙ্গ সূত্র বলে দিনাজপুরের কোটিবর্ষই এর (রাঢ়ের) রাজধানী। সেই কোটিবর্ষই কি বর্তমান পশ্চিম দিনাজপুরের বাণগড় অঞ্চল?'[৫]

রাঢ়ের কোন কোন রাজার রাজ্যবিস্তারের বিচ্ছিন্ন সংবাদ পাওয়া যায়, তবে এ ছিল প্রাচীন কালেই, অন্ততঃ জৈনধর্মের উৎপত্তির সম সময়ে, হয়তো অল্প পরে। প্রাচীন কালে তাম্রলিপ্তের কোন রাজার রাজ্যসীমা বর্তমান মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

'মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরাংশে যেখানে ভাগীরথী দক্ষিণমুখী হইয়াছেন, সেই স্থান হইতে হাওড়া জেলা পর্যন্ত ভাগীরথীর সমস্ত পশ্চিমভাগ এক সময়ে রাঢ় নামে খ্যাত ছিল।'[৬] এটাই বোধ হয় রাঢ়দেশের সবচেয়ে সংকুচিত সীমানা। রাঢ়ের সবচেয়ে বৃহত্তর সীমানার কথা আগেই বলা হয়েছে।

"কর্ণসুবর্ণ বা বর্ধমানাধিপতি শশাংকের সময় সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত ও উৎকল পর্যন্ত রাঢ়ের বিস্তার ছিল। বলা বাহুল্য এই কারণেই সম্ভবতঃ দক্ষিণ রাঢ়ের সুদূর দক্ষিণে অবস্থিত ময়ূরভঞ্জ অদ্যাপি অধিবাসীদের নিকট রাঢ় বলিয়া পরিচিত।"[৭] পশ্চিমে মানভূম জেলায় এখনও রাঢ়ী বোলি বলে একটি কথ্য ভাষার অস্তিত্ব আছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে একদিন রাঢ় দেশের মধ্যে বৃহত্তর বঙ্গ বলতে যা বোঝায়, অর্থাৎ বিহারের বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চল, উত্তর উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এই ভৌগোলিক সীমানা কখনই এক বা অপরিবর্তিত থাকে নি। কখনও রাঢ়ের কিছু অংশ উড্র বা উৎকলের সীমার মধ্যে পরিগণিত হয়েছে, পুনরায় কোন সময়ে গৌড় অথবা পুণ্ড্ররাজ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিছু অংশ হয়তো আরও পুরাকালে বৃহত্তর কলিঙ্গরাজ্যের অঙ্গীভূত হয়েছে।

মেগাস্থিনিসের বিবরণের ভিত্তিতে প্লিনী গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ীদের সাগর মোহনায় প্রতিষ্ঠিত বলেছেন। এর থেকেই স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে সেই সময়ে সুহ্মদেশে অর্থাৎ দক্ষিণ রাঢ়াঞ্চলে কলিঙ্গ জাতির কিছু রাজনৈতিক প্রতিপত্তি নিশ্চিতভাবেই ছিল। অনেকে বঙ্গদেশের পশ্চিমদক্ষিণ অংশকে কলিঙ্গ বলেও অভিহিত করেছেন।[৮]

কলিঙ্গের ঐতিহাসিক পটভূমির কথা ইতিমধ্যে বিবৃত হয়েছে। এখন রাঢ়ের প্রাচীনত্ব এবং রাজনৈতিক অস্তিত্বের জের টানা যাক।

'ভূবিজ্ঞানীদের মতে বিন্ধ্যগিরি ও দক্ষিণ দেশ উত্তরভাগ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। পশ্চিমবঙ্গে বা রাঢ় ভূমিতে ও তৎসংলগ্ন দেশে পুরোপলিয় যুগের (Paleolithic Age) আয়ুধ প্রহরণাদি পাওয়া গিয়েছে। দক্ষিণ ভারতের পূর্বাঞ্চলের বিশেষ প্রকারের আয়ুধ পূর্ব উপকূল ধরিয়া মধ্য-অন্ত্যাধুনিক যুগে (middle-Pleistocene Age) রাঢ় ও সংলগ্ন অঞ্চলে আসিয়াছে। বিশেষজ্ঞগণের মতে ঐ যুগে দক্ষিণ ভারতের সহিত এই অঞ্চলের মানবগোষ্ঠীর যাতায়াত ছিল ও উভয়েই হয়তো একই সংস্কৃতির সাধক ছিল।'[৯]

এই প্রসঙ্গে অন্য একজন লেখকের অনুরূপ অভিমত আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অজয় নদীর উপত্যকায় সিন্ধুসভ্যতার সমসাময়িক সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

সন্দেহ নেই যে মধ্যরাঢ়ে অবস্থিত বর্ধমান ছিল রাঢ়দেশের মধ্যমণি এবং রাঢ়দেশ ছিল গঙ্গারিডিদের মেরুদণ্ড। বর্ধমান ছিল গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ীদের রাজধানী বা

তার উপকণ্ঠে অবস্থিত। নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় রাঢ়ের মধ্য দিয়েই গঙ্গানদী (ভাগীরথী) সাগরে মিলিত হয়েছে।

শ্রীকপিল ভট্টাচার্য তাঁর "বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা" নামক গ্রন্থে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন যে 'প্রাচীনকালে পদ্মাই গঙ্গার প্রধান খাত ছিল। কিন্তু আধুনিক কালে খাত পরিবর্তনের ফলে মালদহ জেলার গৌড়ের অবস্থিতি গঙ্গার পশ্চিম পার থেকে পূর্বপারে এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং কালিন্দী মহানন্দাই গঙ্গার প্রাচীন প্রবাহ। ভগীরথের পৌর্ত্তিক কীর্তির নিদর্শন হিসাবেই ভাগীরথীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছিল। ভাগীরথীর খাতে গঙ্গার সাগর সঙ্গম নদী উন্নয়নের পৌর্ত্তিক কাজ ছাড়া আর কিছু নয়।'

ভগীরথের মর্তে গঙ্গা আনয়নের পৌরাণিক কাহিনীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে আমরা পদ্মার স্বপক্ষের দাবিকে বর্জন করতে পারি। ভগীরথের পৌর্ত্তিক কার্যের কৌশল এবং উপযোগিতা হিমালয় থেকে গঙ্গার স্রোতধারাকে সমতলভূমিতে কুরু, পাঞ্চাল, কোশল প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করার মধ্যে নিহিত ছিল; শুধু মাত্র গঙ্গার নদী উন্নয়নের পৌর্ত্তিক কাজে ভাগীরথীর খাতে সাগর সঙ্গমের পথ সুগম করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পদ্মার প্রবলতর ধারার অভিগমন মধ্যযুগের শেষভাগ থেকেই শুরু হয়েছে, তার আগে নয়। আমরা ইতিহাসগতভাবে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারি যে ভাগীরথীর ধারাকেই পবিত্র জাহ্নবী বলে স্বীকৃতি দিয়েছে ভারতীয়েরা এবং চিরদিন শ্রদ্ধা ও ভক্তির দৃষ্টি দিয়ে পুণ্যস্রোতা বলে গ্রহণ করেছে। এই ভাগীরথীর সাগর মোহনায় (সেই মোহনা সেই প্রাচীনকালে যেখানেই থাক) সাগর দ্বীপ মহর্ষি কপিলের আশ্রম ও সিদ্ধিস্থান হিসেবে পুণ্যভূমি এবং বহু প্রাচীন যুগ থেকে তীর্থস্থান বলে বিবেচিত হয়েছে।

কিন্তু, তা হলেও কপিল মুনির স্মরণার্থে সাগরদ্বীপের মন্দিরটি খৃষ্টীয় ৪৩০ সালের আগে নির্মিত হয় নি (The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval Bengal—N. L. Dey)। মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই উত্তর ভারতের অবাঙ্গালী বৈরাগী ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা এই মন্দির এবং তীর্থস্থানের উপর কর্তৃত্ব করে আসছেন (দক্ষিণ চব্বিশপরগণার ইতিবৃত্ত—কমল চৌধুরী)। এই পরিস্থিতি থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা স্বাভাবিক যে গঙ্গার মূল সাগর সঙ্গম প্রাচীনকালে একই স্থানে ছিল না এবং সাগরতীর্থও সরস্বতী শাখার খাড়িতে তাম্রলিপ্তের কাছে এবং আরও আগে ত্রিবেণীর কাছে ছিল।

এই তীর্থের কথা আমরা মহাভারত থেকেও জানতে পারি।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীকেরা ভাগীরথী গঙ্গাকেই প্রকৃত গঙ্গা বলে জানতেন। অবশ্য, গঙ্গার সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে সংযুক্ত অন্য স্রোতগুলির কোন কোনটিকে গঙ্গার উপনদী বা শাখা নদী বলে তাঁরা মনে করতেন। তাঁদের এই ধারণা অভ্রান্ত ছিল না এবং পরবর্তীকালে টলেমি প্রভৃতি অন্য লেখকদের কিছু মাত্রায় বিভ্রান্ত করেছিল।

টলেমির মানচিত্রে গঙ্গার প্রবাহের সঠিক বর্ণনা নেই। বঙ্গদেশের দক্ষিণ প্রান্তে

নদী বহুধা বিভক্ত হয়ে একটি বদ্বীপের সৃষ্টি করে পাঁচটি ভিন্ন মুখে সাগরে গিয়ে মিলেছে, এই চিত্রই প্রকাশিত হয়েছে। গঙ্গে বন্দরকে যেন আদি গঙ্গার তীরেই দেখানো হয়েছে (ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের অভিমত অনুযায়ী কুমার নদীর মোহনায় নয়)। আদিগঙ্গাকে গঙ্গা ভাগীরথীর মূল প্রবাহ ধরলেও গঙ্গানদী রাঢ়ের পূর্বদিকে প্রবাহিত। সুতরাং গঙ্গাই গঙ্গারীডিদের পূর্বসীমা, ডিওডোরাস বর্ণিত এই ভৌগোলিক সীমানাটি গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

গত বিশ বছরের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের প্রভাবে এই আদি গঙ্গার খাতকে গঙ্গার প্রাচীন যুগের প্রবাহপথ বলেও ধরা যায়। সরস্বতীর খাতে গঙ্গার প্রবাহ এবং রূপনারায়ণ, দামোদরের দ্বারা স্ফীত সেই জলধারার সাগরসঙ্গমের অনতিদূরে একটি খাড়িতে তাম্রলিপ্তের অবস্থিতি যেমন এই ধারাটির প্রাচীনত্ব প্রমাণিত করে, তেমনই তাম্রলিপ্তকে গাঙ্গেয় বন্দর হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করে। সরস্বতীর মতো আদিগঙ্গার তথা প্রাচীন গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রবাহটিও পশ্চিমবঙ্গেই ছিল।

রাঢ়ে তথা পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থান দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু ক্রমশঃ দক্ষিণ মুখে সমুদ্রগামী হওয়ায় এবং নিম্নতর ভূখণ্ডের অল্প ঢালের জন্য গঙ্গার স্রোত ব্যাহত হয়ে সমুদ্রের নিকট বদ্বীপ গঠন করেছে এবং সেইভাবেই একাধিক সাগর মোহনার সৃষ্টি হয়েছে।

পশ্চিম সুন্দরবনসহ এই বদ্বীপ অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অংশ হিসেবে গঙ্গারিডির অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ এই বদ্বীপ এবং গঙ্গা ও পদ্মার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ নিম্ন অঞ্চলে গঠিত গাঙ্গেয় বদ্বীপ কোন মতেই এক নয়। বস্তুতঃ টলেমির বহির্গাঙ্গেয় মানচিত্রে (India extra Gangem) যে বদ্বীপটি দেখা যায়, সেটি একটি ক্ষুদ্রতর বদ্বীপ এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত।

বৃহত্তর বদ্বীপের শেষভাগ আধুনিক খুলনা জেলার মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্রতর বদ্বীপের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। প্রাচীন বঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত।

গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থ ভূভাগকে লাঢ় বা রাঢ দেশ বলে। পালি ভাষায় রাঢ়কে লাঢ় এবং রাষ্ট্রকে রট্ঠ বলে। তামিল ভাষার 'তক্কণ লাঢ়ম' শব্দও দক্ষিণ রাঢ়কে বুঝায়। ১১ শতকের রাজেন্দ্র চোলের তিরুময় শিলালিপিতে 'উত্তীয় লাঢ়ম' ও 'তক্কণ লাঢ়ম' নামের উল্লেখ আছে। বলাই বাহুল্য এর মধ্যে উত্তর রাঢ় এবং দক্ষিণ রাঢ় এই দুই অঞ্চলের কথাই বলা হয়েছে।

মহাভারতের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় যে বঙ্গদেশ নানা ভাগে বিভক্ত ছিল এবং এক রাজার অধীনে ছিল না। ভীমসেনের দিগ্বিজয় সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"তিনি পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছবাসী মনোজা রাজা—এই দুই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎপরে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি বঙ্গাদেশাধীশ্বরদিগকে এবং সুহ্মাদিগের অধীশ্বর ও মহাসাগর কূলবর্তী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন" (সভাপর্ব, ষষ্ঠ অধ্যায়, মহাভারত—কালীপ্রসন্ন সিংহ)।

মহাভারতের বর্ণনা অনুযায়ী বঙ্গদেশীয় নরপতিরা যে সকলেই আর্য ছিলেন, এমন অনুমান করা সঙ্গত নয়। দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে তথা সুহ্ম দেশে তখন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাম্রলিপ্ত হয় স্বাধীন ছিল, নয় সুহ্মদেশের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। সাগর-কূলবাসী ম্লেচ্ছেরা নিষাদ জাতির অন্তর্গত ছিল এবং এরাই পরবর্তী যুগে কলিঙ্গের অধিবাসীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। প্লিনীর বর্ণনা অনুযায়ী সম্ভবতঃ এঁরাই গঙ্গারিডি কালিঙ্গেয়ী বলে পরিচিত হয়েছিলেন।

জৈন এবং বৌদ্ধধর্ম অভ্যুদয়ের যুগে রাঢ় বাংলার কি অবস্থা ছিল, এই বিষয়ে সম্যকভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের এই কথা মনে রাখতে হবে যে বাবিলন, মিশর ও সুমেরীয় সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতা এবং তাম্রলিপ্তের সভ্যতার এক যোগসূত্র ছিল। এই সূত্রটি হলো প্রাচীন ভারতের "অসুর সভ্যতা", যে সভ্যতার স্রোত উপর্যুক্ত বহির্ভারতীয় দেশসমূহেও প্রবাহিত হয়েছিল।

ভারতে এই উচ্চমানের অসুর সভ্যতার মূলকেন্দ্র ছিল রাঢ়ভূমি। বাঁকুড়া পুরুলিয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার কোন কোন অংশে প্রাচীন অসুর ভাষার অস্তিত্ব এখনও বর্তমান। "Austro-Asiatic কোল গোষ্ঠীর যে সমস্ত সম্প্রদায় রয়েছে তাদের মধ্যে অসুর সম্প্রদায় এখনও তাদের আসুর ভাষা নিয়ে রাঁচি-সিংভূম-পালামৌ অঞ্চলে বসবাস করছে—যাদের মূল জীবিকা হলো লৌহ আকর থেকে লৌহ তৈরী"।[১০]

রাঢ়দেশে এক স্বতন্ত্র সভ্যতা ও কৃষ্টি তার অস্তিত্ব প্রবলভাবে অক্ষুন্ন রেখেছিল। এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে আর্যদের বিপরীত এবং মাতৃ ও শক্তিতন্ত্র নির্ভর। শিব ও শক্তি এই রাঢ়ভূমির অনার্য দেবতা, সুতরাং এখানে জৈন ধর্মের প্রচারকেরা যে যথেষ্ট বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হবে এক পুরাতন ধর্মবিশ্বাসের শিকড় উৎপাটনের সময়ে, তা আদৌ বিচিত্র নয়।

আনুমানিক খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকে (মতান্তরে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে) মাগধী ভাষায় লিখিত জৈন ধর্মগ্রন্থ আচারাঙ্গ সূত্র অনুসারে মহাবীর বর্ধমান রাঢ়দেশে ধর্ম-প্রচারের জন্য এসেছিলেন। আচারাঙ্গ সূত্র প্রণেতার মতে রাঢ় বা সুম্ভ নামক দেশটি ছিল হিংস্র পশু ও বন্য মানুষাদির নিবাস। পালি ভাষায় রচিত সিংহলীয় বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'মহাবংশ' থেকেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

জৈন ধর্মগ্রন্থ আচারাঙ্গ সূত্রে জৈনগুরু ২৪তম জৈন তীর্থংকর মহাবীর বা বর্ধমান স্বামীর ধর্মপ্রচারেব জন্য রাঢ় দেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে। আমরা জানি যে অনেকের মতে এই বর্ধমান স্বামীর নাম অনুসারে এই অঞ্চলের নাম হয় বর্ধমান। ইনি বারো বৎসর কাল রাঢ়ের গভীর জঙ্গলে তপস্যা করেছিলেন বলে জানা যায়।

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে মহাবীরের বিরুদ্ধে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া এবং তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত রূঢ় ও কঠিন ব্যবহারের মধ্যে রাঢ়বাসীদের অসভ্যতা ও বর্বরতার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে এ কথাও বলেন যে রাঢ় দেশের অন্যতম আদিম অধিবাসী, বাউরীদের অন্যতম টোটেম কুকুর এবং এর থেকে অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির

অস্তিত্বই প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই অন-আর্য সভ্যতা কত উচ্চমানের ছিল তা অন্যত্র আলোচিত হয়েছে।

জৈন ধর্মগুরুর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পথহীন রাঢ়দেশের বন্য ও বর্বর অবস্থা সম্বন্ধে যে বিবরণ সংগৃহীত হয়েছে, সেইগুলি সমালোচনার ঊর্ধে নয়। রাঢ় দেশের লোকেরা মহাবীরকে কুকুর লেলিয়ে দিলেও, নিজেদের এমন কি পার্শ্ববর্তী দেশের নাম (মানভুম) তাঁরই নামানুসারে রাখেন কি ভাবে?

জৈন ধর্মপ্রচারক তীর্থঙ্কর মহাবীর ও তাঁর সম্প্রদায় ছিলেন নগ্নতাপন্থী, সুতরাং স্থানীয় লোকেরা তাঁদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন—এমন হওয়াই স্বাভাবিক। তা না হলে ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধে এই প্রাথমিক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের পরে অল্পকালের মধ্যে এই অঞ্চলে জৈনধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় কেমন ভাবে! বর্ধমান মহাবীর যে নগ্নতা অবলম্বন করেছিলেন তা জৈনদের শ্বেতাম্বর পন্থীরাও স্বীকার করেন। এ বিষয়ে বিশ্বভারতী প্রকাশিত অমূল্যচন্দ্র সেনের 'জৈনধর্ম' পুস্তকটি দ্রষ্টব্য।

এই কথা মনে করা অসঙ্গত নয় যে ধর্মগুরুর প্রতি সামান্যতম আক্রমণ ও বিরূপতাকে স্বাভাবিক মনস্তত্ব নিয়েই জৈন ধর্মগ্রন্থে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে এবং প্রাচীন রাঢ়-বাসীদের অতিথিদের প্রতি নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ হিসেবে কলঙ্কিত করা হয়েছে। তাদের রাঢ়, চোয়াড় ইত্যাদি কটু ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে।

"পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা" গ্রন্থে ডঃ সনৎ কুমার মিত্র রাঢ়বাসীদের প্রতি এই হীন ধারণাগুলি খণ্ডন করার জন্য যে যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করেছেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। 'প্রাচীন রাঢ় অঞ্চলে যে সভ্য ও জীবনাচরণে উন্নত জাতিগণ বাস করতেন, তাঁরা এক খুব সাধারণ কারণেই তাদের এত কালের আচরিত ধর্ম আচরণের ক্ষেত্রে জৈন ধর্মকে মোটে ভালো চোখে দেখেন নি, এবং তা দেখা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। দুই, তাঁরা প্রকাশ্যে জনসাধারণের সামনে কিছু উলঙ্গ লোকের এইভাবে ঘুরে বেড়ানোটা মোটেই শোভন বলে মনে করেন নি—তা সে ধর্মের নাম করে হলেও। তিন, কিছু উলঙ্গ, অপরিচিত আগন্তুককে গ্রামের মধ্যে হঠাৎ উপস্থিত দেখে কুকুরেরা আজও যে আচরণ করে থাকে বা করা স্বাভাবিক, আড়াই হাজার বছর আগেও তারা তাই-ই করেছে।"

মজার কথা এই যে জৈন ভগবতীসূত্রে (ভাখ্য প্রজাপতি উপাঙ্গ) যে কয়টি মহাজনপদের নাম পাওয়া যায়, তার মধ্যে লাঢ় অন্যতম। এই লাঢ় রাঢ় ব্যতীত আর কোন অঞ্চলই নয়। জৈন প্রজ্ঞাপন উপাঙ্গে রাঢ় ও বঙ্গবাসীদের আর্য বলা হয়েছে। সমসাময়িক অথবা অল্প আগের বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে বা সাহিত্যে সুহ্মের নাম থাকলেও রাঢ়ের নাম পাওয়া যায় না। এতে মনে হয় যে জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে সেই সময়ে জৈন ধর্মই রাঢ়দেশে প্রচার লাভ করেছিল। মধ্য রাঢ়ে অথবা বর্ধমান অঞ্চলে কিছু কিছু জৈন নিদর্শন পাওয়া যায় এবং মানভুমে (উত্তর রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত) ২৪ জনের মধ্যে ২০ জন তীর্থঙ্করের পবিত্র সমাধি বর্তমান পরেশনাথ পাহাড়ে (সমেত শিখরে) আছে।

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান মানভুম, ধানবাদ, পুরুলিয়া, ধলভুম, ঘাটশীলা, সরাইকেল্লা, সিংভুম এবং গয়া পর্যন্ত পার্বত্য শিখরময় দেশে গঙ্গারিডির সামন্তরাজ শিখর বংশ রাজত্ব করতেন (বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর ইতিহাস—ধনঞ্জয় দাশমজুমদার)। উপর্যুক্ত সব অঞ্চলগুলিই প্রাচীন রাঢ়ের অন্তর্গত।

বিনয় ঘোষ তাঁর "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি" (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে বলেছেন যে আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতি, বৌদ্ধ ধর্ম প্রভৃতি রাঢ়দেশে প্রসারিত হয়, পুণ্ড্রবর্ধন এবং বঙ্গের অনেক পরে। রাঢ়ে তথা পশ্চিমবঙ্গে শক্তিশালী প্রাক-আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঘাঁটি ছিল। এই সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ধর্মের ধারা বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রবাহিত। রাঢ়দেশ কেবলমাত্র বন্য ও বর্বর লোকের আবাসভূমি ছিল না, তা বলাই বাহুল্য। পশ্চিমবঙ্গে তথা গ্রীক বর্ণিত গঙ্গারিডি রাজ্যে যে সংস্কৃতি ছিল, তার সঙ্গে উত্তর পশ্চিম ভারতের আর্যদের একাত্মতা ছিল না। কিন্তু গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের সভ্যতা, সম্পদ ও শক্তির কথা তাদের অজানা ছিল না।

গঙ্গারিডিদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—"আর্যসংস্কৃতির প্রসার ও প্রতিষ্ঠার আগে পশ্চিমবঙ্গে অনার্য সংস্কৃতির একটা সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল। তার দিগন্ত রেখা আদি প্রস্তর যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রস্তর যুগের বিভিন্ন পর্বের নানা রকমের আয়ুধ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পাওয়া গেছে। মনে হয় ছোটনাগপুর সাঁওতাল পরগণা থেকে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চভূমি সীমা পর্যন্ত প্রধানতঃ আদি-অষ্ট্রাল (Proto-Austroloid) বা নিষাদজাতির বিভিন্ন শাখার সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিকার, পশুপালন, কৃষি প্রভৃতি নানা স্তরভুক্ত ছিল এই সংস্কৃতি। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে বিভিন্ন স্তরের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল।..." পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (প্রথম খণ্ড)—বিনয় ঘোষ।

রাঢ়দেশ দুভাগে বিভক্ত, উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়। জৈন মতে বজ্জভূমি ও সুহ্মভূমি। রাজেন্দ্র চোলের শিলালিপিতে যে উত্তীয় লাঢ়মের কথা বলা হয়েছে তা উত্তর রাঢ়, এবং তক্কণ লাঢ়মের কথা বলা হয়েছে, তাই হলো দক্ষিণ রাঢ়।

অজয় নদের উত্তর ভাগে উত্তর রাঢ়, দক্ষিণ ভাগে দক্ষিণ রাঢ় যথাক্রমে প্রসুহ্ম ও সুহ্ম। গঙ্গারিডি বলে উল্লিখিত মানবগোষ্ঠী পোদ, বাউরী, কৈবর্ত, মাহিষ্য প্রভৃতি ব্রাত্য ক্ষাত্রিয়দের নিয়েই গঠিত হয়েছিল, সন্দেহ নেই। এরা আদি-অস্ট্রাল গোষ্ঠীর প্রভাবে একটি উন্নত ধরণের কৃষিজীবি সমাজ গঠন করেছিল।

পরে উত্তর বঙ্গ থেকে এসেছিল দ্রাবিড়েরা এবং এখানে কৃষি সভ্যতার উপর নগর সভ্যতা ও সংস্কৃতি স্থাপন করেছিল। তা হলেও রাঢ় দেশের মানুষেরা প্রধানতঃ কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু ক্রমে তাম্র, লৌহ প্রভৃতির প্রচলন হয় এবং ব্যবসায় ও বাণিজ্যের প্রসার হয়।

অবশ্য বাঙ্গালী তথা গঙ্গারিডরা সামুদ্রিক জাতি হিসাবেও খ্যাতি লাভ করে-ছিল। পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর এবং পূর্বে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত তাদের

বাণিজ্যতরী সমুদ্রের বুকে ভাসমান হয়ে দীর্ঘকাল পৃথিবীর দুই প্রান্তের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছিল এবং তাদের নিজেদের ঐশ্বর্যশালী করেছিল।

এর প্রমাণ আমরা বহুসূত্রেই লাভ করেছি। রাঢ়দেশের সমৃদ্ধ জনপদে উন্নত মানবগোষ্ঠী বাস না করলে জৈন ধর্মের প্রবর্তকেরা এবং প্রচারকেরা এই স্থানের প্রতি আকৃষ্ট হতেন না- এ' কথা বলাই বাহুল্য। গঙ্গারিডিই বা গঙ্গারিডির সভ্যতা, সম্পদ ও শক্তিমত্তার বিস্তৃত বর্ণনা ও ভূয়সী প্রশংসা আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক কাল থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী প্রায় পাঁচ শত বছর পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকতে দেখা গেছে।

'অপর পক্ষে রাঢ়দেশে বরাবর বেদবিরুদ্ধ মত প্রচলিত থাকায় প্রাচীন শাস্ত্রকারদের নিকট এই স্থান অবৈদিক ও অযজ্ঞীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। মৌর্য ও শকাধিকারকালে এখানে ক্ষত্রপ কায়স্থগণের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল।'[১২]

জৈন অঙ্গ ও কল্প সূত্র এবং জৈন পুরাণ থেকে আমরা অবগত হই যে খৃষ্টের জন্মের প্রায় আটশ বছর আগে ২৩শ তীর্থংকর পার্শ্বনাথ স্বামী পুণ্ড্র, রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত প্রদেশে বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে চতুর্যাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে পালি ভাষায় রচিত সিংহলীয় প্রাচীন কাহিনী মহাবংশে লিখিত আছে যে বুদ্ধদেবের জন্মের আগে রাঢ়দেশে সিংহবাহু রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজধানী ছিল সিংহপুরে (বর্তমান হুগলী জেলায়)। তাঁর পুত্র বিজয়সিংহের নাম থেকে সিংহল দ্বীপের নাম হয়েছিল।

আজ পর্যন্ত অনেক লংকাবাসী (সিংহল দ্বীপবাসী) নিজেদের বাঙ্গালীদের বংশধর বলে মনে করেন। সিংহলে রাঢ়ীয় সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছিল বলেই ধারণা হয়।

সুতরাং পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে অতি প্রাচীন কাল থেকেই রাঢ় দেশে সুসভ্য জাতির বাস ছিল এবং তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্রোত প্রবহমান ছিল। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি মধ্যদেশীয় আর্যদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমপর্যায়ের নয়, বরং সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। মধ্যদেশীয় ব্রাহ্মণেরা ছিল আচার-সর্বস্ব ও যজ্ঞপরায়ণ, বঙ্গদেশীয়েরা ছিল হৃদয়বান ও পূজাপরায়ণ। পুরাণে আছে সুতপার পুত্র বলি (বিরোচনের পুত্র এবং প্রহ্লাদের পৌত্র) সুতলে রাজত্ব করেছিলেন। বলিরাজের পত্নী সুদোষ্ণার গর্ভে এবং দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে সঞ্জাত পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র এই নিম্ন গাঙ্গেয় ভূমিতেই আপন আপন নামে পরিচিত রাজ্যে রাজত্ব করেছিলেন।

পার্জিটার সাহেব এদের সব চন্দ্রবংশীয় আর্য ক্ষত্রিয় বলে নির্দেশ করলেও এদের আর্য উৎপত্তি সম্বন্ধে মনে বিশেষ সংশয় জাগে। কারণ, এক অঙ্গদেশ ব্যতীত আর চারটি রাজ্যেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবর্তন হয়েছিল অনেক পরে, প্রায় তৃতীয় / চতুর্থ খৃষ্টীয় শতাব্দীতে।

বৈদিক শাস্ত্রে অঙ্গের নামোল্লেখ অনেক আগেই পাওয়া যায়, কিন্তু বঙ্গ, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ প্রভৃতির কোন প্রশংসাসূচক বর্ণনা নেই। সুহ্মদেশও এর কোন ব্যতিক্রম

নয়। সুতরাং মনে হয় রাঢ়দেশে জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্ম প্রাদুর্ভাবের সময় হয় কিছু সংখ্যক আর্য ব্রাহ্মণেরা স্থানীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে আপোষ করেছিলেন, অথবা এখানে তখন ব্রাহ্মণদের কোন প্রভাব ও প্রতিপত্তি আদৌ ছিল না। কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা ছিল সুসভ্য, সংস্কৃতিসম্পন্ন, কর্মকুশল, অর্থনৈতিকভাবে উন্নতিশীল এবং দুঃসাহসিক সমুদ্র অভিযানে অভ্যস্ত।

রাঢ়ের প্রাচীনত্বই রাঢ়ের উন্নততর সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎস। রাঢ়ের প্রাচীনত্ব প্রতিধ্বনিত হয়েছে, নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলির মধ্যে ঃ—

"কেবল বাংলার পশ্চিম অংশ (যাহা পুরাতন গণ্ডোয়ানা ভূমির অংশ) পৃথিবীর আদিম খণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া পলিমাটি তৈয়ারী বাংলার অধিকাংশের মতো উত্থান পতন হইতে রক্ষা পাইয়াছে। চব্বিশ পরগণা হইতে আরম্ভ করিয়া খুলনার উত্তরাংশ এবং ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জের পূর্ব সীমা পর্যন্ত সারি সারি অতি গভীর ও প্রায় অবিচ্ছিন্ন বিল ও জলাভূমির বিস্তারেও বাংলার ভৌম অবরোহের সাক্ষী। বাংলার অপেক্ষাকৃত উত্তর পশ্চিমখণ্ডে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন ও সংস্কৃতির প্রথম বিকাশ।"[১৪]

কৃষি-সমৃদ্ধ সুহ্ম তথা রাঢ় দেশ এবং সমগ্র বঙ্গদেশই ৮০০ ২০০ খৃঃ পূঃ কালে ভারতীয় আর্য সভ্যতার বহির্ভূত ছিল। কারণ, বৌধায়ন প্রভৃতি সূত্রে পুণ্ড্র এবং বঙ্গে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বলে বার বার সতর্ক করা হয়েছে।[১৫]

অষ্ট্রিক ভাষায় রাঢ় শব্দটির অর্থ হলো সাপ। নাগলোক 'লাঢ়' দেশের বজ্রভূমি ও সুম্ভভূমিতে শ্রমণ ও মহাবীর ভগবান বিচরণ করেছিলেন। লাঢ় বা লাড় অর্থে সাপ হলে, নাগভূমিতে মহাবীরের বিচরণ থেকেই মনসাতত্ত্বের উৎপত্তি হতে পারে। বাংলা দেশের মনসা হলেন শূলপাণি শিবের কন্যা, জন্ম নিয়েছিলেন পাতালে নাগলোকে। মনসা সম্প্রদায়ের সঙ্গে জৈন ধর্মের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ("রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর" দ্রষ্টব্য—ডঃ অমলেন্দু মিত্র)

হিন্দু পৌরাণিক এবং গ্রীকগণের বন্দিত পাতালকে অনেকে বঙ্গদেশের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন।

এক অগ্রদ্বীপ (কালনা) এবং নবদ্বীপ ব্যতীত গঙ্গার পলিমাটির সাহায্যে যে দ্বীপগুলি গঠিত হয়েছিল, তা সকলই গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত। যেমন, চক্রদ্বীপ, খড়্গদ্বীপ, আর্যদ্বীপ, ডুমুরদ্বীপ, শিয়ালদ্বীপ হয়েছে যথাক্রমে চাকদহ, খড়দহ, আড়িয়াদহ, ডুমুরদহ ও শিয়ালদহ।

বর্তমান কলিকাতা নগরী থেকে সাগর পর্যন্ত ভূখণ্ড প্রবাল দ্বীপ নামে পরিচিত।[১৬] এ সবই গঙ্গার পলিমাটিতে তৈরী হয়েছে অথবা সমুদ্রের ভেতর থেকে সৃষ্ট হয়েছে। বস্তুতঃ চব্বিশপরগণার অনেক অংশ ও কলকাতা জলমগ্নই ছিল সে যুগে।

প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে গঙ্গা, হুগলী এবং পদ্মার মধ্যবর্তী অঞ্চল বঙ্গোপসাগরের আওতায়। 'তখন রাঢ়ের মালভূমি, রাজমহল পাহাড় ও শ্রীহট্টের

পাহাড়ী অঞ্চলকে ছুঁয়ে যেত বঙ্গোপসাগরের জল। রাঢ় (বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর) বরেন্দ্রভূমি (উত্তরবঙ্গ) ও প্রাগজ্যোতিষপুরে (আসাম) যে সব মানুষ থাকতো, এই সমুদ্র পেরিয়ে যাবার মত সাহস ছিল না তাদের। কালক্রমে তাদেরই বংশধরেরা যে এই সমুদ্রের মধ্যে গড়ে ওঠা বঙ্গভূমির মধ্যে বসবাস করবে তা তারা কল্পনাও করে নি।'[১৭]

ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার এবং ভৌগোলিক বিশ্লেষণের সহায়তায় গৃহীত তথ্যগুলির উপর নির্ভর করে বলা যায় যে উপবঙ্গ ও বঙ্গের অধিকাংশই রাঢ়দেশ অপেক্ষা অনেক অর্বাচীন। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে যখন গঙ্গারিডি নাম প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল, তখন এই সব স্থানের বহু অংশই গঠিত হয় নি, জলগর্ভেই ছিল অথবা বিচ্ছিন্নভাবে দ্বীপময় ছিল। সুতরাং বলাই বাহুল্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভায় উজ্জ্বল এবং কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যে সমৃদ্ধ প্রাচীন রাঢ়ভূমিকে কখনই গঙ্গারিডির সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়া যায় না।

রাঢ়ের অন্তর্গত বর্তমান হাওড়া জেলা তেমন প্রাচীনত্ব দাবি করতে পারে না। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় হাওড়া শব্দটির শেষে ড়া কথাটি দ্রাবিড় ভাষা থেকে উৎপন্ন বলেছেন। হাওড়া শব্দের অর্থ হলো জলা জায়গা, হাওড় থেকে হাওড়া শব্দের উৎপত্তি। হাওড়ায় শ্যামা জাতির বাস ছিল।[১৮] এই জেলার কিছু অংশ তাম্রলিপ্ত রাজ্যের মধ্যে ছিল বলে অনুমান করা হয়।

রাঢ়দেশ সহ সমগ্র বঙ্গদেশের অধিবাসীরা ছিল মূলতঃ অনার্য এবং ভাষাগতভাবেও তারা ছিল সেই রকম। তারা সম্ভবতঃ ছিল অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর অস্ট্রো-এশিয়াটিক জাতির মানুষ। এদেরই বোধহয় বলা হতো নিষাদ কিম্বা নাগ, পরবর্তী কালে এরাই হয়েছে কোল্ল, ভীল্ল ইত্যাদি। তাদের ভাষাও ছিল মোন-ক্মের শাখার ভাষার মতোই। বাংলার পশ্চিমে কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল আর পূর্বে (এখন আসামের) খাশিয়া পাহাড়ের খাশিয়ারা।

এই অষ্ট্রিক গোষ্ঠী ছাড়াও এই দেশে বাস করতো সুসভ্য দ্রাবিড় গোষ্ঠীর বিভিন্ন জাতি। এক সময়ে তারা পশ্চিমবঙ্গে এবং মধ্য বঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। প্রাচীন যুগে এখানে দ্রাবিড় জাতির বিশেষ প্রাধান্য ছিল। তামালেটি বা তাম্রলিপ্ত এই দ্রাবিড়দের ঘাঁটি ছিল এক সময়ে।

পণ্ডিত কনকসভাই পিল্লে প্রভৃতি অনেকের ধারণা যে দ্রাবিড়েরা তাম্রলিপ্ত থেকেই দক্ষিণ ভারতে অপসৃত হয়েছিল এবং তাদের অন্যতম প্রধান জাতি এবং প্রধান ভাষার তামিল নামকরণ তমোলিপ্ত বা তাম্রলিপ্ত থেকে এসেছে।[১৯] প্রাচীন সংস্কৃতে এই স্থানের নাম দামলিপ্ত অর্থাৎ উহা দামিল জাতির একটি প্রধান নগর।

আধুনিক নৃতত্ত্ববিদেরা মনে করেন যে অষ্ট্রিক উপাদান ব্যতীত বাঙ্গালীর মিশ্র জাতিত্বের মধ্যে মঙ্গোল ও দ্রাবিড় উপাদান বর্তমান। বঙ্গে এক কালে দামল বা তামিল জাতির প্রাধান্য ছিল। পুণ্ড্রদেশে, বঙ্গে এবং প্রাগজ্যোতিষে প্রাচীন কিরাত অথবা মঙ্গোলজাতির প্রভাব ছিল। এরা উত্তর দিক থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনুমানে প্রাচীন দ্রাবিড় জাতিই বঙ্গ মগধের আদিম অধিবাসী। পরবর্তীকালে দ্রাবিড়জাতিকে পরাজিত করে আর্যেরা বঙ্গদেশ জয় করেছিল।[২০] এই ঘটনা খৃষ্টীয় তৃতীয়/চতুর্থ শতাব্দীর আগে ঘটে নি। সেই সময় বরাবর মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার সূচনা হয়েছিল।[২১]

ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ্যধর্মানুসরণকারী আর্যভাষীরা গ্রীক ও লাতিন লেখকদের বর্ণিত গঙ্গারিডিদের পরাস্ত করে বঙ্গদেশে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবর্তন করেছিল। অনার্যদের লিপি ছিল না। কিন্তু কৃষ্টি ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি অনার্য বা প্রাগার্য সভ্যতার বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্য ও উপাদানসমূহ থেকেই সাধারণ মানুষের নিকট গ্রহণীয় হয়ে আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। এই রূপান্তরের প্রক্রিয়া সেই মৌর্য যুগের আর্যদের প্রথম উপনিবেশের সময় থেকেই শুরু হয়েছিল।

"এই কয়শ বছরের মধ্যে কিন্তু বিবর্তন ধারা নিঃশেষ হয় নি। তার পরেও গ্রহণ বর্জন চলেছে। সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে। কোল দ্রাবিড় মোঙ্গল এই তিন শ্রেণীর অনার্য লোক ছাড়াও আর্যশ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে সংযোগ ঘটেছে, দেওয়া নেওয়া চলেছে।..."[২২]

রাঢ় দেশের প্রাচীনত্বের পরিপ্রেক্ষিতে কৌমভিত্তিক জনগোষ্ঠী থেকে রাজতন্ত্রে পরিবর্তনের ইতিবৃত্তের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলে, মহাভারতের কাল থেকে খৃঃ পূঃ ৫।৬ শতাব্দী পর্যন্ত আমরা বঙ্গদেশের কোন রাজবংশের সঠিক উল্লেখ পাই না। এর কারণ সম্বন্ধেও আগেই আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু, বিদ্রোহী বাঙ্গালীর ইতিহাস অনেক স্থানেই বিক্ষিপ্ত আছে।

যেমন, 'মহাভারত যুগের রাজবংশ বহুকাল পর্যন্ত অঙ্গ-বঙ্গ কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত এবং গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছেন। তাম্রধ্বজ বংশধরগণ এখনও তাম্রলিপ্ত গড়ে দীন হীন অবস্থাতেও রাজা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। সমুদ্রসেনের বংশধরগণের মধ্যে পালরাজগণ ও কনৌজের রাজাগণ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহাদের বংশধরগণ এখনও দীন হীন অবস্থায় যশোহর এবং খুলনা জেলায় বাস করিয়া আসিতেছেন। চন্দ্রসেনের বংশধরগণ যুগযুগান্তর হইতে বঙ্গের রাজধানী কমলাঙ্কে রাজত্ব করিয়া বর্তমানে লোহার চরে চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত হইয়া বাস করিতেছেন।......মেগাস্থিনিস, ডেমাকো, ডিওডোরাস প্রভৃতি পরিব্রাজকগণ বঙ্গের রাজাগণকে এবং সমগ্র অধিবাসীকে একজাতি এক বর্ণভুক্ত সর্বপ্রকার কার্যে নিযুক্ত কলিঙ্গজাতি নামে অভিহিত করিয়াছেন।'[২৩]

এই বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলি একত্রিত করলে ধারাবাহিক ইতিহাসের এক পূর্ণ মূর্তি গঠিত না হলেও, নিশ্চিতভাবে প্রাচীন ইতিহাসের একটি নির্ভরযোগ্য রূপ ও রেখা রচিত হবে। অধিকতর অনুসন্ধান এবং গবেষণার দ্বারা ক্রমশঃ সেই ইতিহাস-সাধনার পূর্ণাঙ্গ রূপটি প্রস্ফুটিত হবে। এখানে রাঢ়বঙ্গের কথাই বিস্তৃতভাবে বিবৃত হবে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে অধিকাংশ লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং মৌলিক অভিমত পোষণকারী জ্ঞানবান বাঙ্গালী ইতিহাসবিদ এই রাঢ়বঙ্গের শিবি ও চেত রাজ্য সম্বন্ধে কোন আগ্রহ

প্রদর্শন করেন নি, বরং অদ্ভুতভাবে উদাসীন থেকেছেন ! উদাহরণস্বরূপ, ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁর Political History of Ancient India গ্রন্থে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ঠিক আগে উত্তর পশ্চিম ভারতের সিন্ধু উপত্যকায় ক্ষীয়মান পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনস্থ এবং পরে প্রায় স্বাধীন কতগুলি রাজ্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে ঝিলাম (বিতস্তা) এবং চেনাব (চন্দ্রভাগা) নদীর সঙ্গমের নীচে অবস্থিত শিবই রাজ্যের কথা বলেছেন।

তিনি শুধুমাত্র উল্লেখ করেছেন—'The Jatakas (Ummadanti and Vessantara) mention a Sivi country and its cities Arithapura and Jetuttara". বেসান্তর জাতকে শিবিরাজের সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পেয়েও, এই সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক অন্য অনেক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের মতোই এই দুটি প্রাচীন বাঙ্গালী রাজ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং গবেষণার কোন প্রেরণা পান নি !

খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে যে সকল জনপদ ও গোষ্ঠী পূর্বভারতে অস্তিত্ব বহন করেছিল, তার মধ্যে শিবি ও চেতরাজ্য উল্লেখযোগ্য। Prof. T. N. Rhys Davids তাঁর "Buddhist India" নামক গ্রন্থে প্রায় একুশটি রাজ্যের নাম উল্লেখ করে বলেছেন যে শিবি ও চেত রাজ্যের অবস্থান নির্ণয় করা যায় নি।

কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ ডঃ অতুল সুর তাঁর "বাংলার সামাজিক ইতিহাস" গ্রন্থে লিখেছেন যে সাম্প্রতিক কালে বেসান্তর জাতকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে রাঢ় দেশের প্রাকবৌদ্ধ যুগের দুই মহাজনপদের সন্ধান পাওয়া গেছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে শিবিরাজ্য এবং অপরটি চেতরাজ্য। বর্ধমান জেলার অধিকাংশ নিয়ে শিবিরাজ্য গঠিত ছিল। তার রাজধানী ছিল জেতুত্তর নগরে (বর্তমান মঙ্গলকোটের নিকট ও টলেমি উল্লিখিত সিরিয়াম বা শিবপুরী)। এরই দক্ষিণে ছিল চেতরাজ্য। তার রাজধানী ছিল চেত নগরীতে (বর্তমান ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত চেতুয়া পরগণা)।

এই উভয় রাজ্যেরই সীমান্ত তখন কলিঙ্গ রাজ্যের সীমার সঙ্গে এক ছিল। কলিঙ্গ রাজ্য তখন বর্তমান মেদিনীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শিবিরাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশ দুনুনিভিত। এর দক্ষিণে কলিঙ্গ রাজ্য।

বর্ধমানের মঙ্গলকোটের প্রাচীন অস্তিত্ব সম্বন্ধে এক প্রখ্যাত গবেষক আলোকপাত করেছেন—'বেশ প্রাচীন সুসমৃদ্ধ জনপদের ছাপ মঙ্গলকোটের সর্বাঙ্গে……শ্বেত নামে এক মহাদানশীল উদার রাজা ছিলেন, মঙ্গলকোট তাঁর রাজধানী ছিল। তিনি শৈবধর্মী ছিলেন। রাঢ়ের সওদাগরেরাও 'শৈবধর্মী' ছিলেন।'[২৪]

পুনরায় শিবিদের সম্বন্ধে অন্যত্র বলা হয়েছে—'শিবের ভক্তদের শিবি বলা হতো। দ্রাবিড় জাতীয় শিবিরাই রাজপুতানার মরুভূমিতে কলিঙ্গ নগর তৈরী করেন, যেমন মৌর্য জনদের পূর্বপুরুষ বিহারে বোখারো নগর এবং বঙ্গের নাগ-যক্ষ-মৎস্যরাজরা পাণ্ডুনগর তৈরী করেন। 'পঞ্চালে' সঙ্গলদিগের রাজধানী সঙ্গলনগর ছাড়াও মাটির শিবলিঙ্গ পূজকদের 'হরপ্পা' নগর তৈরী হয়। এঁরাই সিন্ধু নদীর ওপারে লার্কানা জেলায় মোহেঞ্জোদারো নগর নামে পৃথিবীর সর্বাগ্র নগর-সভ্যতা পত্তন করে।'[২৫]

শিবভক্ত দ্রাবিড়দের এই নগরভিত্তিক সভ্যতার প্রবর্তন এবং ঐশ্বর্যময় অবদান পশ্চিমবঙ্গের তথা গঙ্গারিডির ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক প্রগতিশীল, উদার এবং হৃদয়ধর্মী জীবনাদর্শের নিদর্শন প্রমাণিত করে। সেই মহাভারতে, পুরাণে পাঞ্জাব, রাজপুতনা, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে উশীনর এবং শিবি রাজদের উপাখ্যান থাকলেও ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভেও অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধের শিবপুজক শিবি ও তাদের রাজাদের কোন উপাখ্যান কোথায়ও লিপিবদ্ধ হয় নি। অনার্য শৈবধর্ম তখনও আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্বীকৃতির অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত ছিল। সেই স্বীকৃতি লাভের বিবর্তন ক্রমশঃ সংঘটিত হয়েছিল এবং সে অনেক পরের কথা।

বেসসান্তর জাতকে তিনটি রাজ্যের নাম আছে—১) কলিঙ্গরাজ্য ২) চেতা (CETA) রাজ্য, এবং ৩) শিবিরাজ্য। এই জাতকের বিবরণ থেকে মনে হয় যে সেই যুগে কলিঙ্গরাজ্যের উত্তর সীমা কংসাবতী নদীর দক্ষিণ ও বর্তমান হাওড়া জেলার মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। ঘাটাল ব্যতীত সমস্ত মেদিনীপুর কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই রাজ্যের উত্তর-পূর্বে, প্রান্তদেশে ছিল দুর্নিভিতত গ্রাম—শিবিরাজ্যের জেতুত্তর নগর থেকে কুড়ি যোজন দক্ষিণে। জাতকের বর্ণনা অনুসারে, চেতরাজ্য শিবি ও কলিঙ্গরাজ্যের মধ্যবর্তী একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। শিবি ও চেতরাজ্যের পূর্ব সীমায় ছিল ভাগীরথী।

মহাভারতের বনপর্বে শিবিরাজাকে রাজর্ষি বলা হয়েছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে শিবিরাজার অবস্থান প্রাচীন যুগেই ছিল। মনে হয় জৈন ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম, এই দুইটি অবৈদিক ধর্মের প্রবর্তনের সম সময়ে অথবা কিছু আগে শিবি ধর্ম নামে অন্য এক ধর্ম প্রাচ্য ভারতে এবং বিশেষ করে বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। এই অনুমিতির কারণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে খৃঃ পূঃ অষ্টম / সপ্তম শতাব্দীতে বঙ্গদেশের কোন অংশে এবং বিশেষভাবে, রাঢ়বঙ্গে কোন আর্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু রাঢ় বঙ্গে এক শিবি ধর্মের অস্তিত্বের কথা নির্ভরযোগ্য ভাবে জানা গেছে।

সিব্রিয়াম (যা টলেমির মানচিত্রেও আছে) খুব সম্ভব শিবিপুরম এর রূপান্তর এবং শিবিরাজের নামের সঙ্গে সংযুক্ত। মহাভারতের সাক্ষ্য অনুযায়ী শিবিরাজার অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটেছিল। বৌদ্ধধর্মের আধিপত্যের পরে যখন ব্রাহ্মণ্য যুগে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে মহাভারত চূড়ান্তভাবে সংকলিত হয়, তখনই পূর্ববর্তী যুগের স্বনামধন্য এবং সাত্ত্বিকগুণসম্পন্ন মহীপতিদের বিবরণ এবং প্রসংশা-কীর্তন মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। টলেমি কর্তৃক উল্লিখিত সিব্রিয়ামের শিবিরাজ রাঢ়বঙ্গে নরপতি ছিলেন এবং তিনি বৈদিক অথবা অবৈদিক যে ধর্মেরই অনুসরণকারী হোন, নিজের চারিত্রিক মাহাত্ম্যের জন্য বৌদ্ধজাতক কাহিনীতে অক্ষয় স্থান লাভ করেছিলেন।

শিবিরাজ দানশীলতার জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এর প্রমাণ আছে 'জাতক' গ্রন্থে ও অন্যান্য গ্রন্থে। 'বেসসান্তর জাতক' (সংস্কৃতে বিশ্বন্তরজাতক) ও শিবিজাতকের মতে শিবিদেশের রাজা ও রাজকুমার আধ্যাত্মিক দানের সহায়তায় নিজেদের যশ বৃদ্ধি করেছিলেন। এই দুটি জাতক কাহিনী এবং 'উম্মদন্তী' জাতক

পাঠে জানা যায় যে সেই সময়ে শিবিরাজার অসামান্য ও অলৌকিক দানের মধ্যে শিবি ধর্ম এক অতি উচ্চমানসম্পন্ন ধর্মের রূপ পরিগ্রহণ করে জনমানসে স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে নিঃসন্দেহে জৈন ধর্ম প্রাচীনতর এবং নেমিনাথ প্রমুখ জৈন তীর্থংকরদের ধর্মপ্রচারের মাহাত্ম্যে, রাঢ়বঙ্গে জৈন ধর্মের প্রভাব বৌদ্ধধর্মের পূর্বগামী, যদিও বর্ধমান মহাবীরের আগে (খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী) জৈন ধর্ম কোন বিশিষ্ট রূপে তখনও ধারণ করে নি।

শিবিধর্মের দানের আধিক্য এবং আধ্যাত্মিক প্রবণতা বৈদিক ধর্মের কঠোর নিয়মপন্থী যজ্ঞ-প্রবণতার পরিপন্থী। সুতরাং সে ধর্ম ব্রাহ্মণদের আনুকূল্যপ্রাপ্ত ধর্ম নয়। সেই ধর্ম হৃদয়ের ধর্ম এবং বৈরাগ্যের ধর্ম যা আমরা পেয়েছি প্রাগার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে। এমন হৃদয়ধর্মী দানশীলতা ও ত্যাগশীলতা বঙ্গদেশের এই রাঢ়ভূমিতে পরিলক্ষিত হয়েছিল, এবং যার সঙ্গে একমাত্র অঙ্গাধিপতি দাতাকর্ণের দান ও ত্যাগের মহিমা তুলনীয়। বলাই বাহুল্য, রাঢ়বঙ্গ ও অঙ্গদেশ প্রায় একই দেহের দুই অঙ্গের মত এবং ইতিহাসের নিরীখে কখনও বা রাঢ়বঙ্গ (সুহ্ম প্রসুহ্ম) অঙ্গদেশের অন্তর্গত, কখনও বা রাঢ়দেশ অঙ্গের সঙ্গে জড়িত। আমাদের আলোচ্য গঙ্গারিডি দেশ ও জাতি এই অঙ্গ-রাঢ়েরই অন্তর্গত এবং সেই গঙ্গারিডি দেশ ও জাতি যে শিবি ও চেত রাজ্যের সীমাকে ভিতরে নিয়েই গঠিত ছিল, এমন অনুমান করা অন্যায় নয়।

পরবর্তী কালে, যথা আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের সময়ে গৌড় ও পুণ্ড্রের সীমা হয়তো শিবিরাজ্য পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল এবং তার আগেই খৃঃ পূঃ অষ্টম / সপ্তম শতাব্দীতে শিবিরাজ্য হয়তো সমগ্র রাঢ়দেশ অথবা দক্ষিণ রাঢ়ে পরিব্যাপ্ত ছিল। আচারাঙ্গ সূত্রে কোডিবর্ষ বা পশ্চিম দিনাজপুরের বানগড় অঞ্চলেই রাঢ়ের রাজধানী ছিল বলা হয়েছে। এই কোডিবর্ষ অথবা কোটিবর্ষকে কেউ কেউ বর্তমান কাটোয়ার সমার্থক বলেছেন। কিন্তু এই অনুমান সঙ্গত বলে মনে হয় না।

মহাভারতে বর্ণিত শিবি উপাখ্যান শিবি দেশের রাজাদের এই সাত্ত্বিক দানপ্রাচুর্যের সমর্থন করে। শিবি ধর্ম নামে প্রচলিত এই প্রাচীন ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শিবিরাজাদের দানশীলতা সম্বন্ধে বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থসমূহ থেকে যে সব তথ্য জানতে পারা যায়, তার মধ্যে এক যাচকের প্রার্থনা অনুযায়ী শিবিরাজের নিজের চক্ষুদানের কাহিনী অন্যতম। এক শ্যেন পক্ষীকে নিজের দেহের মাংস দান করে এক পারাবতের জীবন রক্ষা করেছিলেন শিবি রাজ। আরও একজনের কাতর ভিক্ষায় নিজের মস্তক দান করেছিলেন। শিবি রাজ্যের রাজারা বৌদ্ধধর্মগ্রন্থে ও সাহিত্যে মহাদাতা বলে কীর্তিত হয়েছেন ; কারণ, বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুসারে এই সকল দানের দ্বারা দান পারমিতা পূর্ণ করেছিলেন।

শিবভক্তদের শিবি বলা হয়েছে। এই শিবভক্ত বা শৈবধর্মাবলম্বী কারা ? পশ্চিমবঙ্গে প্রাগার্য দ্রাবিড় সংস্কৃতিতে যে শিব-আরাধনার প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য ছিল, তার উদার, ত্যাগশীল, নিরাসক্ত হৃদয়ধর্মের মধুর রস ও মাধুর্যপূর্ণ আচার শিবি ধর্মের মধ্যে পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল। শিবি ধর্মের ঔদার্য ও মহত্ত্ব প্রথমে জৈন এবং বিশেষ-

ভাবে বৌদ্ধধর্মকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। গৌতম বুদ্ধের শিবি ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও আকর্ষণ জাতক কাহিনীর মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে।

মনে হয় শিবি ধর্ম অনুসরণকারী মহৎহৃদয় নৃপতিদের রাজ্যই দেশের অনেক স্থানে শিবিরাজ্য-এই আখ্যা পেয়েছিল। এইজন্য পঞ্চনদে, রাজপুতনায়, বঙ্গদেশে শিবি রাজ্যের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে, যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ এই বঙ্গ দেশের শিবিরাজের উল্লেখ বৌদ্ধ জাতককাহিনী ছাড়া কোথায়ও নেই!

জাতক কাহিনীর বর্ণনা অনুসারে চেতরাজ্য ষাট হাজার ক্ষত্রিয়ের আবাসভূমি। চেতা থেকে পশ্চিমে পনের যোজন দূরে বনভূমি, যা পরে বনদ্বার নামে পরিচিত। বর্তমান খাতড়া, সম্ভবতঃ সিমলাপালের অদূরবর্তী কোন স্থান। সেখান থেকে উত্তরে প্রায় পনের যোজন দূরে তিনটি পাহাড় ও কেতুমতী (বর্তমান শিলাবতী নদী) অতিক্রম করে বংকগিরির অবস্থান। কলিঙ্গদেশে তৃতীয় রাজবংশের খারবেল (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) ক্ষত্রিয় চেত বংশ উদ্ভূত।[২৬] জাতকে বর্ণিত চেতরাজ্য কলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত থাকা বিচিত্র নয়।

চেতরাজ্য ছিল শিবিরাজ্য ও কলিঙ্গরাজ্যের মধ্যবর্তী। শিবিরাজ্যের প্রধান নগরী জেতুত্তর নগর ও কলিঙ্গদেশের সীমান্তের মধ্যে দুটি গিরি ও কাশ্টিমার নদী, হয়তো বর্তমান দামোদর নদী। এই অঞ্চলের দক্ষিণে ছোট ছোট পাহাড (টিলা) এখনও আছে। জেতুত্তর থেকে ৭০।৮০ মাইল পশ্চিমে বোধহয় বংকগিরির অবস্থান। বর্তমান বাঁকুড়া শহর থেকে ১৫।২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে বংকগিরির অবস্থান এবং এ দুটি স্থানের যে নাম তাদের শব্দের সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। জাতক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে শিবিদেশে উগ্রক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ রাজ্যের শক্তিশালী অধিবাসী। বর্তমান বর্ধমানের নিকট অনেক স্থানেই উগ্রক্ষত্রিয়দের আবাস।

অনেকে মনে করেন যে বংকগিরি ও শুশুনিয়া পাহাড় এক এবং অভিন্ন।[২৭] এই বঙ্ক গিরিতে শিবিরাজ বেসসান্তর একটি আশ্রম স্থাপন করেন এবং শিবি ধর্ম প্রচার করেন। এই আশ্রমের নাম হয় 'বেসসান্তর আশ্রম'। পরবর্তীকালে এই এই আশ্রমে আরাধ মুনি বাস করতেন।

গৌতম সিদ্ধার্থ, মহানিষ্ক্রমণের পর বেসসান্তর আশ্রমে এসে আরাধমুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধধর্ম এই শিবি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কথা গৌতম বুদ্ধ নিজের মুখেই বলে গেছেন। কপিলাবস্তুর শাক্যদের কাছে তিনি ঘোষণা করেন যে পূর্বজন্মে বোধিসত্ত্বরূপে তিনি শিবি রাজপুত্র বেসসান্তর নামে জন্ম গ্রহণ করে তাঁর অতিদানের দ্বারা দান পারমিতা পূর্ণ করেছিলেন। নির্লোভ না হলে নির্বাণ হয় না, একথা বোঝাবার জন্যই তিনি শিবি রাজপুত্র বেসসান্তরের অসামান্য আধ্যাত্মিক দানের কথা বিবৃত করেছিলেন।[২৮]

আমরা আরও অবগত হই যে বেসসান্তর জাতক অনুযায়ী বেসসান্তর ছিলেন শিবিদেশের রাজপুত্র। পিতা রাজা সঞ্জয়, মাতা পুষতী, স্ত্রী মাদ্দী; পুত্র ও কন্যা

জালিকুমার ও কৃষ্ণাজিনা। পরজন্মে সঞ্জয়ই রাজা শুদ্ধোধন, পুষতী মহামায়া, মাদ্দী রাহুলের মাতা এবং বেসসান্তর গৌতম বুদ্ধ।

শিবিরাজের উদারতা ও ত্যাগব্রতের উপর প্রতিষ্ঠিত উচ্চ নৈতিক মানসম্পন্ন শিবিধর্ম যে বৌদ্ধ ধর্মকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল, সে বিষয়ে অল্পই সন্দেহের অবকাশ আছে। এই শিবিরাজ ও শিবিধর্ম যে রাঢ়ে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ধর্ম-পূজার উৎসস্থল, তা প্রকাশ করেছেন এক গবেষক তাঁর নিম্নলিখিত মন্তব্যের মধ্যে ঃ—

"জাতক বর্ণিত "জেতুত্তর" হইতে "দুন্নিভিত" এবং চেতা হইয়া বংকগিরির পথ নির্ণায়ক বর্ণনা পাঠে পাঠকের মনে স্বভাবতঃই এই তত্ত্ব জাগরিত হইবে যে রাঢ়ভূমিই অতীতের শিবিরাজ্য ও শিবিরাজগণের লীলাভূমি এবং ধর্মপূজার পূজাগ্রহণকারী মূলদেবতা ধর্মরাজরূপে শিবি স্বয়ং। কালক্রমে তাঁহার সহিত গৌতমবুদ্ধ এবং দ্যুতিসম্পন্ন ষষ্ঠবুদ্ধ কশ্যপ যুক্ত হইয়াছেন ও তিনজনই ধর্মরাজরূপে পূজা পাইয়া আসিতেছেন"।[২৯]

শিবিরাজের দান-মাহাত্ম্য ও আত্মত্যাগপরায়ণতা বৌদ্ধ মানসিকতায় অত্যন্ত উন্নত স্থান অধিকার করেছিল। পরবর্তী যুগে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের সময়ে এই ঘটনাগুলির উপর বৌদ্ধ সন্ন্যাসী মঠাধ্যক্ষ, শ্রমণ ও সাধারণ ধর্মপ্রচারকগণ আলোকপাত করে, জনসাধারণকে উচ্চতর নৈতিক ও বৈরাগ্যপূর্ণ জীবন ধারণে উৎসাহিত করেন। বৌদ্ধ সম্রাট অশোক (২৭৫-২৩২ খৃঃ পূঃ) এই ঘটনাগুলি চিরস্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে তক্ষশীলায় সেই যুগের উপযোগী কতগুলি স্তূপ নির্মাণ করেন।[৩০] শিবিরাজের মহৎ দৃষ্টিভঙ্গী ও উদার আত্মদানের দৃষ্টান্তগুলির প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও রাষ্ট্রের সম্মান জ্ঞাপনের জন্য সম্রাট অশোক সেই স্তূপগুলি তাঁদের স্মৃতিতে উৎসর্গ করেন।

এই স্তূপগুলি যথাক্রমে চ্যুতশীর (শির ?) স্তূপ, চক্ষুদান স্তূপ, দেহদান স্তূপ এবং মাংসদান স্তূপ। চ্যুতশীর স্তূপে পূর্বজন্মে বোধিসত্ত্ব রূপে তথাগত যে নিজের মস্তক দান করেছিলেন, সেই ঘটনাকে স্মরণ করা হয়েছে।

চক্ষুদান স্তূপ—শিবিজাতক এই স্তূপ স্থাপনের উৎসমূল। শিবিরাজা যাচকের যাচঞা অনুযায়ী নিজের চক্ষু দান করে আধ্যাত্মিক দানের চরম উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন।

দেহদান স্তূপ—চেতো (CETO বা Satho) রাজকুমার জন্মে বোধিসত্ত্ব ক্ষুধায় কাতর ও মরণাপন্ন বাঘকে নিজের দেহ ভক্ষণ করতে দিয়ে তার প্রাণ রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। বেসসান্তর জাতকে এই চেতো রাজ্যের উল্লেখ আছে। এই রাজ্য বেসসান্তরের মাতুল রাজ্য।

মাংসদান স্তূপ—শিবিরাজা নিজের দেহের মাংস দান করে শ্যেন পক্ষীর নিকট থেকে পারাবতকে রক্ষা করেছিলেন—(মহাভারতে শিবি উপখ্যান দ্রষ্টব্য)।

জাতকের এই কাহিনীগুলি রূপক বর্ণনা বলে অনুমান করা যায়। শিবিরাজাদের আত্মত্যাগ ও দানের মহিমাকে অপ্রস্তুত প্রশংসার দ্বারা অলংকৃত করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের উপর এই কাহিনীগুলির প্রচার ও প্রতিক্রিয়া অসামান্য। বৌদ্ধধর্মের 'ত্রিশরণ'—

বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের মধ্যে তথাগত বুদ্ধ স্বয়ং ধর্মের স্থানটি আলোকিত করে ধর্মের প্রচ্ছদে শিবিরাজের আত্মার মধ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক দীর্ঘস্থায়ী আসন অধিকার করেছেন।

চীন পরিব্রাজক ফা হিয়েনের (৪০০-৪১৪ খৃষ্টাব্দ) তক্ষশীলার বর্ণনায়[১১] সেই সুবৃহৎ ঐতিহাসিক স্তূপগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য লাভ করা যায় এবং আরও অবগত হওয়া যায় যে তখনও স্তূপগুলিতে দিবারাত্র পূজার ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং অনুমান করা যায় যে ফা হিয়েনের সময়ে অর্থাৎ গুপ্ত সম্রাটদের আমলে বৌদ্ধ ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্মের মহিমময় স্থান থেকে চ্যুত হলেও, ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে বৌদ্ধ প্রভাব যথেষ্ট প্রবল ছিল। পরে বিধর্মী শ্বেত হুনদের আক্রমণে ঐ অঞ্চলের সমস্ত নগর, মন্দির প্রভৃতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সপ্তম শতাব্দীতে হিউ-য়ান-সাঙ (Heuan Tsang) তক্ষশীলায় উপস্থিত হয়ে, সেই স্তূপগুলির ধ্বংসাবশেষ দেখেছিলেন।

জীবের প্রতি অহিংসা, দয়া ও করুণায় বোধহয় জৈনধর্মই বৌদ্ধধর্ম থেকে অনেক বেশী অগ্রসর হয়েছিল। শিবিরাজের ও রাজপুত্রের শিবিধর্ম হয়তো জৈনধর্মের মানবিকতা ও বৈরাগ্য থেকে প্রচুর প্রেরণা লাভ করেছিল এবং পশ্চাদবর্তী বৌদ্ধ ধর্মকে প্রভাবিত করেছিল। সেই প্রভাবজাত ভক্তি এবং শ্রদ্ধার কারণেই গৌতম বুদ্ধ শিবিরাজকে বোধিসত্ত্বরূপে (বেসসান্তর) আত্মসাৎ করে সেই সূত্রে জনপ্রিয় ধর্মরাজ আখ্যা পেয়েছিলেন।

রাঢ় অঞ্চলের ধর্মরাজ এবং তাঁর সঙ্গে পূজিত দেবতারা মূলতঃ বৌদ্ধ-ভাবনা-সঞ্জাত বলে মনে করা অন্যায় নয়। কালক্রমে ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক দেবতাদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত হয়ে তাঁরা সকলেই ধর্মরাজরূপে পূজিত হচ্ছেন। 'ধর্মের' স্থানে কোন জায়গায় বুদ্ধমূর্তি, কোন জায়গায় কচ্ছপমূর্তি।

ধর্মপূজো নিম্নজাতীয় হিন্দুদের নিকট রাঢ়দেশে গণপূজার সমতুল্য, কারণ এই পূজা অনগ্রসর দরিদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত (হাড়ি, মুচি, ডোম) এবং অনেকের ধারণায় নিষাদ সংস্কৃতির চিহ্নবিশেষ। কালক্রমে পূর্বভারতে তান্ত্রিক ধর্মের প্রাবল্যে, অনেক ধর্মমন্দিরে শ্রীশ্রীধর্মরাজ নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়ে পূজিত হন।[১২] রাঢ়দেশে এই ধর্মপূজা এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। অধিকাংশ স্থানেই শুধুমাত্র সিঁদুর-লিপ্ত শিলাখণ্ডের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন।

শিবিরাজ্য ও সেই রাজ্যের রাজাদের উচ্চ ও মহৎ ভাবমূর্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে এই কথা বলা যায় যে পরবর্তী যুগে বৌদ্ধ ধর্মের উপর তার প্রভাব এবং ধর্মরাজ পূজার প্রচলন রাঢ়দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি ধারাবাহিক বিবর্তনের নির্দেশ করে। ধর্মরাজ এই নামের দেবতার উদ্ভাবন ও তাৎপর্য সম্বন্ধে উপসংহার রচনায় নিম্নলিখিত উদ্ধৃতির আশ্রয় গ্রহণ করা যেতে পারে :—

"আমাদের আলোচনা হইতে ইহাই প্রতিভাত হইবে যে ধর্মরাজ একটি প্রাক-গৌতম-বুদ্ধ সংজ্ঞা যাহা তৎকালীন রাঢ়ের এক মহাদানশীল মহৎ চরিত্রের ঐতিহাসিক

নৃপতিকে বুঝাইত। স্বীয় রাঢ় ভূমিতে তাঁহার পূজা সম্ভবতঃ প্রাক বৌদ্ধ যুগেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার বৌদ্ধকরণের পরে বৌদ্ধ যুগে তাঁহার আসনে গৌতম বুদ্ধের আগমন ও পূজা গ্রহণ স্বাভাবিক ঘটনা।"৩৩

বর্ধমানের নিকট শিবিরাজাদেব রাজধানী ছিল। গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ী বলে প্লিনী কর্তৃক বর্ণিত জাতির রাজধানী ছিল 'পোর্তালিস', বর্ধমান অথবা তার সন্নিকটবর্তী স্থান। শিবিরাজাদের অবস্থান এর কয়েক'শ বছর আগে সন্দেহ নেই। এই কথা স্মরণীয় যে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গেরই কোন রাজবংশ নিশ্চয়ই কালিঙ্গেয়ীদের সঙ্গে এক জোটে যুক্ত শাসনের পত্তন করেছিলেন এই মধ্য রাঢ়ে অর্থাৎ বর্ধমানে যাকে রাঢ়ের মধ্যমণি বলা হয়েছে।

ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে অথবা অল্প আগে আমরা সুহ্মদেশে তথা দক্ষিণ রাঢ়ে আরও দুটি সুপ্রসিদ্ধ রাজ্যের সংবাদ নানা সূত্রে আবিষ্কার করি। সেই সূত্রগুলির ঐতিহাসিক মূল্য কতখানি এবং আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবর্তন ও প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্যগত মর্যাদায় সেগুলি কি পরিমাণে বিশ্বাসযোগ্য, সে সম্বন্ধে আমাদের উপযুক্ত অনুসন্ধান ও সমীক্ষার প্রয়োজন।

ডঃ সুকুমার সেনের অভিমতে ('বঙ্গভূমিকা' দ্রষ্টব্য) রাঢ়দেশে তথা পশ্চিমবঙ্গে তখনও রাজতন্ত্র উল্লেখযোগ্যভাবে প্রচলিত হয় নি। কিন্তু আমাদের সঙ্গে যে সকল তথ্য আছে, তার থেকে এমন মনে করা নিতান্তই অসঙ্গত নয় যে পশ্চিমবঙ্গের কৌমভিত্তিক সমাজেও অনেক স্থানে কায়েমী স্বার্থ ও অধিকারের প্রশ্ন প্রবলতর হয়ে সেই সময়ে রাজতন্ত্রকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেছিল, এবং রাজাদের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এটা যে নগর সভ্যতা প্রচলনের পরে হয়েছিল, এমন অনুমান করা অন্যায় নয়। ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তি ও মালিকানার উদ্ভব থেকে ভূপতির প্রয়োজন এবং ক্রমে ক্রমে কর্ম বিভাগের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

রাঢ়দেশে অতি প্রাচীন কাল থেকেই অতি সুসভ্য জাতির বাস ছিল এবং তদনুরূপ সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছিল। একথা আগেই বলা হয়েছে যে এই গঙ্গারিডি দেশে আরও দুটি প্রাচীন রাজবংশের অস্তিত্বের বিষয়ে জানা যায়। একটি, হুগলীর সিংহরণের সিংহবংশ। অপরটিও হুগলী জেলায়, গৌতম বুদ্ধের খুল্লতাত ভ্রাতা পাণ্ডুশাক্যের স্থাপিত রাজ্য, যার রাজধানী ছিল পাণ্ডুয়া। অনেকে গ্রীক ও ল্যাতিন ভাষায় লিখিত বিবরণে কথিত পোর্তালিস আর পাণ্ডুয়া এক ও অভিন্ন মনে করেন। "বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাস" প্রণেতা ধনঞ্জয় দাশমজুমদার (পুরাতত্ত্ব বিশারদ কবিরত্ন) এই অভিমত পোষণ করেছেন এবং তিনি এই পাণ্ডুয়ার রাজাদের কলিঙ্গী গোষ্ঠীজাত গঙ্গারাঢ়ীদের (গঙ্গারিডিদের?) সর্বশক্তিমান নরপতি বলে উল্লেখ করেছেন।

এই ঐতিহাসিকের মতে মৌর্য সম্রাট অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধে এই গঙ্গারাঢ়ীদের পরাজিত করে তাদের নগর ও গ্রামগুলি ধ্বংস করেন এবং প্রায় দেড় লক্ষ লোককে রাজপুতানার মরুভূমিতে নির্বাসিত করেন। 'রাজপুতানাতে গৌড় রাজপুতেরা অতি

প্রাচীন কালে আগত। রাজপুতানার ইতিহাস দেখিলে জানা যায়, রাজপুতানার নানা স্থানে গৌড় রাজপুতগণের বাস ছিল। হয়তো তাহারা গৌড় হইতে আগত'।[৩৪]

কলিঙ্গ যুদ্ধ বর্ধমানের নিকটই অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এখনও এখানে খননকার্য সম্পাদিত হলে, অশোকের গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়দের নগর ও গ্রাম লুণ্ঠন ও ধ্বংসের চিহ্নস্বরূপ পোড়ামাটি, পোড়াশস্য প্রভৃতি আবিষ্কৃত হবে।[৩৫] এখানে এই কথা স্মর্তব্য যে মেগাস্থিনিসের বিবরণভিত্তিক প্লিনীর লেখনী মারফৎ জানা যায় যে পার্থালিস অথবা বর্ধমান অথবা পূর্বস্থলী কলিঙ্গীদের রাজধানী ছিল। অবশ্য এই কলিঙ্গী অথবা কালিঙ্গেয়রা গঙ্গারিডিদের সঙ্গে জাতিগত ভাবে সংশ্লিষ্ট বলেই মনে হয়।

জৈনধর্মের অভ্যুত্থান থেকে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ে এবং মহাপদ্ম নন্দের বংশ থেকে মৌর্য বংশের হাতে ভারতের আধিপত্য হস্তান্তরের সময়ে এবং মৌর্য সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ বিজয় ও পরবর্তী ধর্ম বিজয়ের সময়ে এবং শেষ পর্যন্ত খৃষ্টীয় শতাব্দীর সূচনায় গঙ্গারিডি দেশ / জাতি নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় ও সমতল ভূমিতে সাগর সঙ্গম পর্যন্ত মূলতঃ গঙ্গার পশ্চিম তীরেই সীমাবদ্ধ ছিল।

দুঃখের বিষয়, গঙ্গারিডিদের চিহ্নিত করণের প্রচেষ্টা অনেক সময় বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের ব্যক্তিগত খেয়ালের ও আঞ্চলিক পক্ষপাতিত্বের সঙ্কীর্ণ মনোভাব মধ্যে ব্যাহত হয়েছে। আচ্ছন্ন ও অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী তাঁদের ঐতিহাসিক বিচারবুদ্ধিকে অবাস্তব সিদ্ধান্তে উপনীত হতে প্রভাবিত করেছে। সেই কারণেই তাঁরা গঙ্গার পশ্চিম-পারের বঙ্গভূমিকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান না করে গঙ্গারিডি শুধুমাত্র গঙ্গার পূর্বতীরে—এই অবাস্তব অভিমত প্রকাশ করেছেন।

বৌদ্ধ সম্রাট অশোক কলিঙ্গ জয়ের পরে আর পূর্বদিকে রাজ্যবিস্তারে সচেষ্ট হন নি। অশোকের শিলালিপি থেকেই জানা যায় যে উগ্র ক্ষাত্রয়দের পৃষ্ঠপোষক মৌর্য সম্রাট মহারাজাধিরাজ অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধের নিষ্ঠুর লোকক্ষয়ে এবং রক্তপাতে বিচলিত হয়ে হৃদয়ে এক প্রগাঢ় পরিবর্তন অনুভব করেছিলেন।[৩৬]

'দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী' অশোক বাহুবল পরিত্যাগ করে হৃদয়ের বল, অর্থাৎ ধর্মের দ্বারা শাসন করার বাসনাই পোষণ করেছেন পরবর্তী সময়ে এবং সমস্ত প্রজাদের নিজের সন্তান তুল্য বিবেচনা করেছেন।[৩৬] মহাপ্রাণ তথাগত বুদ্ধের স্মরণে বৌদ্ধ মহাযান ধর্ম সম্প্রদায়ের এবং ধর্ম দর্শনের উৎপত্তি সেই সময়ে বা তার কিছু আগে সংঘটিত হয়েছিল এবং অশোকের ধর্ম সভাগুলিতে এই মহাযান কৃষ্টি একটি বিশেষ রূপে পরিগ্রহণ করেছিল।

ভারতবর্ষে এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে এবং প্রাচ্য জগতে, তথা সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চীন, জাপান, ইন্দোচীনে এই নূতন ধর্মের প্রভাবে এবং প্রচারে তথাগত বুদ্ধ শিক্ষাগুরু থেকে সর্বশক্তিমান ভগবানের আসনে উন্নীত হয়েছিলেন। অহিংসা, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে এবং বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই ত্রিশরণের শক্তি ও মহিমায় উদ্ভাসিত বৌদ্ধধর্ম একটি জগৎ ব্যাপী মহাধর্মরূপে অভিনন্দিত হয়েছিল। সেই সুদূর অতীতে কোথায়ই বা আজকের পৌরাণিক হিন্দুধর্ম, কোথায়ই বা খৃষ্টধর্ম?

জৈন ধর্ম ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করতে পারে নি। গঙ্গারিডির ইতিহাস বলে যে বুদ্ধ তথাগতের জীবদ্দশায় বৌদ্ধধর্ম বঙ্গদেশে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে নি, এমন কি এখানে কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিই হয় নি, এই ধর্মের। এর কারণ, শিবি ধর্ম ও জৈন ধর্ম এবং অন্য উন্নত ধরণের প্রাক-আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির অপরিসীম ও প্রায় দুর্লঙ্ঘ প্রভাব, যার জন্য আর্য সভ্যতার ধ্বজাধারীদের বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে কয়েক শতাব্দী ধরে বিশেষ শ্রম সহকারে সংগ্রাম করতে হয়েছিল।

যে পালিভাষার অস্তিত্বকে আমরা বুদ্ধের সময় থেকে জানতে পারি, সেই পালিভাষা (সংস্কৃতের অপভ্রংশ) আর্য ধর্ম ও ভাষা বিস্তারের সময়ে সাধারণ লোকের কথ্য ভাষার আড়ালে প্রাকৃত থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। সেই পালিভাষা তথা প্রাকৃত ভাষাই আর্যদের ভাষা বিজয়ের পথে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারে সহায়ক হয়েছিল। জৈনেরা হয়তো সংস্কৃতই বেশী ব্যবহার করেছিল, কিন্তু পালিকেও তারা আশ্রয় করেছিল। বুদ্ধদেব নিজে পালিভাষা ব্যবহারের অনুমোদন করেছিলেন, কারণ সেটাই ছিল সাধারণ লোকের বোধ্য ভাষা, কথ্য ভাষাও বটে।

এর মধ্যে যে আদি ভাষা সমূহ যথা অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় প্রভৃতি কত শব্দের আদান-প্রদান ও সংমিশ্রণ ঘটেছিল, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু আর্য ভাষার অনুপ্রবেশই প্রাচ্য দেশে, তথা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ় (সুহ্ম), প্রাগজ্যোতিষ প্রভৃতি দেশে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্প্রসারণকে অনুমতি পত্র প্রদান করেছিল। ধর্ম ও সংস্কৃতির মোহজাল বিস্তৃত করে যা সম্পন্ন করা যায় নি, ভাষার আক্রমণে ও আদান-প্রদানে তা ক্রমশঃ করা সম্ভব হয়েছিল।

জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম উত্তর ভারতে প্রবল হয়েছিল ঐতিহাসিক যুগের সূচনার আগে থেকেই। আর্য সভ্যতা বিরোধী বঙ্গদেশ এই ধর্মকে বরণ করেছিল। কিন্তু এই দুই ধর্মের কিছু পরে উত্তরবঙ্গ দিয়ে প্রবেশ করেছিল বৈদিক ধর্ম ও আর্য ভাষা। সে ভাষা বহন করে এনেছিল আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি। ধীরে ধীরে আর্য ভাষার সাংস্কৃতিক বিজয় সম্পন্ন হলো।[৩৬] এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল বেশ কয়েক শ' বছর ধরে।

শিবিরাজ্য, চেতরাজ্য ব্যতীত সিংহবংশীয় প্রবল পরাক্রান্ত নরপতিদের সিংহপুর (বর্তমান সিঙ্গুর?) রাজ্য খৃঃ পূঃ অষ্টম / সপ্তম শতাব্দী থেকে বর্ধমান মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধের জন্ম সময়ের মধ্যে রাঢ়দেশে বিদ্যমান ছিল। এর মধ্যে শিবিরাজ্য মধ্য রাঢ়ে এবং সিংহপুর রাজ্য দক্ষিণ রাঢ়ে সগৌরবে বিরাজিত ছিল। অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে অপারমন্দার (গড় মান্দারণ?) রাজ্য অতি প্রাচীন।[৩৭]

খৃঃ পূঃ ১৮৮ অব্দে মৌর্য সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। সেই সময়ে শিবিরাজ্য ও চেতরাজ্যের অস্তিত্ব ছিল কিনা তা অভ্রান্তভাবে বলা যায় না। সিংহপুরের (সিংহরণের) সিংহ বংশীয় রাজাও তখন লুপ্ত হয়েছে। পালিভাষায় লিখিত সিংহলের প্রাচীন কাহিনী 'মহাবংশ' ও 'দীপবংশ' থেকে সিংহবংশ ব্যতীত রাঢ়দেশের অন্য আর একটি প্রাচীন রাজ্যের কথা জানা যায়। হয়তো অশোকের মৃত্যুর সময়ে অথবা মৌর্যবংশের পতনের সময়েও এই রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল।

সিংহলীয় প্রাচীন পালিগ্রন্থ দুটি থেকে জানা যায় যে কাশী ও কোশলের দাসী গর্ভজাত নৃপতি বিরূঢ়ক কপিলাবস্তুর শাক্য রাজ্য আক্রমণ করে সাতাত্তর হাজার শাক্যকে নিহত করেন এবং পাঁচশ শাক্য কন্যাকে বন্দী করেছিলেন। এই যুদ্ধের কিছু আগে গৌতম বুদ্ধের খুল্লতাত অমৃতোদন শাক্যের পুত্র পাণ্ডুশাক্য স্বজন সহ কপিলাবস্তু ত্যাগ করে রাঢ়ের অন্তর্বর্তী ত্রিবেণীর (গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম) নিকট রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। পাণ্ডুশাক্যের নামানুসারে, এই রাজ্যের রাজধানীর নাম হয় পাণ্ডুয়া।[৩৮]

পাণ্ডুশাক্যের নূতন রাজ্য যে আর্য সভ্যতার বহির্ভূত ছিল, তা বলাই বাহুল্য। শিবিরাজ্য থেকে আরম্ভ করে উল্লিখিত কোন রাজ্যের কথাই আর্যশাস্ত্রে ও সাহিত্যে নেই। সুতরাং, বলাই বাহুল্য, এই সব কটি রাজ্যই অন-আর্য বিবেচনায় আর্যদের লিপিবদ্ধ বর্ণনায় বর্জিত হয়েছিল।

পাণ্ডুয়ার উত্তরে অজয়নদীর তীরে অবস্থিত পাণ্ডুরাজার ঢিবি (প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলস্বরূপ) এই পাণ্ডুশাক্য রাজার নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিনা, তা বলা যায় না। কিন্তু নামগত সাদৃশ্যকেও উপেক্ষা করা যায় না।

'অজয়নদের অববাহিকার এই সভ্যতা যে হরপ্পা ও মহেন-জো-দাড়ো সভ্যতার সমকালীন ইহা স্বতঃসিদ্ধ। পাণ্ডুরাজার ঢিবি (৩২০০-৩৫০০ বর্ষের অতীত) নগর কাহিনীমণ্ডিত জনসমাজ কোন আর্যসভ্যতার জনসমাজ নহে, পাণ্ডুরাজার ঢিবি কোন আর্য সভ্যতার নিদর্শন নহে। ট্রাইব বাঙ্গালীর অবদান পাণ্ডুরাজার ঢিবি। ক্লান কমিউনিজম নামে সুবিদিত গ্রামীন অর্থনীতি (Communal capital) বাংলা-ভূমিতে (এবং ভারত মহাদেশের অন্যান্য জনপদে) চলিয়া আসিতেছে হাজার হাজার বছর ধরিয়া।'[৩৯]

দক্ষিণ রাঢ়ে অস্ট্রিক-দ্রাবিড় সভ্যতা হয়তো উদীয়মান জৈন ধর্মের প্রভাবে কিছুটা সংস্কৃত হয়েছিল, সেই সময়ে। কেউ কেউ মনে করেন, জৈন ধর্মই রাঢ় দেশে আর্যধর্ম প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত ঘটায়। বৌদ্ধ ধর্মকেও এখানে লড়াই করেই প্রবেশ করতে হয়েছিল। এই দুটি ধর্মই বঙ্গদেশে আর্যীকরণে বিলম্ব ঘটিয়েছিল। এর পরে এসেছিল শক্তিতন্ত্রের সাধনা, যা মাতৃতন্ত্রের পূজারী বাঙ্গালীর মন ও প্রাণ প্লাবিত করেছিল।

সামাজিক চাপ ও জাতিভেদ তখনও বঙ্গদেশে অজ্ঞাত। এই তন্ত্র যোগকে অঙ্গীভূত করে নিয়েই তবে এখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম শিকড় গড়তে সমর্থ হয়েছিল। এই গঙ্গার কিনারবাসী বাঙ্গালীকে গ্রীকেরা গঙ্গারিডি বলে বর্ণনা করেছে।

গঙ্গারিডি তথা গাঙ্গেয় বঙ্গভূমির সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস নির্ধারণে প্রথমেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে রাঢ়বঙ্গের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থাটি গভীরভাবে বিবেচনা করা কর্তব্য। খৃঃ পূঃ সপ্তম শতক থেকে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক পর্যন্ত যে কয়টি উল্লেখ-যোগ্য জনপদ অথবা রাজ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, সেগুলির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

মহাভারতের যুগ থেকেই তাম্রলিপ্তের অস্তিত্বের কথাও জানা যায়। সুহ্ম তথা

রাঢ়দেশের অন্তর্গত তাম্রলিপ্তের ইতিহাস ইতিমধ্যে বিস্তারিতভাবে কথিত হয়েছে। এখন রাঢ় দেশের অপর প্রধান কেন্দ্র সিংহরণ (সিংহপুর) সম্বন্ধে যে সব প্রামাণিক তথ্য বিক্ষিপ্ত আছে সেগুলি একত্রিত করার প্রয়াস প্রয়োজন।

আগেই বলা হয়েছে, রাঢ় দেশ এক সময়ে কলিঙ্গদেশের অন্তর্গত ছিল। প্লিনী (অবশ্যই মেগাস্থিনিসকে অনুসরণ করে) পোর্তালিসকে (পার্থালিস) গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ীদের রাজধানী বলে উল্লেখ করেছিলেন। এই রাজধানী বর্তমান বর্ধমান অথবা পূর্বস্থলী বলে চিহ্নিত হয়েছে। এরও আগে কলিঙ্গ দেশের রাজধানী হিসেবে সিংহপুরের নাম পাওয়া যায়। এই সিংহপুরের নাম প্রতিষ্ঠাতা সিংহবাহুর নামেই হয়েছিল, এবং সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহই সিংহলী প্রাচীন বিবরণ অনুযায়ী সিংহলের বিজয়ী নরপতি।[৩]

রাঢ়দেশে সিংহবাহু প্রতিষ্ঠিত সিংহবংশীয়দের প্রতিপত্তি আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের আগেই হয়তো ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সেইজন্যই খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে নিম্ন গাঙ্গেয় সাগর মোহনায় কলিঙ্গীদের পরিবর্তে গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ী জাতির নাম পাই।

এর থেকে অন্য আর একটি বিষয় পরিষ্কার হচ্ছে যে গঙ্গারিডিরা সেই প্রাচীন যুগে নানা কারণে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে একদিকে মগধের অপর দিকে কলিঙ্গের সঙ্গে সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। মহাপদ্ম নন্দ গঙ্গারিডি-উদ্ভূত এক বিজয়ী বীর যাঁকে পুরাণে 'সর্বক্ষত্রান্তক', এবং 'একরাট' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

যেমন মহাপদ্ম নন্দ মগধ বিজয়ের পরে প্রাসাই এবং গঙ্গারিডিদের মধ্যে এক সংযুক্ত রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনই মহাপদ্ম নন্দ কলিঙ্গ বিজয়ের পরে গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ী নামে এক যুক্তরাষ্ট্রের প্রবর্তন করেছিলেন, এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয়। অথবা, কলিঙ্গরাজ খারবেল যখন মগধ প্রভৃতি প্রাচ্য দেশ জয় করেছিলেন, তখন খারবেল হয়তো গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ী বলে এক সংযুক্ত রাষ্ট্রের প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু, গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ী গোষ্ঠীর সঙ্ঘবদ্ধতার পক্ষে যেটি সবচেয়ে প্রবল যুক্তি, তা হলো অশোকের কলিঙ্গ অভিযানে ভীত হয়ে কালিঙ্গেয়ীরা গঙ্গারিডিদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক সামরিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক মিলনের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এই কথা স্বীকার করলে ধরে নিতে হয় যে প্লিনী মেগাস্থিনিসের পরের কোন সূত্র অবলম্বন করে গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ীদের কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

মৌর্য সম্রাট অশোক এক স্বাধীন অথবা বিদ্রোহী কলিঙ্গের বিরুদ্ধেই আক্রমণ পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। সুতরাং মনে হয় কলিঙ্গ দেশ মহাপদ্ম নন্দ অথবা শেষ নন্দ রাজার পরে মগধ তথা প্রাসাইদের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়েছিল। কারণ, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কলিঙ্গদের পদানত করতে পেরেছিলেন বলে কোন প্রমাণ নেই। প্রবল প্রতাপশালী ও প্রতিদ্বন্দ্বী কলিঙ্গরাজকে রাজনৈতিকভাবে দমন করতে পরে মগধের শাসককে এক বিরাট সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নিতে হয়েছিল।

তখন গঙ্গারিডি তথা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যমণি রাঢ়দেশ ছিল কলিঙ্গদের প্রভাবাধীন।

সুতরাং কলিঙ্গের শত্রু মগধের বিরুদ্ধে গঙ্গারিডি তথা বাঙ্গালীরাও যুদ্ধ করেছিল এবং বীরের মতো প্রাণ দিয়েছিল। এই দুর্ধর্ষ শত্রুকে পরাস্ত করতে মগধের কেন্দ্রীয় শাসক সম্রাট অশোককে অত্যন্ত নির্মম ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হতে হয়েছিল।

গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস যে প্রাসাই ও গঙ্গারিডিদের যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখ করেছিলেন এবং যার উপর নির্ভর করে পরবর্তী গ্রীক ও রোমান লেখকেরাও এই ঐক্যবন্ধ অথবা সম্মিলিত শক্তির কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন, মনে হয় সেই যুক্তরাষ্ট্র মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের শাসনকাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। প্লিনীর বিবরণ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে হয়তো সেই সময়েও গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ী সাগর মোহনায় প্রবল ছিল এবং এই শক্তিশালী জাতিই কোনভাবে সম্রাট অশোকের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি এবং রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবকে ক্ষুণ্ন করতে উদ্যত হলে, ইতিহাসে উল্লিখিত ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী কলিঙ্গ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। মগধ ও কলিঙ্গের শত্রুতা অশোকের পরবর্তীকালে মগধের শুঙ্গবংশ এবং কলিঙ্গের তৃতীয় রাজবংশ মেঘবাহন (চেত) বংশের দ্বিতীয় খারবেল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দী)।

তৎকালীন ইতিহাসের অনুসন্ধানের এবং সীমিত পরিমাণ তথ্যের মর্মোদ্ধারের দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে আসি যে রাঢ়বঙ্গে শিবিরাজ্য, চেতরাজ্য, কলিঙ্গরাজ্য, পাণ্ডুশাক্য রাজ্য প্রভৃতির সঙ্গে সিংহপুরের সিংহ বংশীয়দের রাজ্যও সুপ্রসিদ্ধ ছিল। সিংহল দেশের 'মহাবংশ' নামে অতি প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে (পালিভাষায় লিখিত) এই বিবরণ পাওয়া যায় যে বঙ্গদেশীয় এক সুন্দরী রাজকন্যাকে (যার নাম সুপ্রা বা সুসীমা) তার পিতৃভূমি কলিঙ্গদেশের উদ্দেশে ভ্রমণের সময়ে রাঢ় দেশের গভীর জঙ্গলে দস্যু সরদার সার্থসিংহের (অনার্যজাতি যাদের টোটেম সিংহ) অনুচরেরা হরণ করে। তারা সেই রাজকন্যাকে তাদের দলপতির সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করে। সিংহবাহু নামে এই দম্পতির এক মহা শক্তিশালী পুত্র জন্মেছিল। এই পুত্র লাড় (রাঢ়) দেশের শত যোজনব্যাপী জঙ্গল পরিষ্কার করে গঙ্গার সমীপবর্তী রাঢ়দেশে সিংহপুর নামে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্তমানে হুগলী জেলার সিঙ্গুর থানা থেকে বারো মাইল দূরে সিংহল পটন গ্রামে এই সিংহপুর রাজ্যের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষের স্তূপ ইত্যাদি দেখা যায়। ঘেরা নদীর তীরে এখনও অর্ণব পোতের বন্দরের চিহ্ন আছে। মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুযায়ী এখানে গঙ্গা ৩০ স্টেডিয়া অথবা আট মাইল প্রশস্ত ছিল। সুতরাং সেই কালে এই স্থান গঙ্গানদীর সন্নিহিত অঞ্চলেই ছিল। বস্তুতঃ সিংহপুর বা সিঙ্গুর সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল এবং সেই কালে এই স্থানটি সমুদ্র থেকে অনেক দূরে ছিল না। সিংহপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে সরস্বতী নদীর স্রোতধারায় সাগরের নিকট অবস্থিত তাম্রলিপ্ত বন্দর সিংহবাহুর মাতামহের স্মৃতিতে বঙ্গনগর বলে পরিচিত ছিল। অনেকের মতে সিংহবাহু বঙ্গের (দক্ষিণ-মধ্য বঙ্গদেশ, গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত) সিংহাসন ত্যাগ করে রাঢ় দেশে নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই শ্রেয়তর মনে করেছিলেন।

সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহ দেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে সামুদ্রিক দ্বীপে খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে যে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, সেই রাজ্য তাপপবর্ণী বা তাম্রপর্ণী নামে পরিচিত। এই দ্বীপই সুবিখ্যাত সিংহল দ্বীপ যা একাধারে রাঢ়ীয় সিংহবংশের এবং সিংহপুরের অন্তর্গত সিংহলপটন গ্রামের নামকে সিংহলের সঙ্গে সংযুক্ত করে অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক তাৎপর্যে ভূষিত করেছে।

সানুচর বিজয় সিংহের তিনটি বৃহৎ জলযানের সহায়তায় সমুদ্রযাত্রা পূর্ব ভারতের তৎকালীন বৃহত্তম বন্দর তাম্রলিপ্তের পথেই হয়েছিল, সন্দেহ নেই। সেই সময়ে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে তাম্রলিপ্ত হয়তো কলিঙ্গ দেশের অন্তর্গত অথবা সুহ্ম তথা রাঢ় দেশের অন্তর্গত এক স্বাধীন রাজ্য বলে পরিগণিত হয়েছিল এবং কলিঙ্গের সঙ্গে বন্ধুত্ব ভাবাপন্ন ছিল।

'সুহ্মরাজ্য বা দক্ষিণ রাঢ় অতি প্রাচীন কাল হইতে ছিল। তজ্জন্য সুহ্মরাজ্যের দক্ষিণ ভাগে দামোদর ও গঙ্গার মধ্যস্থলে কয়েকটি দ্বীপের উদ্ভব হয়।'[৪২] প্রাচীন যুগে সিংহপুরের (বর্তমান হুগলী জেলার সিঙ্গুর) রাজপুত্র বিজয়সিংহ এই দক্ষিণ রাঢ় দেশের সিংহল বা সিংহরদ্বীপ থেকে লংকাদ্বীপে সানুচর অবতরণ করে, সেই দ্বীপ জয় করেছিলেন এবং এই দ্বীপের নূতন নাম দিয়েছিলেন সিংহল। এই বক্তব্যের সমর্থনে "যশোহর ও খুলনার ইতিহাস" গ্রন্থে সতীশচন্দ্র মিত্রের নিম্নলিখিত বিবৃতিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ—

'যেখানে এক্ষণে তারকেশ্বরের মন্দির অবস্থিত, উহার পূর্বনাম ছিল সিংহল দ্বীপ, ইহারই সন্নিকটে সিংহপুর বা সিঙ্গুর। প্রবাদ, সেখানে পূর্বে সিংহবাহু রাজা বাস করিতেন। তৎপুত্র বিজয় সিংহ সমুদ্র পথে লংকা বা তাম্রপর্ণী দ্বীপে গিয়া তাহা জয় করিয়া সিংহল নাম রাখেন, এবং এখনও সেই নাম চলিতেছে।··· সিংহদিগের রাজত্ব স্থান পূর্বে একটি দ্বীপ ছিল, এবং প্রথমে তাহারা তথায় রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময়ে উহার সিংহল দ্বীপ নাম রাখেন, তাহা প্রচলিত গান ও কবিতা হইতে জানা যায় (গৌড়ের ইতিহাস ২য় খণ্ড, ১৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পরে বিজয় সিংহ লংকা দ্বীপে বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন, তখন নিজের বাসভুমির আদর্শে, তাহারও নাম সিংহল দ্বীপ রাখেন, ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।'

সিংহলের পুরাণ কথা 'মহাবংশ' গ্রন্থে বঙ্গনগর ও সিংহপুর দুটি নগরের কথা আছে। প্রাচীন জৈন সাহিত্যে তাম্রলিপ্তকে বঙ্গদেশের রাজধানী বলা হয়েছে। সিংহলীয় পুরা কাহিনীর বঙ্গনগরই তাম্রলিপ্ত বলে মনে হয়। বিজয় সিংহের পিতা সিংহবাহুর সময় পর্যন্ত এই অঞ্চল অর্থাৎ রাঢ় দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল হয়তো সাময়িকভাবে বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং পুনরায় কলিঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।

খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীতে বঙ্গদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে পূর্ব, দক্ষিণ, ও পশ্চিম দিকে সমুদ্রের নৈকট্য লক্ষ্য করা যায়। পূর্ববঙ্গের দক্ষিণের কতকাংশ, মধ্যবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশ, পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণপূর্ব অংশ তখনও সমুদ্রের

গর্ভে ছিল। বর্ধমান এবং হুগলী জেলার নিকটেই ছিল সমুদ্রের খাড়ি এবং তখন দামোদর ও সরস্বতী এই দুই খাতেই গঙ্গা-ভাগীরথীর জল প্রবাহিত ছিল।

"ইতিহাসের মঞ্চে যবনিকা যখন উঠেছে তখন সুহ্মের সীমা গঙ্গা অবধি বিস্তৃত ছিল। তখন দামোদর এবং গঙ্গা ত্রিবেণীর অদূরে মিলিত হতো। সেইখান থেকে দু'নদীর মিলিত অংশ ছিল যেন সমুদ্রের খাড়ি। মনসামঙ্গল কাহিনীতে বেহুলার নৌযাত্রার যে বর্ণনা আছে, তার থেকে বোঝা যায় যে কাহিনী প্রথমে কল্পনার কালে সুহ্মের প্রাচীন জলপথ ছিল দামোদর এবং ত্রিবেণীর কাছে গঙ্গা সাগর সঙ্গমে মিলতো। ...পাণ্ডুয়া ত্রিবেণীর মধ্যবর্তী ভূভাগে এখন যে প্রচুর বালি ওঠানো হয়, সেগুলি দামোদর খাতের, ভাগীরথীর নয়"।[৪৩]

আমরা গ্রীক বিবরণের সূত্রে গঙ্গার ১৯টি উপনদীর উল্লেখ পাই।[৪৪] বঙ্গদেশের দক্ষিণপশ্চিমে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দরও হিউ-এন-সাঙের বিবরণ অনুযায়ী সমুদ্রের খাড়িতেই ছিল। হুগলী বা গঙ্গা নদী গতি পরিবর্তন করে রূপনারায়ণ নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত বর্তমান তমলুক শহর থেকে বারো মাইল দূরে সরে গেছে। গঙ্গা তথা সরস্বতীর এই শাখাটি দামোদর, রূপনারায়ণ ও সাঁওতাল পরগণার অন্য কয়েকটি ক্ষুদ্র নদীর সঙ্গে সংযুক্তির দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করে তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) বন্দরের পাশ দিয়ে প্রশস্ত স্রোতধারায় পূর্বসাগরে গিয়ে মিলিত হতো।[৪৫]

সরস্বতীপুষ্ট অন্য বিখ্যাত নগর ও বন্দর সপ্তগ্রাম তাম্রলিপ্তের চেয়ে অনেক অর্বাচীন হলেও, অনেকের মতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা যাই হোক, এই বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণের অপ্রতুলতা আছে। সুতরাং সপ্তগ্রাম বন্দরের নিকট গঙ্গার সরস্বতী শাখার সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ সমুদ্রের খাড়িটিকে গঙ্গার অন্যতম মোহনা মুখ বলা যায় কিনা অথবা অনুমান করা যায় কিনা সে বিষয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা গভীর ভাবে অনুসন্ধান আবশ্যক। এই কথা স্মরণীয় যে এই অনুমানের স্বপক্ষে দেশীয় পণ্ডিতবর্গ ছাড়াও Rev, Sylvian Levy, Wilford প্রমুখ বিদেশী ভারতবিদগণ ইতিমধ্যে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৪৬]

'ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিগণ স্থির করিয়াছেন এক সময়ে রাজমহল পর্বতমালা বঙ্গোপসাগরের সীমা ছিল। পরে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মুখানীত কর্দমে পুষ্ট হইয়া বর্তমান নিম্ন বঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে।'[৪৭]

এই আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর যথেষ্ট আলোকপাত করতে হলে আরও অধিক অনুসন্ধান নিঃসন্দেহে আবশ্যক। তবে সমগ্র বঙ্গদেশের গঠনের তথ্যসমন্বিত ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বিবরণগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা প্রকৃত অবস্থার মুখোমুখী হই। গভীর দুঃখের কথা, অনেক পণ্ডিত, বিদগ্ধ-জন এবং বিশেষজ্ঞ, প্রাপ্ত তথ্যগুলি উপেক্ষা করে নানারূপ বিভ্রান্তিকর উক্তি এবং বর্ণনার দ্বারা এই গবেষণা প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করেছেন।

এখন বঙ্গদেশের বিভিন্ন ভূভাগগুলি কেমনভাবে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছে, প্রথমেই সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান করা কর্তব্য। কর্দম ও পলির প্রভাবে বহমান

নদীগুলি বিস্তীর্ণ স্থলভাগের সৃষ্টি করেছে—বাংলার মধ্যদক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব অংশের সৃষ্টিতে এই বিবর্তনের ধারাটি নিঃসংশয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে উল্লিখিত মন্তব্যটি এই বিষয়ে আমাদের ধারণাকে অনেকখানি পরিশুদ্ধ করবে বলেই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ—

"মহাভারতের যুগে যুধিষ্ঠির কৌশিকী তীর্থের কতটা দূরে সমুদ্র দেখেছেন জানা নেই, কিন্তু রাজতরঙ্গিনীর ললিতাদিত্য গৌড়ের পরেই সমুদ্র দেখেছেন। একালের ভূতত্ত্ববিদরাও একথা মেনে নিয়েছেন। বলেছেন যে বর্তমানের বাংলা কোন প্রাচীন দেশ নয়। আনুমানিক এক হাজার বৎসর পূর্বে বাংলার দক্ষিণ অংশ সমুদ্রগর্ভ থেকে জেগে উঠেছে। তাঁরা মনে করেন যে তার আগে সমুদ্রের স্রোত রাজমহল পর্যন্ত প্রবাহিত হতো, আর গঙ্গাসাগর ছিল গৌড়ের কাছাকাছি।"[৪৮]

কবি কল্হণের 'রাজ তরঙ্গিনীতে' কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এটি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা।

দক্ষিণপশ্চিম বঙ্গের কতকাংশ, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের অনেকখানি অংশ এবং মধ্য বঙ্গের বেশীর ভাগই যে তুলনামূলক ভাবে অপ্রাচীন, এ কথা ভুতত্ত্ববিদরা স্বীকার করেছেন। কিন্তু বর্তমান ছোটনাগপুর ও বিহারের সিংভুম ও মানভুম এবং সংলগ্ন রাঢ় দেশের সিংহভাগ এবং তাম্রলিপ্তের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই।

গাঙ্গেয় বদ্বীপের[৪৯] (গঙ্গা ও পদ্মার মধ্যবর্তী সমুদ্র পর্যন্ত ভূভাগ) প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে নিম্নে উদ্ধৃত বক্তব্যটি বিশেষভাবে বিচার্য ঃ—

"খুলনা জেলার সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত এই অংশই বদ্বীপ বাংলায় প্রাচীনতম ভূমি। ১৫০ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ভূগোলশাস্ত্রবিদ টলেমি তাঁর ভূগোল লিখেছিলেন। তখন রায় মঙ্গলের মোহনার কাছাকাছিই গঙ্গার মেগা অর্থাৎ প্রধান মোহনা নির্দিষ্ট করেছিলেন। খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে মেগাস্থিনিস উল্লিখিত গঙ্গারিডি (Gangaridai) রাজ্য টলেমিও দেখেছিলেন। খুলনা জেলার বর্তমান বাগেরহাটের কাছে টলেমি উল্লিখিত সমৃদ্ধিশালী গঙ্গারিডি বন্দর ছিল বলেই আমাদের ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করেছেন……।"[৫০]

কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্ত (কপিল ভট্টাচার্যের) যে ঐতিহাসিকদের দ্বারা সমর্থিত নয় এবং ভৌগোলিক তথ্যের দ্বারাও সুরক্ষিত নয়, তা বলাই বাহুল্য। বাংলার ভুগঠন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বার বার ভুতত্ত্ববিদদের অভিমতের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস করেছি। বাংলার ভুমিসৃষ্টির ধারাবাহিক গতিটি ভূগোল এবং ইতিহাসের গবেষক ও অনুসন্ধানকারীদের পক্ষেও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করা কর্তব্য। এই বিষয়ের অনুসন্ধানে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অগ্রসর হলে আমাদের মানস চক্ষে এই ছবিটি উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয় ঃ—

"(পশ্চিমবঙ্গের) মুর্শিদাবাদ, বীরভুম, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ ছোটনাগপুরের লাটেরাইট নামে এক প্রকার শিলার দ্বারা গঠিত অনুচ্চ ও সুপ্রাচীন মালভুমিরই সম্প্রসারণ—উচ্চনীচ, কংকরময়, অনুর্বর। এই অঞ্চলের পূর্বেই ছিল

সমুদ্র। ময়ূরাক্ষী, দামোদর, অজয়, রূপনারায়ণ, শিলাই, কাঁসাই, সুবর্ণরেখা এবং গঙ্গা-ভাগীরথীর যুগ যুগ বাহিত পলিমাটি এই সমুদ্রের মধ্যে জনপদের সৃষ্টি করেছে। মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং বীরভূমের পূর্বদিকস্থ অংশ এবং হুগলী হাওড়ার জন্ম হইয়াছে এইভাবে। ভাগীরথী ও হুগলী নদীর পূর্বদিকের মুর্শিদাবাদের অংশ এবং নদীয়া, ২৪ পরগণা, কলিকাতা, যশোহর ও খুলনা সর্বতোভাবেই নবগঠিত সমভূমি। পদ্মা, ভাগীরথী ও মধুমতী এই অঞ্চলের সৃষ্টির মূলে। ইহার মাটিতে পলির পরিমাণ বেশী বলিয়াই ইহা বেশ উর্বর।...... হিউ এন সাঙ (খৃষ্টীয় সপ্তম শতক) বাংলার সমতটের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হইতে নিঃসন্দেহে অনুমিত হয় যে সমতট বলিতে তখন বুঝাইত যশোহর ফরিদপুর ও ঢাকা অঞ্চল, সম্ভবত খুলনা ও যশোহর তখন পর্যন্ত সমুদ্র গহ্বর হইতে উত্থিত হইয়া মনুষ্যবাসের উপযোগী হইয়া উঠে নাই......।"[৫১]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই তথ্যনিষ্ঠ না হয়ে, প্রকৃত অবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন এবং পাঠকদের মনে সংশয়ের সৃষ্টি করেছেন। কলিকাতার পঁচিশ মাইল উত্তরপূর্বে চন্দ্রকেতুর গড়কে কপিল ভট্টাচার্য 'গঙ্গে' বন্দর বলে স্বীকার করছেন না। খুলনা জেলার সমুদ্রাভিমুখী ভূভাগের প্রাচীনত্বের দোহাই দিয়ে তিনি স্বকল্পিত একটি স্থানে এই গঙ্গারিডি রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। টলেমি প্রদর্শিত গঙ্গার দ্বিতীয় মোহনামুখ 'মেগা' রায়মঙ্গলের কাছে ছিল মনে করা নিছক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

'যশোহর খুলনার ইতিহাস' প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সতীশচন্দ্র মিত্র, কপিল ভট্টাচার্যের (বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা) নির্দিষ্ট অঞ্চলে গঙ্গারিডি রাজ্যকে স্থাপন করলেও, 'গঙ্গে' বন্দরের অবস্থিতির প্রসঙ্গে অন্য স্থান নির্দেশ করেছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী চন্দ্রকেতু গড়ের কাছে, প্রাচীন যশোহর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বর্তমান 'উঃ চব্বিশপরগণার মধ্যবর্তী বারাসাত হইতে হাসনাবাদ যাইবার রেলপথের পার্শ্বে দিগঙ্গা নামক একটি স্থানে' 'গঙ্গে' অবস্থিত ছিল। অপর পক্ষে, চন্দ্রকেতু গড়ই 'গঙ্গে' বন্দরের সম্ভাব্য স্থান—এই বিষয়ে অনেকেই একমত হয়েছেন।[৫২]

কিন্তু এই সিদ্ধান্তও সর্ববাদীসম্মত এবং ঐতিহাসিক বিচারে সম্পূর্ণভাবে যুক্তিসম্মত নয়। শুধুমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের কারণে কোন স্থানের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হলেই সেই স্থানকে বিদেশী বর্ণিত এক বিশেষ জনপদ বলে স্বীকার করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

এখন পুনরায় রাঢ়বঙ্গের প্রাচীন স্বাধীন রাজ্যগুলির বর্ণনায় ফিরে এসে আমরা গ্রীক ও লাতিন লেখকদের বর্ণিত গঙ্গারিডিদের দুটি রাজধানীর কথা উল্লেখ করবো। একটি রাজধানী ছিল প্লিনী বিবৃত গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ীদের রাজধানী পোর্তালিস অথবা পার্থালিস যাকে অনেকে বর্ধমান বলেছেন এবং আধুনিক ঐতিহাসিকগণ কেউ কেউ পুরথল বা পূর্বস্থলী বলেছেন। এ বিষয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে।

দ্বিতীয় রাজধানীর অর্থাৎ গঙ্গা অথবা গঙ্গে বন্দরের কথা টলেমি জানিয়েছেন,

আর জানিয়েছেন ''Periplus of the Erythrean sea" এর নাবিক-গ্রন্থকার। এঁরা অবশ্য শুধু গঙ্গারিডিদের কথা বলেছেন গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ীদের কথা বলেন নি। এর থেকে অনুমান করা যায় গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ীদের অস্তিত্বের কথা মেগাস্থিনিসের বিবরণ অথবা কোন সমসাময়িক গ্রীক বিবরণ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছিল, এবং এই যুগ্ম জাতির অথবা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মৌর্য (চন্দ্রগুপ্ত) অথবা তার আগের সময় থেকেই হয়তো ছিল।

মেগাস্থিনিস অথবা তাঁর অনুসরণকারীদের বিবরণে 'গঙ্গা' অথবা 'গঙ্গে'র উল্লেখ নেই। সুতরাং এই গঙ্গে বা গঙ্গা শহর ও বন্দর প্রাধান্য লাভ করেছে অনেক পরে, হয়তো খৃষ্টীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে। আমরা আগেই বলেছি যে কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে সপ্তগ্রামের অস্তিত্বের কথা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে মানুষের গোচরীভূত হয়েছে। সুতরাং দামোদরের জল পুষ্ট গঙ্গার সরস্বতী শাখার উপর অবস্থিত সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ যে 'গঙ্গে' বন্দর নয় একথা হয়তো জোর দিয়ে বলা যায় না (যদিও প্রামাণিকভাবে ইতিবাচক কোন সিদ্ধান্ত আজও সম্ভব নয়)। সপ্তগ্রামের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বর্ণনাতে বলা হয়েছে যে 'খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষে সপ্তগ্রামের মহারাজা চন্দ্রকেতু পাণিহাটিতে গড় নির্মাণ করেছিলেন, (উত্তর-চব্বিশপরগণার ইতিহাস—কমল চৌধুরী)।

টলেমির মানচিত্র অনুযায়ী যেমন গঙ্গার প্রথম মোহনা তাম্রলিপ্তের কাছে সমুদ্রের খাড়ির সঙ্গে জড়িত ছিল, তেমনই 'মেগা' বলে টলেমি বর্ণিত দ্বিতীয় মোহনাটি সপ্ত-গ্রামের কাছাকাছি হওয়াও অসম্ভব ছিল না। কারণ, 'তৎকালে রাঢ় বা সুহ্মপ্রদেশের পার্শ্ব-ভূভাগ তরঙ্গবিচুম্বিত ছিল'।[৫৩]

পোর্তালিস পূর্বস্থলী না হয়ে পাণ্ডুয়া[৫৪] হলেও, 'গঙ্গে' সপ্তগ্রাম হওয়ার কোন বাধা নেই। কারণ, সিংহরণ অথবা সিংহপুরের সিংহ বংশীয় রাজারা, অথবা শাক্য বংশীয় পাণ্ডু ও তাঁর বংশধরেরা, কয়েক শতাব্দী আগে এই রাঢ় দেশেই আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, এবং এই অঞ্চলেই তাঁদের রাজধানী ও বন্দর গড়ে উঠেছিল। হয়তো আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের অল্পদিন আগে পুণ্ড্রের অধিপতি মহাপদ্ম নন্দের হাতে পরাজিত হয়ে রাঢ়ের রাজবংশগুলি গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের প্রভুত্ব হারিয়েছিলেন। মহাপদ্ম নন্দের সঙ্গে সঙ্গেই রাঢ় দেশের স্বাতন্ত্র্য বৃহত্তর বঙ্গদেশীয় অর্থাৎ গ্রীকেরা যাকে গঙ্গারিডি দেশ / জাতি বলেছেন, তার মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গের কলিঙ্গী নরগোষ্ঠীর গঙ্গারাঢ়ী রাজারা (রাঢ় শব্দটি খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে অজ্ঞাত ছিল বলে মনে হয় না!) সময়ে সময়ে যে সব স্থানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন, তার মধ্যেও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সেই রাজধানীগুলি গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের হৃদপিণ্ডের নিকটই অবস্থিত ছিল। গঙ্গানদীই ছিল সেই সময়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতির মেরুদণ্ড। গাঙ্গেয় উপত্যকার জমি ছিল উর্বর এবং শস্যে সমৃদ্ধ। উত্তরে কজঙ্গল (রাজমহল) থেকে দক্ষিণে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত প্রসারিত ভূভাগেই গঙ্গারিডি জাতির প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। কাছেই প্রাচীন

তাম্রলিপ্ত বন্দরের কথা বাদ দিলেও, গাঙ্গেয় সমভূমিতে গঙ্গানগর (বর্তমান গাংপুর), পাণ্ডুয়া, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম এই সবকটি স্থানই ছিল স্থলপথ ও জলপথে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সংযুক্ত।

ব্যবসায় এবং বাণিজ্যের ধারাও এই দুই পথেই অব্যাহত ছিল। তাম্রলিপ্ত থেকে চম্পা (অঙ্গদেশ) হয়ে পাটলিপুত্র পর্যন্ত পশ্চিমগামী জলপথ এবং স্থলপথ, এই দুইয়েরই অস্তিত্বের কথা চৈনিক পরিব্রাজক ঈৎ সিঙের (খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী) বিবরণ থেকে জানা যায়। এই পথগুলি গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল দিয়েই অন্য অঞ্চলের মধ্যে প্রসারিত ছিল, একথা বলাই বাহুল্য। বাণিজ্যিক পণ্য বহনে এবং যোগাযোগ রক্ষায় অবশ্য প্রাচীনকালে স্থলপথ অপেক্ষা জলপথের ব্যবহারই অধিকতর নিরাপদ এবং সুবিধাজনক বলে বিবেচিত হতো। মেগাস্থিনিসের বিবরণেও তাম্রলিপ্তের সঙ্গে পাটলিপুত্রের জলপথে যোগাযোগের উল্লেখ আছে। 'তাম্রলিপ্ত হইতে স্থলপথ দিয়া রাঢ় ভেদ করিয়া ভারতে যাইবার পথ ছিল, নদীপথে পাটলিপুত্র দিয়া যাওয়া যাইত।'[৫৫]

'পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে আছে উত্তরাপথের গান্ধার থেকে একটা বাণিজ্য পথ সুদূরে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।'[৫৬] এই সব তথ্য একত্রিত করলে দেখা যায় যে গঙ্গারিডি অর্থাৎ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশ যথা পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ় প্রভৃতির মধ্য দিয়েই প্রাচ্য ভারত থেকে সর্বভারতীয় বাণিজ্যিক ও যোগাযোগের পথগুলি বিস্তৃত ছিল। এইসব সাক্ষ্য থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে রাঢ়দেশ বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চল অপেক্ষা অনেক প্রাচীন।

বহির্বাণিজ্যের বিষয়ে রাঢ় অঞ্চলের গুরুত্ব সম্বন্ধে অন্য একটি প্রাচীন সূত্রের উপর নির্ভর করা যায়। 'জাতকের কাহিনী হইতে দেখা যায় যে বণিকেরা চম্পা হইয়া জলপথে তাম্রলিপ্ত আসিত। তারপর তাহারা সরাসরি অথবা সিংহল ঘুরিয়া সুবর্ণ দ্বীপ যাইত (Jatakas IV P. P. 15-17 V P. 34)'।[৫৭]

ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পরিপূরক হিসেবে খনিজ পদার্থ এবং অনুবর্তী শিল্পের জন্যও রাঢ় অঞ্চল বিখ্যাত ছিল। তামার ও লোহার উৎপাদন যথাক্রমে সিংভুম, মেদিনীপুর এবং বর্ধমান ও হুগলী জিলায় হ'ত। বর্তমানে সবচেয়ে বৃহৎ তামা ও লোহার খনিজ শিল্প এইসব অঞ্চলেই অবস্থিত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গৌড়িক নামে একপ্রকার রৌপ্যের উল্লেখ থেকে গৌড়দেশে রৌপের শিল্প হিসাবে অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমান বঙ্গের গড় মন্দারণ থেকে বিহার সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হীরক খনির কথা আইন-ই-আকবরীতে আছে এবং 'পুণ্ড্র' দেশ ও 'বঙ্গ' দেশে হীরক খনির কথা অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে আছে। কৌটিল্য স্বর্ণ, হীরক ও মুক্তার উল্লেখ করেছেন এবং 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থেও মুক্তা উৎপাদন ও রপ্তানির কথা আছে।[৫৮]

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (প্রাচীন বাংলার গৌরব) সুবর্ণকুড্য বা কর্ণ-সুবর্ণতে স্বর্ণের খনির কথা উল্লেখ করেছেন। রাঢ়দেশ, যা হয়তো পুণ্ড্র, গৌড় এবং শেষ পর্যন্ত মগধের বশীভুত হয়েছিল, অত্যন্ত পুরাকাল থেকেই শিল্পে, ব্যবসায়ে এবং

বাণিজ্যে অগ্রণী এক সম্পদশালী দেশ ছিল। ভারতের প্রধান ও প্রাচীন অংশগুলির সঙ্গে জলপথে ও স্থলপথে যুক্ত ছিল। প্রাচ্য ভারতের বহির্বাণিজ্যের উৎসমুখ ছিল তাম্রলিপ্ত বন্দর ও পরে 'গঙ্গে' বন্দর। সুতরাং রাঢ়দেশের গাঙ্গেয় অঞ্চলেই এই 'গঙ্গা' অথবা 'গঙ্গে' বন্দরের অবস্থিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

গঙ্গার মোহনাগুলি এখনকার সাগরসঙ্গম অপেক্ষা অনেক উত্তরে ছিল। এই উক্তি গঙ্গার (গঙ্গা-ভাগীরথীর) পূর্বতীরস্থ মোহনাগুলির উপর বিশেষভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ, সুন্দরবন ও কলকাতার দক্ষিণে সাগরসঙ্গমও ঠিক কোথায় ছিল তা বলা শক্ত, যদিও এখনকার মুখগুলির চেয়ে উত্তরেই তাদের অবস্থিতি ছিল। পার্থক্য এই ছিল যে গঙ্গোপদ্বীপ (গঙ্গা ও পদ্মার মধ্যস্থিত সমুদ্র পর্যন্ত ভূভাগ) এবং কলিকাতার দক্ষিণস্থ ভূভাগ বহুবিধ দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত হওয়ায়, খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে, এমনকি খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে একটি সুসম্বন্ধ এবং সুবিন্যস্ত ভূভাগ ছিল কিনা সন্দেহ।

উপর্যুক্ত অনুমানের সমর্থনে ভৌগোলিক অথবা ভূতাত্ত্বিক তথ্যের অভাব নেই। এই বিষয়ে একটি প্রাসঙ্গিক অভিমত উদ্ধৃত হচ্ছে ঃ—

"ভগীরথ আনীত গঙ্গা পূর্বকালে যেখানে সমুদ্রে পতিত হন, সে স্থান হইতে বর্তমান গঙ্গাসঙ্গম বহুশত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এইরূপে গঙ্গার মোহনা যত দক্ষিণ দিকে সরিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবনও তত দক্ষিণবর্তী হইয়া পড়িতেছে। এইরূপে ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী ত্রিকোণ প্রদেশ বা সমতট উদ্ভূত হইয়াছে।"[৫৯]

গাঙ্গেয় বদ্বীপের অপ্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আরও জানা যায়—'The entire deltaic region of Bengal was once under the ocean, and the Ganges used to meet the sea at the apex or little upwards, in the neighbourhood of Gour'. (The Ganges Delta-Kanan Gopal Bagchi)। কবি কহ্লণের 'রাজ তরঙ্গিণী' থেকে আমরা জানতে পারি যে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়, বঙ্গদেশ অভিযানের সময়ে গৌড়ের কাছে সমুদ্র দেখেছিলেন।

মনে হয় মৌর্য সম্রাট অশোকের মৃত্যু পর্যন্ত কলিঙ্গের উপর মগধের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। কলিঙ্গ পুনরায় স্বাধীনতা অর্জন করলে, গঙ্গারিডি কালিঙ্গেরীদের রাজধানী 'গঙ্গে' নামক নগর বন্দরে স্থানান্তরিত হয়। এই 'গঙ্গে' রাঢ়বঙ্গেতে হওয়াই যুক্তিগ্রাহ্য বলে অনুমিত হয়। কারণ দক্ষিণপশ্চিম বঙ্গের (দক্ষিণ রাঢ়ের) সমুদ্র মোহনার অংশই ঐতিহাসিক যুগের আগে থেকেই কলিঙ্গের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ছিল বলে জানা যায়। বস্তুতঃ অনেকে এই অঞ্চলকে কলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বলেও মনে করেছেন।

প্লিনী যাদের গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ী বলেছেন এবং যে গঙ্গারিডিদের দেশের মধ্য দিয়ে গঙ্গার (গঙ্গা-ভাগীরথী?) শেষভাগ প্রবাহিত হয়েছে বলে নির্দেশ করেছেন, ভারতের বিভিন্ন জাতির বর্ণনা প্রসঙ্গে সলিনস (Solinus) তাঁদের গঙ্গারিডি বলেই

পরিচয় দিয়েছেন। এই অভিন্নতার আরও একটি প্রমাণ এই যে প্লিনীর মতোই সলিনস বলেছেন যে গঙ্গারিডিদের ৬০ হাজার পদাতিক, ১০০০ অশ্বারোহী এবং ৭০০ হস্তী আছে।[৬০]

এই প্রসঙ্গে এই কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে গঙ্গারিডি গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত, এমন কথা সলিনস কোথায়ও বলেন নি। কিন্তু কয়েকজন খ্যাতনামা দেশীয় ইতিহাসবিদ এই বিষয়ে বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করেছেন। এই অযৌক্তিক সিদ্ধান্তগুলির সম্বন্ধে অবহিত থাকার প্রয়োজন আছে।

'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব) গ্রন্থে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় সরাসরি মন্তব্য করেছেন 'গ্রীক লাতিন লেখক কথিত গঙ্গারাষ্ট্র ভাগীরথীর পূর্বতীরে অবস্থিত ও বিস্তৃত ছিল। এবং প্রাচ্য রাষ্ট্র গঙ্গা-ভাগীরথী হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে সমস্ত গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিস্তৃত ছিল। তাম্রলিপ্ত প্রাচ্যের অন্তর্গত ছিল।'

উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত অভিমত যে সম্পূর্ণভাবে যুক্তিরহিত এবং অনৈতিহাসিক, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাম্রলিপ্তের এবং রাঢ় দেশের কিয়দংশের সঙ্গে কলিঙ্গ দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সম্পর্ক বহুদিনের, এ কথা বলাই বাহুল্য। মগধের তথা প্রাচ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক এই অঞ্চলের ছিল কিনা তা বলা কঠিন। মহাপদ্ম নন্দ ও তাঁর বংশধরেরা গঙ্গারিডির নরপতি ছিলেন, সে কথা বৈদেশিক সূত্রে জানা যায় এবং সেই হিসেবে তাম্রলিপ্তসহ রাঢ়দেশ হয়তো মহাপদ্ম নন্দের বশীভূত ছিল। অন্যথায়, মগধবিজয়ী মহাপদ্ম নন্দ বিদেশীবর্ণিত প্রাচ্য (প্রাসাই) দেশের অধিপতি হওয়ায়, তাম্রলিপ্ত সার্বভৌম প্রাচ্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কিন্তু বৈদেশিক সাক্ষ্য এই কথাও প্রতিপন্ন করে যে গঙ্গারিডির একটি স্বতন্ত্র ভৌগোলিক এবং রাষ্ট্রীয় সত্তা মগধ সাম্রাজ্যের মধ্যেও স্বীকৃত ছিল। সেই কারণে, "প্রাচ্যরাষ্ট্র ভাগীরথী হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে সমস্ত গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিস্তৃত ছিল। তাম্রলিপ্ত প্রাচ্যের অন্তর্গত ছিল" বলা ইতিহাসগতভাবে যুক্তিহীন এবং অসঙ্গত। বস্তুতঃ, বৈদেশিক লেখকদের বিবরণ অনুযায়ী তথাকথিত 'গঙ্গারাষ্ট্র' (গঙ্গারিডি ?) প্রাচ্য (প্রাসাইদের) সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই হিসেবে তৎকালীন সমগ্র বঙ্গদেশই প্রাচ্য-রাষ্ট্রের মধ্যে ছিল, শুধু তাম্রলিপ্তসহ গঙ্গার পশ্চিমতীরবর্তী রাঢ়, গৌড় প্রভৃতিই নয়!

কুইণ্টাস-কার্টিয়াস, প্লুটার্ক এবং সলিনসের বক্তব্যের ভ্রান্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা করে (History of Bengal-Dacca University Publication P. 47) ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁদের সাক্ষ্যগুলির ঐতিহাসিক এবং তথ্যাভিত্তিক বিশ্লেষণ না করেই মন্তব্য করেছেন ঃ—

'Evidently, the Classical writers had a vague notion of the Geography of this region and we shall not be justified in concluding from their varying descriptions that the Gangaridai lived in Radha. There is however no doubt that Bengal was the homeland of the Gangaridai.'[৬১]

প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব এবং তাৎপর্যের গভীরতার মধ্যে প্রবেশকারী এই সব লব্ধ-প্রতিষ্ঠ গবেষক ও অনুসন্ধানকারীরা অনেকেই সময়ে সময়ে ঐতিহাসিকের সত্যদৃষ্টি থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, অথবা ভুল বুঝেছেন। সেই কারণেই তাঁদের সিদ্ধান্তগুলি বেশ কয়েক সময়েই তথ্য এবং বিশেষ সূত্রগুলির সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে আবেগপ্রবণতা ও পক্ষপাতিত্বের কবলিত হয়েছে!

রাঢ়বঙ্গের অন্য দুটি প্রাচীন অঞ্চল মল্লভুম এবং বীরভুম অঞ্চলও জঙ্গলে সমাকীর্ণ ছিল। বিনয় ঘোষ (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—প্রথম খণ্ড) বলেছেন যে বর্তমান বাঁকুড়া এবং বীরভুম নিষাদজাতির লীলাভূমির অন্তর্গত। History of Rural Bengal-W. W. Hunter (গ্রাম বাংলার ইতিহাস-অনুবাদক অসীম চট্টোপাধ্যায়) গ্রন্থে এই দুই জেলাকেই নিম্নবঙ্গের অংশ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। গ্রন্থকার আরও মন্তব্য করেছেন যে পণ্ডিতদের মতে নিম্নবঙ্গের জনসাধারণের জাতিগত উপাদানের পাঁচটি ভাগের মধ্যে প্রথম এবং প্রাচীনতম ভাগ হচ্ছে আদিবাসী অনার্য উপজাতি।

সুতরাং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে মৌর্য ও শুঙ্গ যুগের পরবর্তী সময়ের বিদেশী লেখক যথা টলেমি যে গঙ্গারিডিদের সাগরমোহনায় বসবাসকারী অথবা নিম্নবঙ্গের অধিবাসী বলে সীমাবদ্ধ করেছেন, সেই বর্ণনা সর্বতোভাবে যথার্থ না হলেও, নিম্নবঙ্গীয় রাঢ়দেশকে সেই সময়ের গঙ্গারিডিদের সীমা থেকে বাদ দেওয়া যায় না।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন অধিবাসীদের জাতিগত উপাদানের আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় জানা কর্তব্য। দ্রাবিড়দের অভ্যুদয়ের আগে সমাজ ছিল মূলতঃ গ্রামভিত্তিক। এই যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি বিশেষভাবে স্মরণীয়ঃ—

'সাঁওতাল পরগণা হইতে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চভূমি পর্যন্ত আদি-অষ্ট্রাল বা নিষাদ জাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এবং শিকার, পশুপালন, কৃষিকর্ম প্রভৃতি নানা স্তরভুক্ত ছিল এই সংস্কৃতি।...নিষাদ জাতির কোন কোন অংশের টোটেম ছিল কূর্ম প্রতীক এবং বাঘ, ঘোড়া প্রভৃতি উপাধি আজও তাহাদের সাক্ষ্য বহন করিয়া চলিতেছে।'[৬২]

টোটেম বিশ্বাস যে ধারাবাহিকভাবে মানুষের সংস্কারের সঙ্গে মিশিয়ে আছে তার অন্যতম প্রমাণ স্বগোত্রে বিবাহের নিষিদ্ধতার মধ্যে নিহিত আছে।[৬৩]

হুগলীর কিয়দংশ, বর্দ্ধমান, বীরভুম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর বঙ্গদেশের প্রাচীনতম অংশ এবং সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলিও পশ্চিমবঙ্গের এই সব অঞ্চলে বহু পুরাতন যুগ থেকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্মেষের সাক্ষ্য প্রদান করেছে। এ বিষয়ে আমরা উল্লেখ করেছি।

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং তার মধ্যে রাঢ়দেশ যে বিশেষভাবে পুরাতন ভূখণ্ডের অন্তর্গত, তা সর্বজন স্বীকৃত। গ্রীক ভৌগোলিক এরিয়ানের গ্রন্থে কটদ্বীপ অর্থাৎ কাটোয়ার এবং আনিসেক্টিসের গ্রন্থে অজয় নদের উল্লেখ আছে।[৬৪]

এই কথা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে মেগাস্থিনিস এবং আলেকজাণ্ডারের ভারত

আক্রমণ সংক্রান্ত বৃত্তান্তের উপর নির্ভরশীল বিদেশী ঐতিহাসিকেরা কিন্তু কেউই বঙ্গ/পূর্ববঙ্গের কোন বিশিষ্ট স্থান, অথবা নদী অথবা পর্বতের বিষয় উল্লেখ করেন নি। তাঁদের বর্ণনায় গঙ্গার পূর্বতীরের বঙ্গভূমির কোন বিশ্বাসযোগ্য রূপরেখা অথবা প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। টলেমি প্রদত্ত মানচিত্র থেকেও আমরা গঙ্গার অপর তীরের কোন ছবি মনে মনে অংকন করতে পারি না, যেমন পারি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়িষ্যা ও বিহারের অংশ বিশেষ সমন্বিত বৃহত্তর রাঢ়বঙ্গের এবং কলিঙ্গ মগধ প্রভৃতি গঙ্গার পশ্চিম উপকূলস্থ অঞ্চলের।

বস্তুতঃ মেগাস্থিনিস বর্ণিত প্রাসিয়াই ছিল প্রয়াগের পূর্ব থেকে মগধ পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রাচ্যদেশ, যার সঙ্গে গঙ্গারিডিও (উত্তরপশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গদেশ) সংযুক্ত ছিল। কলিঙ্গ দেশও গাঙ্গেয় উপত্যকার এবং নিম্নগাঙ্গেয় ভূভাগের পশ্চিম পাশে অবস্থিত এবং দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

গ্রীকেরা যে গঙ্গার পূর্ব উপকূলেই গঙ্গারিডির অবস্থিতি সম্বন্ধে আংশিকভাবেও নির্দেশ করেছিলেন, এমন ধারণা করাও যথেষ্ট কঠিন। টলেমির মানচিত্রে আমরা দক্ষিণবঙ্গে প্রায় চট্টগ্রাম উপকূল পর্যন্ত পাঁচটি সমুদ্র মুখের সন্ধান পেলেও, গঙ্গার বদ্বীপ বলে কথিত ব্যাপক অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ স্পষ্টভাবে পাই না। অথচ ঢাকা, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রামের কিয়দংশ প্রাচীন ভূখণ্ড, যদিও 'গণ্ডোয়ানা' ল্যাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত রাঢ়ের, পার্বত্য, অসমতল ও অনুর্বর অংশের মতো এগুলি এত পুরাতন বলা যায় না।

এ কথা অনস্বীকার্য যে পূর্ব বাংলার অধিকাংশ (যথা, বাগড়ী, সমতট) এই রাঢ় অঞ্চলের তুলনায় অনেক অর্বাচীন। এখন পর্যন্ত লব্ধ সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে আসা সমীচীন যে এই অঞ্চলের তথা পূর্ববঙ্গের পলিসৃষ্ট ভূমির অস্তিত্ব ঐতিহাসিক যুগের সূচনায় ছিল অনিশ্চিতের গর্ভে। 'মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থ আলোচনা করিলে বোধহয়—বর্তমান ময়মনসিংহের সমতলাংশ, পাবনা, রাজসাহী, নওয়াখালি, যশোহর, খুলনা প্রভৃতি জেলা পূর্বকালে সমুদ্রমগ্ন ছিল।'[৬৫]

এমন অনুমান করা অন্যায় নয় যে অন্ততঃ মনুষ্যবাসোপযোগী এবং কর্ষণযোগ্য স্থান হিসেবে গঙ্গার পূর্ব উপকূলবর্তী এই সব ভূভাগ সেই প্রাচীন যুগে বৈদেশিক পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। পুণ্ড্রদেশকে গঙ্গার পূর্বে বর্ণনা করে অনেকে হয়তো অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পুণ্ড্রদেশ ছিল পুরাকালে গঙ্গার উভয় দিকে—পশ্চিমে এবং পূর্বে এবং উত্তরে করতোয়া নদী পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই পুণ্ড্রদেশের কতকাংশও লাটেরাইট গঠিত প্রাচীনতম ভূভাগের অন্তর্গত। এইভাবে মালদহ, দিনাজপুর, বগুড়া প্রভৃতি বর্তমান জেলাগলি প্রাচীন পুণ্ড্রদেশের অংশস্বরূপ ছিল। পুণ্ড্রদের আধিপত্য দক্ষিণ এবং পূর্ব, এই দুই দিকেই প্রসারিত হয়েছিল। যেমন, বীরভূম সমন্বিত উত্তর রাঢ় এক সময়ে পুণ্ড্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৬৬] তেমনই পূর্ব দিকে গঙ্গা (পদ্মা) এবং ব্রহ্মপুত্রের মধ্যস্থ ভূভাগ যতখানি সেই সময় পর্যন্ত সৃষ্ট হয়েছিল সেই ভূভাগই পুণ্ড্রদের অধিকারভুক্ত হয়েছিল।

সেই যুগে মধ্য ও পূর্ব বাংলার অনেকখানি জলমগ্ন ছিল, যেমন জলের গর্ভে নিমজ্জিত ছিল বর্তমান সমগ্র হাওড়া, এবং হুগলীর দক্ষিণ অংশ।

যা আগেই বলা হয়েছে, তৎকালীন গৌড় (গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত), যার উল্লেখ অর্থশাস্ত্রেও পাওয়া যায় এবং যে দেশ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের বন্ধন-পাশ থেকে মুক্ত হয়ে কর্ণসুবর্ণ (স্থান নাম থেকে দেশ নাম) নাম ধারণ করেছিল, সেই ভূখণ্ডই গৌরবময় গঙ্গারিডি অথবা তৎকালীন বাঙ্গালীর সেই অধুনা বিস্মৃত নাম বহন করেছিল ক্লাসিকাল লেখকদের বিবরণে।[২৭]

এই প্রসঙ্গ শেষ করার আগে বঙ্গদেশের, বিশেষভাবে রাঢ়বঙ্গের ভূগঠনের প্রাকৃতিক পরিস্থিতি এবং ভৌগোলিক আকৃতির অগ্রসরণ সম্বন্ধে অতিরিক্তভাবে কিছু আলোকপাত অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত। এই বিষয়টির পরিস্ফুটন এবং অবগতির জন্য একটি সাধারণ সমীক্ষার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত হচ্ছে। বিশেষভাবে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া ও বীরভূম এবং বিহারের মানভূমের তৎকালীন অবস্থিতির কথাই এখানে বিবৃত হয়েছে :—

"রাঢ় ও উৎকল (উড়িস্যা) রাজ্যের মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ড মল্লভূমি নামে পরিচিত। পূর্বে মল্লজাতি ইহার অধীশ্বর ছিল। বর্তমান মানভূমি, সিংহভূমি, শিখরভূমি, শূরভূমি প্রভৃতি প্রাচীন কালে মল্লদেশের অন্তর্গত ছিল এবং মল্লগণ দ্বারা অধ্যুষিত ও শাসিত হইত। মান, সিংহ, বরা, বীর, শূর, ধল প্রভৃতি আধুনিক মল্লগণের উপাধি দেখিয়াও তাহা উপলব্ধি হয়।

"মেগাস্থিনিস উল্লেখ করিয়াছেন যে সমুদ্র উপকূলে কলিঙ্গ জাতির বাস, তদূর্ধ্বে মল্ল ও মল্লী—যাহাদের গঙ্গাতীর পর্যন্ত দেশে মল্লস নামক পর্বত। ইউল সাহেবের মতে মল্লস বর্তমান দামোদরের সন্নিকট পরেশনাথ গিরি। ইহা পঞ্চকোটের পর্বতমালা বা শুশুনিয়ার পাহাড় হওয়া অসম্ভব নহে। পরেশনাথ, পঞ্চকোট, এবং শুশুনিয়া বর্তমান মল্লভূমির বহির্ভূত; কিন্তু মেগাস্থিনিসের সময়ে ভূমি প্রত্যয়ান্ত মানভূমি, বীরভূমি ইত্যাদি প্রদেশ যে মল্লদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।"[২৮]

বলাই বাহুল্য, এই মল্লভূমি অর্থাৎ বর্তমান বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত মল্লদের রাজ্য রাঢ়দেশের অন্তর্গত ছিল, এবং তার আধিপত্য ও প্রভাব বহুদূরে বিস্তৃত ছিল।

রাঢ়দেশ সম্বন্ধে আলোচনার উপসংহার করার আগে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করা সঙ্গত। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর "বাংলাদেশের ইতিহাস" (১ম খণ্ড) গ্রন্থে বাঙ্গালী বিজয় সিংহের লঙ্কাদ্বীপে আগমন এবং জয়লাভ সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। অন্য কয়েকজন ঐতিহাসিক এই বিজয় সিংহকে গুজরাট তথা সৌরাষ্ট্র থেকে আগত বলে দাবি করেছেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে এই ভিন্ন দাবির কারণে ভারতীয় লঙ্কা বিজয়ীর সনাক্তকরণ বিতর্কমূলক হয়ে উঠেছে।

গুজরাট থেকে এই বিজয়ী বীর উদ্ভূত হয়েছিল বলার স্বপক্ষে যে যুক্তিগুলি ছিল

তার মধ্যে গুজরাটি ভাষার সঙ্গে সিংহলী ভাষার নৈকট্য অন্যতম। কিন্তু শুধু এই বিষয়েই চিন্তা এবং বিশ্লেষণকে সীমাবদ্ধ রাখলে, অনায়াসেই বুঝা যায় যে এই সাদৃশ্যের কথা স্বীকার করে নিলেও শুধু এই যুক্তির বলেই কোন জাতিগত অথবা ভাষাগত সাযুজ্য চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় না। হয় না আরও এই কারণে যে আধুনিক গুজরাটি ভাষা সংস্কৃত তথা প্রাকৃত থেকে এসেছে। কিন্তু আধুনিক সিংহলী ভাষা যে একইভাবে জন্মলাভ করে স্থায়িত্ব পেয়েছে, এমন মনে করার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই। রাজনৈতিকভাবে, দক্ষিণ ভারতের চোল, পাণ্ড্য, প্রভৃতি রাজ্যের সঙ্গে সিংহলের সম্পর্ক ছিল নিবিড়তর। সুতরাং সিংহলী ভাষাতেও দ্রাবিড়ী প্রভাব প্রতিফলিত হবার সম্ভাবনাই প্রবলতর।[৬৯]

'সিংহলী ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব থাকার সম্ভাবনাই সমধিক। বস্তুতঃ দক্ষিণ ভারতের তিরুনেলবেলী জেলায় তাম্রপর্ণী নামক নদীর তীরের অধিবাসীরা সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করায় সেই দ্বীপের অন্ততঃ একটি অংশের নাম তাম্রপর্ণী হয়েছিল। এই অধিবাসীরা তামিল ভাষাভাষী দ্রাবিড় ছিল বলেই প্রতীয়মান হয়।'[৭০]

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে অন্যান্য কারণে শেষ পর্যন্ত বিজয়সিংহের রাঢ়দেশ থেকে সিংহল (তৎকালীন লংকা) গমনের স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করলেও, ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে কোন বিতর্কের মধ্যেই প্রবেশ করেন নি! এই সম্পর্কে কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে একথা বলা অন্যায় হবে না যে গঙ্গারিডি গঙ্গার পূর্বতীরে ছিল, এই অভিমত পোষণকারী ইতিহাস-বিদগণ প্রাচীন ইতিহাসের ধারাকে অনেক সময়েই খুশীমতো অগ্রাহ্য করেছেন।

যাই হোক, লংকা বিজয় সম্পর্কীয় তথ্যগুলির নিরপেক্ষ এবং ইতিহাসগ্রাহ্য বিশ্লেষণের দ্বারাই ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক উল্লিখিত বিতর্কের অর্থাৎ লংকা বিজয়ে বঙ্গদেশ অথবা গুজরাটের কৃতিত্ব সম্বন্ধে বিচার করা বিধেয়। সেই তথ্যগুলি এখন বিবেচিত হচ্ছে ঃ—

১। পালিভাষায় রচিত সিংহলীয় প্রাচীন কাহিনীর (দীপবংশ, মহাবংশ,) বর্ণনা অনুযায়ী বিজয় সিংহের পিতামহী অর্থাৎ সিংহবাহুর জননী ছিলেন কলিঙ্গের রাজকন্যা। এই রাজকন্যার মাতা ছিলেন বঙ্গের রাজার দুহিতা। সিংহবাহুর মাতা অর্থাৎ কলিঙ্গের রাজকন্যা স্বেচ্ছাচারিতা এবং অনৈতিক জীবনের জন্য নির্বাসিত হয়ে মগধে যাবার পথে রাঢ়ের জঙ্গলে সিংহ কর্তৃক (অথবা সিংহ যাদের টোটেম ?) অধিকৃত হয় এবং সিংহের ঔরসে এর পরে এক বিক্রমশালী পুত্রের জন্ম হয়। তারই নাম সিংহবাহু। সিংহবাহু বঙ্গের সিংহাসনের উপর দাবি বর্জন করে রাঢ়ের গঙ্গা-তীরবর্তী বিশাল জঙ্গলের মধ্যে এক রাজ্যের পত্তন করেছিলেন। সেই রাজ্যের রাজধানী ছিল সরস্বতীর উপকূলবর্তী সিংহপুর (বর্তমান সিঙ্গুর)। হাতিগুম্ফায় কলিঙ্গরাজ খারবেলের পত্নীর এক শিলালেখ থেকে এই সিংহবাহুর মাতার কলিঙ্গ রাজকন্যা হওয়ার বিষয়ে জানা যায়। কাথিওয়াড় (গুজরাট) থেকে বঙ্গের অথবা কলিঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান অনেক দূরে।

২।. সিংহলীয় কাহিনী অনুযায়ী সিংহবাহু লাল অথবা লাট রাজ্যে এক নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার রাজধানী সিংহপুর নামে পরিচিত হয়েছিল। কেউ কেউ কাথিওয়াড়ের অন্তর্গত লাট রাজ্যের সিংহনগরের সঙ্গে এই রাজধানীকে অভিন্ন মনে করেন।[৭১] পুনরায় কেউ কেউ বলেছেন লাল বা লাট রাজ্যকে গুজরাটের লাট জনপদের সঙ্গে অভিন্ন বলে স্বীকার করা যায় না।[৭২] তা ছাড়া পূর্বাকালে কাথিওয়াড়কে সৌরাষ্ট্র (সুরট্ট) বলা হতো।[৭৩] জৈন পুরাবৃত্তে শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ-সমূহে লাল বা লাট বঙ্গদেশের রাঢ়ভূমিকেই নির্দেশ করেছে। সুতরাং বিজয়সিংহের বাঙ্গালী হওয়ার সম্ভাবনাই সমধিক।

৩। সিংহবাহুর জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয় উগ্র স্বভাব এবং উচ্ছৃংখল চরিত্রের জন্য পিতা কর্তৃক নির্বাসিত হয়ে তিনটি বৃহৎ জলযানে ৭০০ অনুচরসহ তাম্রলিপ্ত থেকে সমুদ্র পথে দক্ষিণে যাত্রা করেছিলেন। তিনি প্রথমে বর্তমান বম্বের উত্তরে সৌরাষ্ট্রের সোপারা বন্দরে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুচরবৃন্দ স্থানীয় লোকেদের বিরক্তি ও ক্রোধ উৎপাদন করায় বিজয় সদলবলে পুনরায় জাহাজে দক্ষিণাভিমুখে গিয়ে শেষে লঙ্কা দ্বীপে পৌচেছিলেন। সেখানকার অধিবাসীদের বাহুবলে পরাজিত করে এবং যক্ষিনী রাজকন্যাকে বিবাহ করে বিজয় লঙ্কার অধিপতি ঘোষিত হয়েছিলেন। এই সবই সিংহলের প্রাচীন কাহিনীই আমাদের জানিয়েছে। সেই সময়ে তাম্রলিপ্ত পূর্বভারতের পৃথিবী-বিখ্যাত বন্দর ছিল এবং এখানে নানা ধরণের জাহাজ নির্মিত হতো। মেগাস্থিনিসভিত্তিক প্লিনী এই বন্দরের উল্লেখ করেছেন।[৭৪] ইতিপূর্বেই দক্ষিণভারত. লঙ্কা এবং পূর্বভারতীয় দীপপুঞ্জের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগ ছিল এই বন্দরের। সেই হিসেবে তাম্রলিপ্ত থেকে অভিযানকারী বিজয় সিংহের বাঙ্গালী হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। কারণ, খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে পশ্চিম উপকূলে ভারতীয় বাণিজ্যবাহী জাহাজের কথা তেমন কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায় নি।[৭৫] সমসাময়িক গ্রীক বিবরণ বলে যে আলেকজাণ্ডারের নৌবহর পশ্চিম সাগরে ছোট ছোট মাছধরা ডিঙ্গি ছাড়া অন্য বাণিজ্যতরী সাক্ষাৎ করে নি।

৪। লঙ্কা দ্বীপের প্রধান নদীর নাম মহাবেলি গঙ্গা (Indological studie Part III P. 212-Dr. B. C. Law)। টলেমি এই নদীকে গঙ্গা বলেছেন (Ancient. India as described by Ptolemy by J. W. McCrindle)। বিজয় লঙ্কা দ্বীপ অধিকার করে নিজের পিতৃভূমি সিংহপুরের নাম অনুসারে এই স্থানের নূতন নামকরণ করেন সিংহল। আগেই বলা হয়েছে, হুগলীজেলার তারকেশ্বরের কাছে সিংহবাহুর প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের মধ্যে সিংহল নামে একটি ছোট দ্বীপ ছিল। সেই নাম স্মরণ করে বিজয় সিংহ তাঁর অধিকৃত লঙ্কা দ্বীপের নাম রেখে ছিলেন সিংহল এবং নিজের দেশের প্রধান নদীর নাম হয়তো এই দেশের প্রধান নদীকেও দিয়েছিলেন! এখানেও বিজয় সিংহের সৌরাষ্ট্র থেকে আসার দাবির চেয়ে রাঢ় দেশ থেকে আসার স্বপক্ষে দাবি অনেক শক্তিশালী।

৫। লঙ্কা দ্বীপ (পেরিপ্লাসের সময়েও অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৬০-৮০ সাল) তাপ্রবেন

(গ্রীক), তাম্বপন্নী (পালি), তাম্রপর্ণী (সংস্কৃত) বলে পরিচিত ছিল। এই নামগুলি এবং তাম্রলিপ্ত নামের মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনই যোগসূত্রও কিছু থাকা সম্ভব। যেমন দাম্রলিপ্তি থেকে তাম্রলিপ্তি হয়েছে, দামিল থেকে তামিল হয়েছে, তেমনই কোন সংস্কৃত মূল শব্দ থেকে তাম্রপর্ণী নাম আসতে পারে। সুতরাং এই নামের মধ্যেও উত্তরপূর্ব ভারতের থেকে প্রসূত দ্রাবিড় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[১৬]

৬। মহাবংশ গ্রন্থে সিংহপুর ব্যতীত অন্য একটি নগরী যথা বঙ্গনগরের কথা বলা হয়েছে (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি-২য় খণ্ড, বিনয় ঘোষ)। এই বঙ্গনগর সৌরাষ্ট্রে অবস্থিত বলে কল্পনা করা নিতান্তই অসম্ভব।

এই সব যুক্তিসঙ্গত কারণেই লঙ্কাদ্বীপের নূতন আগন্তুক এবং বিজয়ীর পক্ষে বঙ্গদেশ থেকে উপনীত হওয়াই সম্ভব ছিল। রাঢ়দেশের তথা প্রাচ্য ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর এবং অন্যতম প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ও শহর তাম্রলিপ্ত যে গঙ্গারিডিদের প্রসিদ্ধ ঘাঁটি ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বঙ্গনগর তাম্রলিপ্ত হওয়াও অসম্ভব নয়, কারণ লক্ষ্য করা গেছে যে জৈন গ্রন্থে তাম্রলিপ্তকে বঙ্গের রাজধানী বলা হয়েছে।

এই বাঙ্গালী রাজপুত্রের লঙ্কা বিজয় এবং দ্বীপের সিংহল নাম করণ বিভিন্ন যুক্তিসঙ্গত কারণেই আজ ইতিহাসগতভাবে স্বীকার্য। এই প্রসঙ্গে বর্তমানের এক প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকের মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—'তর্কের বিষয়গুলি বাদ দিলেও বঙ্গ সিংহল সম্পর্কের প্রাচীন ইতিহাসের কয়েকটি ঘটনা ও সম্ভাবনা আজ পরিষ্কার। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল থেকে আর্য-ভাষাভাষী এক গোষ্ঠীর দ্বারা প্রাক-মৌর্যযুগে সিংহলে ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির প্রবর্তনের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না। যে বৌদ্ধ ধর্মের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতীয় আর্যভাষা প্রবলভাবে সিংহলকে প্রভাবিত করেছে, ওই দ্বীপে সেই ধর্মের প্রথম প্রচারকেরা বোধহয় তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকেই তাঁদের সমুদ্রযাত্রা আরম্ভ করেছিলেন। (আনন্দবাজার পত্রিকা ৬৬ বর্ষ ১০৩ সংখ্যা ১৫ আষাঢ় ১৩৯৪, নিবন্ধ—'সিংহলিরা কি আসলে বাঙ্গালী?' ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)।

এই নিবন্ধের উপসংহারে একটি বিশেষ বক্তব্য উপস্থাপিত করা সমীচীন বলে মনে হয়। রমাপ্রসাদ চন্দ (গৌড়রাজমালা) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ রাঢ় দেশকে আকারে ক্ষুদ্র এবং শক্তি ও সম্পদে নগণ্য মনে করে গঙ্গারিডি যে রাঢ়েই সীমাবদ্ধ ছিল—এমন কথা স্বীকার করতে সম্মত হন নি। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে গঙ্গারিডি রাঢ়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা নেই। গঙ্গারিডি হয়তো রাঢ়ের মধ্যেই শুধু বিস্তৃত ছিল না, রাঢ়দেশ অতিক্রম করেও প্রসারিত হয়েছিল। কিন্তু রাঢ়ভূমির সর্ববৃহত্তম পরিধি এবং সহায় ও সম্পদ সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি লক্ষণীয়ঃ—

'এখানকার মাটি কঠিন ও প্রস্তরময় এবং এতে চুন ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের মিশ্রণ স্পষ্ট দেখা যায়। কয়লা ও আকরিক লৌহে এই ভূখণ্ড খুবই সমৃদ্ধ।

ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল থেকে উদ্ভূত নদীগুলির দ্বারা বিধৌত এই জনপদটি উত্তরে রাজমহল থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।

এও সম্পূর্ণ রাঢ় নয়। ভাগীরথীর পূর্বদিকে বেশ কিছু দূরের অধিবাসীরা রাঢ়ী বলে পরিচিত। আবার ভাগলপুর অঞ্চলে যথেষ্ট রাঢ়ীর বাস আছে। তাদের ভাষা না বাংলা না হিন্দী না মৈথিলী। মানভূমের রাঢ়ী বোলি এর চেয়ে বেশী শুদ্ধ। রাঢ়ী অধ্যুষিত এই অঞ্চলটি পূর্বদিকে যশোহর খুলনার পশ্চিমার্ধ থেকে সুরু করে রাঁচী পাহাড়ের সানুদেশে অবস্থিত ঝালদা পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহাই রাঢ়ীদের বাসভূমি—রাঢ়।'[৭৭]

রাঢ়ের বিভিন্ন পর্যায়ের বিস্তৃতি ও তার আকৃতির স্বাভাবিক রূপটি বর্ণনা প্রসঙ্গে উপর্যুক্ত মন্তব্যগুলি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। এই সুন্দর বিশ্লেষণটির অন্তর্নিহিত বক্তব্যটি প্রতিধ্বনিত হয়েছে, অন্যত্র। 'বিহারের সর্বত্র বহু বাঙ্গালীরা উপনিবিষ্ট আছেন। তাঁরা উত্তর রাঢ়ী সম্প্রদায়ের' (চিন্ময় বঙ্গ—ক্ষিতিমোহন সেন)। বিহারের দক্ষিণপূর্ব যে একদা রাঢ়দেশের অন্তর্গত ছিল, তা আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

মহাভারতের ও পুরাণের সাক্ষ্য অনুযায়ী রাঢ় ও অঙ্গ প্রাচীনকাল থেকেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অঙ্গাধিপতি কর্ণ এক সময়ে সুহ্ম দেশ জয় করেছিলেন। ১৯১২ সালের আগে পর্যন্ত প্রাচীন অঙ্গদেশ (ভাগলপুর প্রভৃতি অঞ্চল) পশ্চিমবঙ্গ তথা প্রাচীন রাঢ়দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্মরণ থাকতে পারে যে বঙ্গভঙ্গের সময়ে পূর্ব-বিহারের বাংলাভাষী অঞ্চলগুলি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেটা হয়েছিল একটা ইতিহাসেরই ধারাতে এবং যুক্তিতে, তা সহজেই অনুমেয়। মানভূম, সিংভূম প্রভৃতি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি বাংলার হস্তচ্যুত হওয়ায় বাঙ্গালীর অপরিসীম ক্ষতি হয়েছিল।

নির্দেশিকা

১। The Early History of India —A. Vincent Smith.

২। উত্তরবঙ্গের ইতিহাস —সুকুমার দাশ।

৩। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (প্রথম খণ্ড) —বিনয় ঘোষ।

৪। সম্বন্ধ নির্ণয় (বিশেষ কাণ্ড) —লালমোহন ভট্টাচার্য।

৫। বিলুপ্ত রাজধানী —উৎপল চক্রবর্তী।

৬। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ড) —নগেন্দ্রনাথ বসু।

৭। বর্ধমানের ইতিকথা (প্রাচীন ও আধুনিক) —নগেন্দ্রনাথ বসু।

৮। The Encyclopaedea of Bengal, Behar and Orissa Compiled by Sri P. Lakshmi Narasia of Indian Encyclopaedeas Compiling and Publishing Co. Mount Road. Madras—1924-25.

৯। রাঢ়ভূমির সংস্কৃতি—শিবি ও চেতরাজ্য—ধর্মপূজার উৎস
—অশ্বিনীকুমার চৌধুরী।
১০। বাঙ্গালীর জাতিতত্ত্ব ও কৃষিজীবি সম্প্রদায় —ডঃ সুহৃদকুমার ভৌমিক।
১১। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা —ডঃ সনৎকুমার মিত্র।
১২। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ড) —নগেন্দ্রনাথ বসু।
১৩। Ancient Historical Tradition —F. E. Pargiter
১৪। বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী —রাধাকমল মুখোপাধ্যায়।
১৫। Changing Face of Bengal—Dr Radha Kumud Mukherjee
১৬। যশোহর খুলনার ইতিহাস —সতীশচন্দ্র মিত্র।
১৭। ভূতাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিমবঙ্গ —সংকর্ষণ রায়।
১৮। 'তারা ব্রহ্মদেশ ও শ্যামদেশের মোন এবং কম্বোজের (উত্তর-ইন্দোচীনের) ক্ষের শাখার মানুষের আত্মীয়, অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর অষ্ট্রো-এশিয়াটিক জাতির মানুষ'। (বাঙ্গলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতি অংশ দ্রষ্টব্য)
বাংলাভাষা ও বাঙ্গালীর সাহিত্য—প্রথম খণ্ড —গোপাল হালদার।
১৯। Tamils Eighteen Hundred years Ago (P P. 46. 235)
—Kanak Sabhai Pillay.
২০। প্রাচীন বাংলার গৌরব —মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
২১। 'মৌর্যযুগ থেকে আরম্ভ করে হিউ-এন-সাঙের সময় খৃঃ পূঃ ৪র্থ থেকে খৃষ্টীয় ৭ম শতক এই কয়েকশ বছরের মধ্যে বাঙ্গালী বলে একটি বিশিষ্ট জাতির সৃষ্টি হয়'।
বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা —ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
২২। বাংলার লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি —দুলাল চৌধুরী।
২৩। বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস —ধনঞ্জয় দাশমজুমদার।
২৪। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (প্রথম খণ্ড) — বিনয় ঘোষ।
২৫। অজানা বঙ্গকে জানো সঞ্জয় ভট্টাচার্য।
২৬। The Early History of India —A Vincent Smith.
২৭। রাঢ় ভূমির সংস্কৃতি-শিবি ও চেতরাজ্য-ধর্মপূজার উৎস
—অশ্বিনীকুমার চৌধুরী।
২৮। বাংলার সামাজিক ইতিহাস —ডঃ অতুল সুর।
২৯। রাঢ় ভূমির সংস্কৃতি—শিবি ও চেতরাজ্য—ধর্মপূজার উৎস
—অশ্বিনীকুমার চৌধুরী।
৩০। ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
৩১। বিদেশীর চোখে ভারত (ফা-হিয়েন) —সংকলন, প্রেমময় দাশগুপ্ত।
৩২। রাঢ়ভূমির সংস্কৃতি—শিবি ও চেতরাজ্য—ধর্মপূজার উৎস
—অশ্বিনীকুমার চৌধুরী।

৩৩। রাঢ়ভূমির সংস্কৃতি—শিবি ও চেতরাজ্য—ধর্মপূজার উৎস
—অশ্বিনীকুমার চৌধুরী।
৩৪ চিন্ময় বঙ্গ —ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী।
৩৫ সম্রাট অশোকের ত্রয়োদশ মুখ্য গিরিশাসন (সাহবাজগঢ়ী)।
৩৬ দ্বিতীয় মুখ্য গিরিশাসন (ধৌলি)।
৩৭ হুগলী ও হাওড়া জেলার ইতিহাস —বিধুভূষণ ভট্টাচার্য।
৩৮ হুগলী ও হাওড়া জেলার ইতিহাস —বিধুভূষণ ভট্টাচার্য।
৩৯ বাঙ্গালীর ইতিহাস —কমল মজুমদার।
৪০ The Historial Geography of Ancient India
—Sir Alexander Cunningham.
History of Orissa —R. D. Banerjee.
৪১। বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাস —ধনঞ্জয় দাশমজুমদার।
৪২। যশোহর খুলনার ইতিহাস —সতীশচন্দ্র মিত্র।
৪৩। বঙ্গভূমিকা —ডঃ সুকুমার সেন।
৪৪। Classical Accounts of India (Pliny P. 341)
—Dr. R. C. Majumdar.
৪৫। মেদিনীপুরের ইতিহাস (প্রাকৃতিক বিবরণ ও ভু-বৃত্তান্ত)
—যোগেশচন্দ্র বসু।
৪৬। হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ় —অম্বিকাচরণ গুপ্ত।
হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস —বিধুভূষণ ভট্টাচার্য।
পৌরাণিকা (পৃঃ ৪৫৬-৫৭ রাঢ়)—'প্লিনীর গোঙ্গিড্র বা কলিঙ্গ মেগাস্থিনিস ও টলেমির গঙ্গারিডাই। টলেমির সময়ে রাজধানী ছিল গঙ্গে বর্তমানের সপ্তগ্রাম। গঙ্গাবংশীয় কোন রাজার রাজত্ব ছিল বলে গাঙ্গেস ত্রিজিয়া ইত্যাদি নাম হয়েছিল।' —অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
Indian shipping R. K. Mukherjee.
৪৭। মেদিনীপুরের ইতিহাস (প্রাকৃতিক বিবরণ ও ভু-বৃত্তান্ত)
—যোগেশচন্দ্র বসু।
৪৮। রম্যানি বীক্ষ্য (ভাগীরথীপর্ব) —সুবোধ চক্রবর্তী।
৪৯। 'পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে আর পূর্বে পদ্মা মেঘনা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, এই ত্রিভুজাকৃতি ভুভাগই গঙ্গার বদ্বীপ'—বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা —কপিল ভট্টাচার্য
৫০। বাংলাদেশের নদ নদী ও পরিকল্পনা —কপিল ভট্টাচার্য।
৫১। প্রাচীন বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর পরিচয় —অমূল্যকুমার চট্টোপাধ্যায়।
৫২। 'অনেকের অনুমান চন্দ্রকেতুগড়ই "পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সী" (খৃষ্টীয় প্রথম শতক) নামক গ্রন্থে উল্লিখিত গাঙ্গেয় বন্দর এবং টলেমি (আনুঃ দ্বিতীয় শতক) কথিত গঙ্গারিডি'। (বিশ্বকোষ দশম খণ্ড)।

৫৩। বর্ধমানের ইতিকথা (প্রাচীন ও আধুনিক) —নগেন্দ্রনাথ বসু।
৫৪। বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাস —ধনঞ্জয় দাশমজুমদার।
৫৫। নব জ্ঞান ভারতী (ভৌগোলিক) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
৫৬। বাণিজ্যে বাঙ্গালী—একাল ও সেকাল —সুভাষ সমাজদার।
৫৭। প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় —গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত।
৫৮। বাংলার সামাজিক ইতিহাস —ডঃ অতুল সুর।
৫৯। যশোহর ও খুলনার ইতিহাস —সতীশচন্দ্র মিত্র।
৬০। Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian —P. 160. J. W. McCrindle.
৬১। History of Ancient Bengal —Dr. R. C. Majumdar.
৬২। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (প্রথম খণ্ড) —বিনয় ঘোষ।
৬৩। বাঙ্গালীর ইতিহাস —কমল মজুমদার।
৬৪। গৌড়ের ইতিহাস —রজনীকান্ত চক্রবর্তী।
৬৫। গৌড়ের ইতিহাস —রজনীকান্ত চক্রবর্তী।
৬৬। উত্তরবঙ্গের ইতিহাস —সুকুমার দাস।
৬৭। বাণিজ্যে বাঙ্গালী—একাল ও সেকাল —সুভাষ সমাজদার।
৬৮। বীরভুমের ইতিহস —গৌরীহর মিত্র।
৬৯। 'ভারতীয় আর্যভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সিংহলী অনেকটা নিজস্ব পথে বিবর্তিত হইয়াছে। তাহার উপর ইহাতে তামিল ভাষার প্রভাব পড়িয়াছে।' —ডঃ সুকুমার সেন। (ভারতকোষ)
৭০। নব জ্ঞান ভারতী (ভৌগোলিক) —প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
৭১। Ancient India B. C. 900—A. D. 1000 Vol I —T. L. Shah.
৭২। India in Ceylonese History, Society and culture —M. D. Raghavan.
এই গ্রন্থে বলা হয়েছে লাল বা লাট রাজ্যকে গুজরাটের লাট জনপদের সঙ্গে অভিন্ন বলে স্বীকার করা যায় না।
'We may note here that Lala which is mentioned in this story (Mahavamsa and Dipavamsa) has been proved by H. C. Ray in an interesting note, to be identical with Radha' (H. C. Ray-Lala, A note J. A. S. B. new series.—Vol XVIII 1922 No 7)—quoted from 'Tribes in Ancient India'—Dr. B. C. Law P. 265.
৭৩। History of Ancient Bengal (prehistoric period) —Dr. R. C. Majumdar.

৭৪। Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian —P 139-40 J. W. McCrindle.
Classical Accounts of Ancient India—P. 342 —Dr. R. C. Majumdar.

৭৫। "Our first clear account of the seas west of India gives no sign of the trade carried only by Indians in that direction. Nearchus, who commanded Alexander's fleet (in 326 B. C.) did not meet a single ship in coasting from Indus to the Euphrates and expressly says that fishing boats were the only vessels he saw, and those only in particular places and in small numbers. Even in the Indus, though there were boats, they were few and small, for by Arrian's account, Alexander was obliged to build most of his fleet himself, including all the larger vessels, and to man them with sailors from the mediterranean". History of India (Early Hindu expedition to Java—Early exports)—Mount Stuart Elphinstone.

৭৬। 'Most of the Mongolian tribes emigrated to southern India from Tamalitti, the great emporium of trade at the mouth of the Ganges and this accounts for the name "Tamils" by which they were collectively known among the most ancient inhabitants of Deccan. The name Tamil appears to be therefore only an abbreviation of the word Tamalitti. The Tamraliptas are alluded to along with the Kosals and Odras as inhabitants of Bengal and adjoining sea coast in the Vayu and Vishnu Puranas. They are known as Tamils most probably because they had emigrated from Tamalitti (Tamralipti) the great sea port at the mouth of the Ganges' (Tamils Eighteen Hundred Years Ago—P. P. 46, 235. Kanaksabhai Pillay.)
History of Ancient Bengal (Economic Conditions —Trade and Commerce) —Dr. R. C. Majumdar.

৭৭। গৌড় কাহিনী —শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ।

গঙ্গে বা ভ্রান্তি

গঙ্গে বা গঙ্গা নগর ও বন্দর বেশ প্রাচীনত্ব দাবি করতে পারে। কিন্তু, যেমন গঙ্গারিডি ও প্রাসীর কথা আমাদের দেশীয় সাহিত্যে, ধর্মগ্রন্থে অথবা কিম্বদন্তীরূপে কোথাও কথিত হয় নি, তেমনই 'গঙ্গা' বা 'গঙ্গের' কথাও বলা হয় নি।

বৈদেশিক বিবরণে এই স্থানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে আলোকপাত হয়েছে, শুধুমাত্র সেই স্বল্প আলোকে আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানটিকে ইতিহাসের পরিধির মধ্যে লক্ষ্য করি। কিন্তু এই স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয়ের প্রচেষ্টায় অনেক কারণে বহুবিধ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। বিভ্রান্তির মূলে আরও আছে কিছু কিছু আঞ্চলিক, অস্বচ্ছ, এবং অনড় দৃষ্টিভঙ্গী, যার সঙ্গে ইতিহাসগত ভুগোলের সামঞ্জস্য করা নিরর্থক।

এই গঙ্গে বা গঙ্গা নগর ও বন্দরকে যথার্থভাবে জানবার বিষয়ে বৈদেশিক লেখকদের সাক্ষ্যই প্রধান ও প্রায় একমাত্র উপায়। তাঁদের বিবরণগুলিও অনেক সময়ে বিভ্রান্তিকর। কিন্তু তবুও 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থকারের এবং টলেমির লেখনীতে এই স্থানটির একটি চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে যদিও স্থানটিকে সন্দেহাতীতভাবে এখনও চিহ্নিত করা সম্ভব হয় নি।

গ্রীক ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক স্ট্রাবো তাঁর ভুগোলের (খৃষ্টীয় ১৭ থেকে খৃষ্টীয় ২৩শের মধ্যে চূড়ান্তভাবে সংশোধিত) মন্তব্য করেছিলেন যে (আর্টিমি-ডোরাসের বর্ণনা অনুসারে) গঙ্গা নদী 'ইমোদা' পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণের দিকে প্রবাহিত হয়েছে এবং যখন 'গঙ্গা' শহরে এসে পৌঁচেছে তখন এই নদী পূর্বদিকে ঘুরে পাটলিপুত্রের কাছে এসে সাগরের দিকে নির্গম পথে চলে গেছে।' এই 'গঙ্গা' শহর অনেকের মতে প্রয়াগ।

টলেমি তাঁর নিজের বর্ণিত গঙ্গার পাঁচটি সাগর মুখের দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির মধ্যে গঙ্গে নগর / বন্দরকে স্থাপন করেছিলেন। এই নিয়ে আজ পর্যন্ত বিতর্কের অন্ত নেই। কিন্তু তাঁর সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য নয় এবং তাঁর ভৌগোলিক চিত্রটির মধ্যে অনেক ত্রুটি এবং অসামঞ্জস্য আছে, যা আগেই জানানো হয়েছে।

'পেরিপ্লাস অফ দি এরিথিয়োন সী'র নাবিক-গ্রন্থকার কি কখনও উপর্যুক্ত নগর ও বন্দরকে গঙ্গার মোহনার খুব কাছাকাছি বলেছেন? অথবা গঙ্গে / গঙ্গাকে সাগর সঙ্গমে অবস্থিত বলে বলেছেন? ঠিক কি বলা হয়েছে তা নিরূপণ করা আমাদে পক্ষে একান্তভাবে আবশ্যক। সূত্রগলির সাহায্যে আগে তথ্যগুলি সংগ্রহ করতে হবে। তারপরে তথ্যগুলির বিচার ও বিশ্লেষণ করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে।

এই বিষয়টি সম্প্রসারণ এবং তার দ্বারা সমস্যাটিকে সমাধান করতে সচেষ্ট হবার আগে, অন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য। নিছক নামটির সাহায্যে স্থান নির্ধারণের কাজটি বিবেচনা করা হলে, স্বাভাবিকভাবেই

মনে হবে যে এই নগর ও বন্দরটি গঙ্গা নদীর উপরে অবস্থিত ছিল। যদি সাগর সঙ্গমে অথবা সমুদ্রের উপরে এই বন্দরের অবস্থান হতো, তবে এর নাম গঙ্গে বা গঙ্গা না হয়ে, অন্য কিছু হতো।

ইংরাজীতে Gange শব্দটির বাঙ্গলা উচ্চারণে এটা গঙ্গে বা গঙ্গা না হয়ে গঞ্জ বা গঞ্জীও হতে পারে, বিশেষভাবে যখন উপর্যুক্ত গ্রন্থকারের বিবরণে এই স্থানটিকে একটি market town অথবা হাট পত্তন বলে বলা হয়েছে। সমুদ্রের উপর দিয়ে পূর্বদিকে অগ্রসর হবার সময়ে নাবিক বামদিকে একটু দূরে নদীর উপকূলে এই স্থানটিকে লক্ষ্য করেছিলেন, ডান দিকে ছিল সমুদ্র।[২]

এই বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের উপর কল্পনার জাল বিস্তার করে কিভাবে বলা যায় যে বর্তমান সাগরদ্বীপ অথবা চন্দ্রকেতুগড় এই গঙ্গে অথবা গঙ্গা বন্দর! সমবঙ্গের অধিপতি সমুদ্রসেনের অন্যতম রাজধানী ছিল বেড়াচাঁপার নিকট চন্দ্রকেতুগড় দ্বীপ—এই কথা বলা হয়েছে দিলীপ কুমার মৈতে লিখিত "চন্দ্রকেতুগড়" নামক পুস্তকে। "বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাস" গ্রন্থের রচয়িতা ধনঞ্জয় দাশমজুমদার এই একই কথা বললেও, তিনি চন্দ্রকেতুগড়কে গঙ্গে বা গঙ্গা বলে স্বীকার করেন নি। কিন্তু দিলীপ কুমার মৈতে প্রমুখ অনেকেই তা বলেছেন এবং হয়তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং অজ্ঞাতসারে কোন ভ্রমে পতিত হয়েছেন!

এই বিভ্রান্তি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আরও একটি বিশেষজ্ঞের অভিমতের উল্লেখ করা যেতে পারে। এইখানে কুমুদরঞ্জন মল্লিক রচিত 'নদীয়া কাহিনী' পুস্তক থেকে একটি উদ্ধৃতি অসঙ্গত হবে না :—

"Gour also called Laknowti, the ancient capital of Bengal and supposed to be the Gangia Regia of Ptolemy stood on the left bank of the Ganges about 25 miles below Rajmahal. It was capital of Bengal 30 years before Christ (Major Rennell's map of Hindusthan)".

গৌড়ের কাছে সাগর সঙ্গম হলে, গৌড়কে 'গঙ্গে' বন্দর বলে হয়তো কল্পনা করা যায়! মহাভারতের কালে তো বটেই এবং তার অনেক পরেও গৌড়ের কাছাকাছিই সমুদ্র ছিল। সুতরাং গঙ্গে বন্দর ও 'গাঞ্জি রেজিয়া'র চিহ্নিত করণে এই উক্তি স্বাভাবিক ভাবেই বিবেচনার যোগ্য। বিশেষভাবে যখন গঙ্গারিডির তাৎকালীন রাজধানীর কথা বলা হয়েছে। গৌড়ের অস্তিত্ব অতি সুপ্রাচীন কাল থেকেই স্বীকৃত—অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে গৌড়ের উল্লেখ আছে। পাণিনির অষ্ট্যাধ্যায়ীতেও গৌড়ের উল্লেখ আছে যদিও অনেকের মতে সেই গৌড় বাংলার গৌড় নয়।

চন্দ্রকেতু গড়ের প্রসঙ্গে ফিরে এসে আমরা স্মরণ করতে পারি যে স্বর্গীয় রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দ্রকেতু গড়ের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে অধিকতর অনুসন্ধান এবং পরীক্ষার প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী—এই স্থান বাংলার অন্য অনেক স্থানের তুলনায় অনেক পুরাতন।[৩]

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে চন্দ্রকেতুগড় গঙ্গার উপরে নয়, ছিলও না। টলেমি নির্দিষ্ট পাঁচটি সাগর মুখের কোন একটির নিকটেও নয়। আদি গঙ্গা থেকে নিঃসৃত একটি শাখানদী বিদ্যাধরীর উপকূলে এই বেড়াচাপা / চন্দ্রকেতুগড় অবস্থিত ছিল। নিকটবর্তী দেগঙ্গা নামক স্থানটি বোধহয় এই স্থলের গঙ্গে বলে ভ্রান্তি হওয়ার অন্যতম সূত্র! সমুদ্র থেকে এই বন্দরটি দেখতে পাওয়া যেতো এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না, যদিও কলকাতা থেকে উত্তরপূর্ব দিকে লবণ হ্রদের অস্তিত্ব হয়তো সেই স্থান থেকে সমুদ্রের নৈকট্য প্রমাণ করে।

কোন বিষয়ের ধারণাকে পরিষ্কার করতে হলে, এইসব ভ্রান্তিকে প্রথমেই অপসারিত করতে হবে। যদি বৈদেশিকগণ কোন স্থানের ভারতীয় নামের সঙ্গে পরিচিত হয়ে থাকেন, তবে সেই স্থানীয় নামটিকে নিজেদের মতো বিকৃতভাবেই উচ্চারণ করবেন এবং লিখবেন। এক্ষেত্রে কিন্তু তাঁরা নামটিই সঠিকভাবে জানতেন না বলে মনে হয়। অন্ততঃ গঙ্গে বা গঙ্গা নামটি তাইই বুঝিয়ে দেয়।

পাটলিপুত্রকে তাঁরা পলিমবোথরা, পলিবোথরা ইত্যাদি বলে তাঁদের নিজেদের মতো উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু গঙ্গে বা গঙ্গা সম্বন্ধে এই যুক্তি বা চিন্তা প্রয়োগ করা যায় না। তবে এটা কি ভ্রান্তি! এ'কথা এখন সঠিকভাবে অনুমান করাও কষ্টসাধ্য। তবে স্থানটির নাম ও নদীটির নাম যে অভিন্ন, একথা অজানা নাবিকটি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন।

এমনও হতে পারে যে বিদেশীরা সেই প্রাচীন যুগে নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় গঙ্গা-ভিত্তিক এবং গঙ্গার তীরে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী এবং তাদের দেশ বোঝাতে যেমন গঙ্গারিডি নামটি ব্যবহার করেছিলেন, তেমনই তাঁরা ভারতের প্রধানতম নদীর উপর নির্ভরশীল এই বিশাল জনগোষ্ঠীর অন্যতম বন্দর ও তদানীন্তন রাজধানীকে এই নদীর নামেই চিহ্নিত করেছিলেন। দেশীয় লোকেদের নিকট এই গঙ্গে বা গঙ্গানগর বা বন্দরের ভিন্ন নাম থাকলেও, বিদেশী লেখকেরা সেই নদীর নাম দিয়েই তার নাম নির্দিষ্ট করেছিলেন। নদীর নাম দিয়ে তাঁরা দেশ ও জাতির নামকরণ করেছিলেন। সুতরাং নদীর নামে নগর / বন্দর চিহ্নিত করা তাদের পক্ষে বিচিত্র ছিল না। আরও ছিল না এই কারণে যে এই বিপুলকায়া গঙ্গানদীর বিরাটত্ব, গভীরত্ব এবং গুরুত্ব তাঁদের বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল। এই অনুমানটি অত্যন্ত সঙ্গত বলেই মনে হয়, কারণ জৈন, বৌদ্ধ, সিংহলীয় প্রভৃতি অন্য কোন সূত্রেই 'গঙ্গে' বন্দরের নাম পাওয়া যায় না।

গঙ্গারিডি গবেষণা কেন্দ্র (কাকদ্বীপ) সাগর দ্বীপকে "পেরিপ্লাস" গ্রন্থকার এবং টলেমি বর্ণিত 'গঙ্গে' নগরী বলে দাবী করেছেন (গঙ্গারিডি ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ—প্রথম সংস্করণ—শ্রীনরোত্তম হালদার)। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার ১৯৪৭ সালে লিখিত তাঁর "The City of the Ganga" নামক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধে বর্তমান গঙ্গাসাগর বা গঙ্গাসাগর সঙ্গমের কাছে এই বন্দর ছিল বলে অনুমান করেছিলেন।[৪]

পরবর্তীকালে তিনিই এই 'গঙ্গে' সম্বন্ধে যা মন্তব্য করেছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—"টলেমির ভূগোলে এই নগরীকে Gangaridai বা বঙ্গজাতির রাজধানী বলা হয়েছে। নাম থেকে নগরীটিকে গঙ্গাসাগর বলে সন্দেহ হয়। তবে সেই প্রাচীন যুগে গঙ্গাসাগর সঙ্গম থেকে তাম্রলিপ্তের দূরত্ব কতটা ছিল, তা অজ্ঞাত। আবার গঙ্গার বিভিন্ন মোহানার তীরে আরও কতকগুলি নগর-বন্দরের অস্তিত্ব নবাবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তাই এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করা কঠিন। Ptolemy-র ভূগোল থেকে এই সমস্যার সমাধান হয় না।"[৫]

"পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি" (১ম খণ্ড) গ্রন্থে বিনয় ঘোষ সাগর দ্বীপের গঙ্গে বন্দর হওয়ার স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করলেও, অতীত এবং ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন—"সাগরদ্বীপের অতীত ইতিহাস আছে, কিন্তু তা আজ অবলুপ্ত। ঝড়, ঝঞ্ঝা, প্লাবনে বহুবার বিধ্বস্ত সাগরদ্বীপ যদি তার অতীতের ইতিহাস হারিয়ে ফেলে থাকে, তাহলে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। প্রাচীন সমুদ্র বন্দর তাম্রলিপ্তের যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে সাগরদ্বীপের তা হওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু সাগরদ্বীপ প্রাচীন গ্রীক ভৌগোলিবদের বর্ণিত Gange বা গঙ্গারিডি কিনা অথবা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী এখানে ছিল কিনা, তা নিয়ে অনুমানের কুয়াশা বিস্তার করা বৃথা।......"[৬]

প্রাচীন গঙ্গানগরী যে বর্তমান গঙ্গাসাগরে হওয়া সম্ভব নয়, একথা আগেই বলা হয়েছে। উপর্যুক্ত ঐতিহাসিক (ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার) এক সময়ে গঙ্গসাগরের সমর্থনে লেখনীধারণ করলেও, পরবর্তীকালে তিনি তাঁর নিজের অনুমান সম্বন্ধে সংশয়াম্বিত হয়েছিলেন বলেই মনে হয়। এই কথা বিনয় ঘোষ সম্বন্ধেও একইভাবে প্রযোজ্য।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের মনে সন্দেহ জাগার কারণ এই ছিল বলে প্রতীয়মান হয় যে (১) বর্তমান সাগর-সঙ্গম এবং তৎকালীন গঙ্গাসাগর সঙ্গম একই স্থানে ছিল কিনা এই সম্বন্ধে দ্বিধা, এবং (২) তৎকালীন তাম্রলিপ্ত বন্দর হয়তো গঙ্গাসাগর থেকে দূরে ছিল না (গঙ্গা অথবা সরস্বতীর সঙ্গম), অর্থাৎ তাম্রলিপ্তেরই 'গঙ্গা' বা গঙ্গে নগর / বন্দর বলে অভিহিত হবার সম্ভাবনা ছিল।

তাম্রলিপ্তের বিবরণ প্রদানের উপসংহারে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার বলেছেন—"Shui-Chung-Chi সংজ্ঞক খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর একখানি চীনা গ্রন্থে দেখা যায়, Tan-mei (তাম্র অর্থাৎ তাম্রলিপ্ত) একটি রাজ্য ও রাজধানীর নাম এবং স্থানটি গঙ্গার মোহানায় অবস্থিত ছিল।"[৭]

সুতরাং এই তাম্রলিপ্তকে নিয়েও গঙ্গে ভ্রান্তির অবকাশ ছিল এবং আছে। যদি টলেমি কর্তৃক 'টামালিটেস' বলে বর্ণিত জনপদটিকে তাম্রলিপ্ত বলে ধরে নেওয়া যায়, তবে একথা প্রমাণিত হয় না যে 'টামালিটেস' দেশ ও 'টামালিটেস' (তাম্রলিপ্ত) বন্দর এক ও অভিন্ন ছিল। 'গঙ্গে' বন্দর বলতে এই বন্দরটিকেই হয়তো বুঝিয়ে থাকবে। এইরকম অনুমান করা ইতিহাসবিরুদ্ধ নয়।

তাম্রলিপ্ত বন্দরই যে 'গঙ্গে' বন্দর, একথা একটি সুবিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থে বলা হয়েছে।[৮] দেশটি বঙ্গদেশ (গঙ্গানদী ভিত্তিক) এবং গঙ্গে শহর / বন্দর, তাম্রলিপ্ত। চৈনিক পরিব্রাজকেরা যে গঙ্গা ও বঙ্গ এক দেশ বলে মনে করেছিলেন, তা থেকে এই কথাই মনে হয় যে গঙ্গা দেশটি গঙ্গারিডি কিন্তু শহর / বন্দরটি তাম্রলিপ্ত।

এ কথা আগে বলা হয়েছে যে টলেমির অভিমত অনুযায়ী খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গঙ্গারিডির রাজধানী ও প্রধান বন্দর গঙ্গে।[৯] সেই সময়ে 'গঙ্গে' গঙ্গারিডিদের রাজধানী অথবা বন্দর হওয়ার কারণ এই যে সেই সময়ে আগেকার রাজধানী পর্তেলিস (পার্থালিস) হয়তো কলিঙ্গীদের অধিকারভুক্ত হয়েছিল। এই অনুমানের উপর নির্ভর করে অনুসন্ধানের সাপেক্ষে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে কলিঙ্গের সামরিক শক্তি এবং রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির কালে নাবিক গ্রন্থকারের বিবরণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে কেবল সপ্তগ্রামকেই 'গঙ্গে' বন্দর নগর বলে চিহ্নিত করা যায়।

এই বক্তব্যের দৃঢ়তর ঐতিহাসিক সমর্থন হিসেবে এই কথা বলা যায় যে 'গঙ্গা' দেশটিকে কলিঙ্গ এবং মগধের মধ্যস্থলে বলে বর্ণনা করা হয়েছে (তৃতীয় কৃষ্ণের করহাদ শাসনলেখ অনুযায়ী)। এই পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে অনুমান করা যায় যে বিদেশী নাবিক লিখিত গঙ্গাদেশ / রাষ্ট্র সুহ্ম দেশ তথা রাঢ় দেশ ; গঙ্গা নদী, গঙ্গা তথা সরস্বতী নদী ; এবং গঙ্গা বন্দর সপ্তগ্রাম শহর / বন্দর, যে স্থান প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে সুহ্ম তথা রাঢ়দেশের রাজধানী ছিল।—"The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India"—N. L. Dey

এই বিষয়টি অর্থাৎ 'গঙ্গে' বন্দরের প্রকৃত ভৌগোলিক অবস্থানটি সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য 'Periplus of the Erythrean Sea' গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক অংশের নিম্নে উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদটি অনুধাবন করা একান্তভাবে আবশ্যক ঃ—

"অতঃপর পথ পুনরায় পূর্বদিকে বাঁক নেয়, এবং ডাইনে মুক্ত সমুদ্র এবং বাঁয়ে দূরে উপকূল রেখে জাহাজ চালালে পরে গঙ্গা দেখা যাবে, এবং তার কাছেই পূর্ব দিকের সর্বশেষ দেশ—সুবর্ণভূমি (Chryse)। এর নিকটে এক নদী আছে নাম গঙ্গা, এবং এই নদীর উৎপত্তি ও বিলয় ঠিক নীল নদেরই মতো। এই নদীর তীরে এক হাট-পত্তন (market town) আছে, তার নাম ও নদীর নাম একই, গঙ্গা (Ganges)। এইখান দিয়ে আসে তেজপাতা (malabathrum), গাঙ্গেয় সুগন্ধি অঞ্জন তৈল (Gangetic spikenard) ও মুক্তা এবং সর্বাধিক উৎকৃষ্ট প্রকারের মসলিন যা বলা হয় গাঙ্গেয় (Gangetic)। শোনা যায় যে এই সব স্থানের নিকট সোনার খনি আছে, এবং এক রকমের সোনার মোহর চলে যাকে বলে কলটিস (Caltis)।"[১০]

এই বিবরণ থেকে 'গঙ্গা' বা 'গঙ্গে' বন্দরের যথার্থ স্থান নির্ণয় করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। কিন্তু উপর্যুক্ত বিবরণ এই সত্যই প্রতিপন্ন করে যে বন্দরটি আদৌ সাগর বন্দর ছিল না, কারণ স্পষ্টই বলা হয়েছে—'এই নদীর তীরে এক হাট-পত্তন

(market town) আছে যার নাম ও নদীর নাম একই (Ganges)।'[১১] তা ছাড়া, এই বিবরণে উক্ত সুবর্ণভূমি যে ব্রহ্মদেশ (মলাক্কা দ্বীপপুঞ্জ নয়), তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে এক নদী বন্দরের অস্তিত্বের কথা জানানো হয়েছিল ঐ অজ্ঞাতনামা নাবিকের গ্রন্থে। হয়তো সমুদ্র থেকে সেই বন্দর বেশী দূরে অবস্থিত ছিল না। কিন্তু বন্দরটি কোনক্রমেই সমুদ্র বন্দর ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে কোন কারণেই হোক কেউ কেউ বিপরীত মত পোষণ করে লিখেছেন ঃ—

"পেরিপ্লাস গ্রন্থকার তাঁর জাহাজে ডান দিকে সমুদ্র ও বাঁদিকে উপকূলভাগ ধরে পূর্বদিকে যাওয়ার সময়ে গঙ্গে বন্দর প্রত্যক্ষ করেছিলেন ; সুতরাং সমুদ্র থেকে দূরে অবস্থিত গৌড়, দেগঙ্গা, বা সপ্তগ্রাম অপেক্ষা গঙ্গার সাগর সঙ্গম তীর্থই সেই সমুদ্র বন্দর হওয়া সম্ভব। গঙ্গানদীর পশ্চিমতীরের তাম্রলিপ্ত বন্দরও গঙ্গে হতে পারে না, কারণ গ্রীক বর্ণনা অনুসারে প্রাচীন গঙ্গা নদীর পূর্বদিকে ছিল গঙ্গে বন্দর ও গঙ্গারিডিদের রাজ্য ও পশ্চিমদিকে ছিল প্রাসী।..."[১২]

বিদেশী লেখকদের বিবরণ কোথাও বলে না যে গঙ্গানদীর পূর্ব দিকে ছিল 'গঙ্গে' বন্দর এবং পশ্চিম দিকে ছিল প্রাসী দেশ।

গ্রীক নাবিকের বর্ণনা অনুসারে 'গঙ্গে' বন্দর তার (জাহাজের) বাঁদিকে ছিল। যদি গঙ্গা (সরস্বতী) নদীর মধ্যে প্রবেশের মুখে এই বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল মনে করা যায়, তবে গঙ্গে বন্দর নিঃসন্দেহে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় ছিল। সোনার খনি বা সোনার মোহরের সংবাদ সেই নাবিক অথবা অন্য কোনও নাবিক সমুদ্রের উপর জাহাজে ভাসমান অবস্থাতেই নিশ্চয় পান নি। নিকটতম সোনারখনি কোথায় ছিল তা বলা শক্ত। তবে রাঢ়দেশে তাম্রলিপ্তের নিকট সোনা পাওয়া যেতো। কাঁপশা, সুবর্ণরেখা প্রভৃতির নদীর বালুকণার মধ্যেও সোনার টুকরা লুকিয়ে থাকতো।

গ্রীক নাবিক-গ্রন্থকারের বিবরণের অন্য আর একটি ভাষ্য আমরা বিশ্লেষণের জন্য অনুধাবন করতে পারি—"পেরিপ্লাস তাঁহার ইরিথি মেরী গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন বঙ্গদেশের গঙ্গার পশ্চিমতীরে গঙ্গারাঢ়ী রাজাগণের রাজধানী গঙ্গানগর অবস্থিত। এই রাজধানীর পার্থেলিস বা পাণ্ডুয়া বন্দরে প্রবাল, মুক্তা ও ধাতব তৈজস পত্র সদাই বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকিত। কার্পাস বস্ত্র এবং জাহাজের দড়ি স্তূপাকারে পড়িয়া থাকিত। অতি উত্তম রেশম ও মসলিন ঐ স্থানে পাওয়া যাইত।" (বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাস—ধনঞ্জয় দাশমজুমদার)।

এই বিবরণটি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবানুগ নয়, কারণ পেরিপ্লাস গ্রন্থকার পার্থালিসের নাম উল্লেখ করেন নি। কিন্তু এই বিবরণের মধ্যে তিনটি বিষয়ে আলোকপাতের প্রচেষ্টা আছে। এক, গঙ্গারিডি রাজ্য গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত। দুই, গঙ্গারিডিদের রাজধানী গঙ্গানগর গঙ্গার উপর অবস্থিত। তিন, গঙ্গানগর ছিল শুধুমাত্র রাজধানী, বন্দর নয় ; বন্দরটির নাম পার্থেলিস বা পাণ্ডুয়া যা গঙ্গানগরের সন্নিহিত। কিন্তু এই বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে এই যে মেগাস্থিনিসের যুগে যে নগর

পর্তেলিস (প্লিনীর বিবরণ অনুযায়ী) নামে পরিচিত টলেমি এবং 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থকার তাকেই 'গঙ্গে' বলে অভিহিত করেছেন।

বর্তমানে বর্ধমান থেকে দক্ষিণে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানটি প্রাচীনকালে ভাগীরথী এবং দামোদরের জলরাশিপুষ্ট ভূখণ্ডের অংশ ছিল। গাঙ্ অর্থে নদী বা জল। এই অঞ্চলে বর্ধমানের কাছেই গাংপুর নামে একটি স্থান আছে। পশ্চিমে দামোদর পূর্বে ভাগীরথী এবং মধ্যে সরস্বতী এই অঞ্চলটিকে কৃষিসমৃদ্ধ ছাড়াও একটি নদীবহুল, বাণিজ্যিক অঞ্চলে রূপান্তরিত করেছিল প্রাচীন কালে। সমুদ্রও এই অঞ্চল থেকে বেশী দূরে ছিল না, কারণ দক্ষিণ-পূর্বে বর্তমান কলিকাতাসহ ২৪ পরগণার অধিকাংশই সেই যুগে (অর্থাৎ গঙ্গারিডিদের সময়ে) সমুদ্রের গর্ভে ছিল এবং হয়তো গঙ্গার সাগরসঙ্গম ছিল ত্রিবেণীর নিকট। সুতরাং গঙ্গা নগর বা গঙ্গে বন্দর যে এইখানেই ছিল, এমন চিন্তা করা অসঙ্গত নয়।

ত্রিবেণী বন্দর ও শহর এই অঞ্চলের কাছেই ছিল। 'বর্তমান হুগলী জেলায় ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম-পাণ্ডুয়াকে প্রাচীন সুহ্ম দেশের হৃদপিণ্ড বলে মনে করা যেতে পারে' (History of Bengal Vol I Dacca University Publication—Edited by Dr. R. C. Majumdar).

ধনঞ্জয় দাশমজুমদার কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে গঙ্গা বন্দর / নগর তাম্রলিপ্ত থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু বন্দরটি সাগর বন্দর নয়, এবং গঙ্গার পূর্ব তীরেও অবস্থিত নয়। পেরিপ্লাস গ্রন্থের দুটি বিভিন্ন ভাষ্য থেকে এই কথা প্রতীয়মান হয় যে গঙ্গে বন্দর কখনই সামুদ্রিক বন্দর ছিল না এবং এই বন্দর তথা নগরটি গঙ্গার উজানেই ছিল। হয়তো খৃষ্টীয় প্রথম / দ্বিতীয় শতাব্দীতে আরও ভাটির দিকে এসেছিল এবং সমুদ্রপথ থেকে লক্ষ্য করা যেতো

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই গঙ্গে ভ্রান্তিটি নিতান্তই মনুষ্যকৃত এবং হয়তো কিছুটা ইচ্ছাকৃতও বটে। গঙ্গারিডি সম্বন্ধে এই একই মন্তব্য প্রয়োগ করা যায়। রাঢ়দেশকে গঙ্গারিডির পরিধি থেকে বাদ দেওয়ার যে প্রবণতা এক শ্রেণীর খ্যাতনামা ঐতিহাসিকদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছিল, তারই পরিণতিতে গঙ্গারিডিকে দক্ষিণ বঙ্গের বর্তমান সাগর মোহনাগুলির নিকট স্থাপন করার অত্যুগ্র বাসনাটি জাগরিত হয়েছিল। কিন্তু অপক্ষপাত এবং ধারাবাহিক সমীক্ষায় এই সত্যই প্রতিপন্ন হয় যে (১) গঙ্গারিডি শব্দটি নিতান্তই গঙ্গা অথবা গঙ্গার অথবা গঙ্গাহৃদ ভারতীয় শব্দগুলি থেকে সৃষ্ট বা গঠিত হয়েছিল, মেগাস্থিনিস প্রমুখ গ্রীক বর্ণনাকারীদের দ্বারা, (২) এই শব্দগুলির সঙ্গে বঙ্গ শব্দের কোন যোগ নেই কোনও ভাবে, (৩) তখন অর্থাৎ মৌর্য যুগে গঙ্গা নদীর মূলধারা একটিই ছিল, (৪) গঙ্গানদীর মূল এবং প্রধান ধারাটি রাঢ়দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পূর্বে সাগরে পতিত হয়েছিল—নদীর পশ্চিমে ছিল রাঢ় পূর্বে ছিল বঙ্গ (মধ্য-দক্ষিণ বাংলা) এবং (৫) তখন সাগর সঙ্গম ছিল অনেক উত্তরে।

সুতরাং সেই যুগে সুন্দরবনও ছিল অনেক উত্তরে, যদিও সাগর মধ্যস্থিত কোন কোন দ্বীপে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল অতীতে সময়ে সময়ে, কিন্তু

নিরবচ্ছিন্নভাবে নয়। তাই গ্রীক ও লাতিন লেখকদের বর্ণনায় খৃঃ পূঃ ৪র্থ থেকে খৃষ্টীয় প্রথম/দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত আমরা গঙ্গারিডি এবং গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ীদের[১৩] পরিচয় পাই, বিভিন্ন কৌম, উপজাতি ও জাতি অধ্যুষিত এই নিম্নগাঙ্গেয় ভূখণ্ডে। এই সম্পর্কে এক ঐতিহাসিকের নিম্নে উদ্ধৃত উক্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ—

"মেগাস্থিনিসের ভারতভ্রমণ কালে ব্রহ্মদেশের পশ্চিমে ও গোদাবরীর পূর্বে অবস্থিত সমগ্র দেশকে একমাত্র কলিঙ্গদেশ বলিয়া উল্লেখ করিলেও এই সমগ্র দেশে গঙ্গারাঢ়ীদের অধীনে যে আরও ত্রিশটি রাজ্য ছিল সেকথা লিখিয়া গিয়াছেন। তখন বঙ্গের কোন গৌরব ছিল না। এই জন্য তিনি বঙ্গের কথা আর উল্লেখ করেন নাই।"[১৪]

সত্যান্বেষণ এবং সত্যবাদিতা ঐতিহাসিকের ধর্ম। সত্য উপলব্ধি করেও যেখানে লেখকদের অপক্ষপাত, আবেগহীন এবং যুক্তিনির্ভর অভিমত প্রকাশে অনিচ্ছা পরিলক্ষিত হয়েছে, সেইখানেই ঐতিহাসিক সততার অপমৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু এই অবাস্তব ও অনৃত কথনে, ইতিহাস লোপ পায় না, বা ইতিহাসের কোন ক্ষতি হয় না। তাই যাঁরা সুবর্ণগ্রাম, ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, যশোহর চন্দ্রকেতুগড়, সাগরদ্বীপ, কুমার নদীর মোহানা, কর্ণসুবর্ণ, গৌড় প্রভৃতি স্থানে এই গঙ্গে বন্দর / নগর এবং তদানীন্তন গাঙ্গেয় বাঙ্গালীর (গঙ্গারিডির) রাজ্যের রাজধানীকে স্থাপন করেছেন, তাঁদের সেই ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা বাঙ্গালীর ইতিহাস রচনার পবিত্র সাধনাকে অনেক সময়েই সমৃদ্ধ করে নি। অবশ্য, এই চিহ্নিত করণের দুরূহ প্রয়াসে পণ্ডিতদের মধ্যেও মতান্তর থাকা বিচিত্র নয়।

গঙ্গারিডি থেকে যাঁরা সহজেই 'গঙ্গে'তে পৌঁচেছেন (অর্থাৎ এই 'গঙ্গে'কে মৌর্য যুগেও গঙ্গারিডির রাজধানী বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন), যাঁরা গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ী নামের ঐতিহাসিক ব্যাপ্তি এবং তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হন নি, যাঁরা প্লিনী কর্তৃক উল্লিখিত পার্থালিস নামক তৎকালীন রাজধানীর কথা ভুলেও জিহ্বাগ্রে আনেন নি এবং লিপিবদ্ধও করেন নি, এবং গঙ্গারিডির পরবর্তী রাজধানী গঙ্গের সঙ্গে তাদের প্রথম রাজধানীর (পার্থালিসের) আঞ্চলিক, ভৌগোলিক, ভূতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক যোগসূত্র নিয়ে বিন্দুমাত্র উৎসাহী হন নি, তাঁরা স্বকীয় খেয়াল ও খুশিতে কোন বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের গৌরব প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপিত হলেও, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরবগাথা ও কীর্তি রচনায় তাঁদের অবদান দৃষ্টিভঙ্গীর সংকীর্ণতার দোষে দুষ্ট হয়ে অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে হবে।

'গঙ্গে' নগর/বন্দর, সেই কালে যেখানে সাগর সঙ্গম ছিল, তার কাছাকাছি হওয়াই সম্ভব। গ্রীক ও রোমানদের বিবরণ থেকে লক্ষ্য করা যায় যে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ থেকে খৃষ্টীয় ১ম / ২য় শতাব্দীর মধ্যে নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় গঙ্গার পশ্চিম তীরে মধ্যরাঢ়ে পার্থালিস (portalis), গঙ্গে (Gangai) ও কাটাদপা (katadupa) নামে তিনটি বন্দর ছিল।[১৫] 'ফরাসী পুরাতত্ত্ববিদ সেন্ট মার্টিন বর্তমান বর্ধমান শহরকেই Parthalis বা Portalis স্থির করিয়াছেন'। ("বর্ধমানের ইতিকথা"—প্রাচীন ও আধুনিক—নগেন্দ্রনাথ বসু)।

অবশ্য এই পার্থালিসকে আবার কেউ কেউ আগ্রহের আতিশয্যে পুণ্ড্রবর্ধনের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেছেন, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তৎকালীন গৌড় (গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত) গঙ্গারিডির মধ্যে নিশ্চিতভাবে অন্তর্ভুক্ত হলেও, পুণ্ড্রবর্ধন গঙ্গার তীরে অথবা সাগর সঙ্গমের সমীপবর্তী ছিল কিনা বলা কঠিন।

তবে কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মহাপদ্ম নন্দের রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর, এবং এই পুণ্ড্রনগর তৎকালীন গৌড় নগরী হওয়াও অসম্ভব নয়। সেই হিসেবে ইতিহাসে পুণ্ড্রবর্ধন (বা সমগ্র পুণ্ড্র দেশ) বলে পরিচিত তৎকালীন ভূখণ্ড (গঙ্গার পশ্চিম তীরে এবং পূর্ব তীরে) গঙ্গারিডির রাজ্য-পরিধির মধ্যেই ছিল বলে অনুমান করা যায়, যে কথা আগেই কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে।

গঙ্গে নগরের অবস্থান সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ বর্তমান, যেমন :—(বিধুভূষণ ভট্টাচার্য প্রণীত 'হুগলী এবং হাওড়ার ইতিহাস', থেকে উদ্ধৃত।)

১। কানিংহাম বলেন যশোহর।

২। হিরেণ বলেন কলিকাতার দক্ষিণপূর্বে ৪০ মাইল দূরে ইচ্ছামতী নদীর শাখার উপর ধূলিয়াপুরের নিকট।

৩। উইলফোর্ড বলেন গঙ্গা (পদ্মা) ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে যেখানে হস্তীমল্ল নামে এক নগর অবস্থিত।

৪। টেলর বলেন বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী সুবর্ণ গ্রামের নিকট।

৫। আর কোন কোন পণ্ডিত বলেন কলিকাতার নিকটে অথবা উহার ৩০ মাইল উত্তরে হুগলী নদীর তীরে চুঁচুড়ার কাছে। (Ancient India as described by Ptolemy—J. W. McCrindle.)

৬। Rev. Long—Many years ago Satgaon, the Royal Emporium of Bengal from the time of Pliny down to the arrival of the Portugese in the country, has now scarcely any of its greatnes..

৭। Satgaon Called Tcharitapura in the time of Chinese Piligrims visit and described by Ptolemy as a royal city of immense size. (History of Indian shipping by R. K. Mukherjee.) প্রেমময় দাশগুপ্ত সংকলিত 'হিউয়েন-সাঙের দেখা ভারত'—দ্রষ্টব্য।

৮। Wilford says, it (Satgaon) was a famous place of worship and had formerly the residence of the Kings of the Country. It was city of immense size so as to have swallowed one hundred Villages.

এই বিষয়ে আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে সাগর দ্বীপকে গঙ্গে বন্দর বলে অনুমান করার অনুকূলে বিনয় ঘোষের মন্তব্যগুলি বিশ্লেষণ করতে পারা যায়। তিনি বলেছেন—'টলেমি এই গঙ্গানগরের অক্ষাংশ (Latitude) ও দ্রাঘিমা (Latitude) যে নির্দেশ

দিয়ে গেছেন, তাতে তার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়। মনে হয় বর্তমান গঙ্গাসাগর সঙ্গমের নিকট এই গঙ্গানগর ছিল। চতুর্থ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত যুগের আগেই গঙ্গাসাগর তীর্থের প্রসিদ্ধি ছিল। মহাভারতের (বনপর্বে) তীর্থযাত্রা বিবরণে গঙ্গাসাগরকে তীর্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।...'১৬

কিন্তু মহাভারত যুগের গঙ্গার সাগরসঙ্গম কি বর্তমান সাগরসঙ্গমের সঙ্গে অভিন্ন ? কোনভাবেই কি প্রথমটি দ্বিতীয়টির সঙ্গে তুলনীয়! মহাভারত যুগে সাগরসঙ্গম ছিল গৌড়ের কাছাকাছি অথবা অনেক উপরে। তাই মনে হয় দু হাজার বছর আগেও বর্তমান গঙ্গাসাগরের কাছে সাগরসঙ্গম ছিল না, ছিল অনেক উত্তরে। (টলেমি যাইই বলুন) গঙ্গার সাগরসঙ্গম বলতে প্রকৃতপক্ষে পবিত্র জাহ্নবী-গঙ্গা-ভাগীরথীর সাগরের সঙ্গে মিলনের বিন্দুটিকেই বুঝিয়েছে।

তাই স্বর্গীয় বিনয় ঘোষ মহাশয়েরও সংশয় হয়েছিল পরবর্তী সময়ে, ঠিক যে সন্দেহে আচ্ছন্ন হয়েছিল ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের মন এই সম্পর্কে, যা আগেই বলা হয়েছে। বিনয় ঘোষও বোধহয় নিজের আগের অভিমত সংশোধন করতে পরে মন্তব্য করেছিলেন অন্যভাবে (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি-৩য় খণ্ড), যার প্রতি ইতিপূর্বেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

গঙ্গা (ভাগীরথী) যমুনা ও সরস্বতী—এই তিনটি প্রধান নদী ত্রিবেণী (মুক্তবেণী), সঙ্গমে যুক্ত হয়ে তিন দিকে প্রবাহিত হয়েছে। সরস্বতীই (যার উল্লেখ আমরা ঋগ্বেদ থেকে বার বার পাই) দক্ষিণপশ্চিম বঙ্গে গঙ্গার প্রধান শাখা ছিল। ভাগীরথীর জলধারা দক্ষিণাভিমুখী হয়েছিল হুগলীর মধ্য দিয়ে বর্তমান কলকাতার দিকে। তখন কোথায় কলকাতা! মূল ভাগীরথীর শেষ ভাগ এই প্রবাহটিই আদি-গঙ্গা নামে পরিচিত হয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় বর্তমান খিদিরপুরের কাছে বাঁয়ে বেঁকে সাগর মোহনায় মিশেছিল। বোধহয় তার আগেও গঙ্গার অন্যতম শাখা (সরস্বতী) ত্রিবেণী থেকে দক্ষিণপশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে বর্তমান সাঁকরাইলের কাছে ভাগীরথীর সঙ্গে মিশে সোজা সাগর সঙ্গমে গিয়েছিল।

যাই হোক, আদিগঙ্গা মজে গেলে, তখন ইংরেজের সহযোগিতায় এবং নবাব আলিবর্দীর প্রচেষ্টায় কলিকাতায় বড় জাহাজ আনার উদ্দেশ্যে গঙ্গার নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ভাগীরথীর অন্য মুখটিকে সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত করেই যে খাল কাটা হয়েছিল, তাই আজ হুগলী নদীর নাম ধারণ করেছে এবং আগেকার কাটা বা কাটিগঙ্গা নাম বর্জন করেছে।

সরস্বতী পশ্চিমবাহিনী হয়ে প্রথমে তাম্রলিপ্ত এবং পরবর্তীকালে সপ্তগ্রামকে সঞ্জীবিত ও সমৃদ্ধ করেছিল, এবং উভয় বন্দর থেকেই সমুদ্র ছিল অনতিদূরে। যমুনার পূর্ব-দক্ষিণবাহী স্রোত বর্তমান নদীয়া, চব্বিশ পরগণা ও খুলনার অন্তভাগে অপসৃয়মান সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। সুতরাং এই ত্রিবেণী সঙ্গমের অঞ্চলবর্তী এবং সন্নিহিত নগর / বন্দরসমূহ গঙ্গারিডিদের শক্তি, সম্পদ ও সমৃদ্ধির বিবেচনা ও বিশ্লেষণে এবং তাদের আদি নিবাস নির্ধারণে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে।

ত্রিবেণীর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোথায়ও সংশয় নেই। ত্রিবেণীর সন্নিকটে পাণ্ডুয়া, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং তাৎপর্য সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে। গঙ্গে বন্দরের চিহ্নিতকরণে—সেই স্থানের তিনটি বৈশিষ্ট্য, যথা (ক) বৃহৎ নগরী (খ) বিখ্যাত বন্দর এবং (গ) গঙ্গারিডি রাজাদের নিবাস তথা রাজধানী প্রভৃতি বিষয়গুলি বিবেচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে, অনেক ঐতিহাসিক এবং পণ্ডিত সপ্তগ্রামকেই সেই অবলুপ্ত নগর / বন্দর বলে অনুমান করেছেন। এই সম্পর্কে 'বঙ্গভূমিকায়' (ডঃ সুকুমার সেন) সন্নিবিষ্ট মন্তব্যগুলি দ্রষ্টব্য।

এই প্রসঙ্গে অন্য আর একটি উক্তিও স্মরণীয়—'প্রাচীন রোমকেরা সপ্তগ্রামকে গ্যাঞ্জেস রেজিয়া বলতেন। তাঁহারা এখান হইতে কার্পাসসূত্রে নির্মিত সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং নানা প্রকার ছিট ও কোষেয় বাস ইউরোপের বাজারে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিতেন।'[১৭]

গঙ্গা (ভাগীরথী নদী) এক সময়ে সরস্বতীর খাত ধরেও প্রবলভাবে প্রবাহিত হয়েছে (গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এক সময়ে খ্যাতির তুঙ্গে উঠেও, সরস্বতীর সৈকতে সপ্তগ্রাম বন্দরকে নদীতে স্রোতের অভাবে বিলুপ্তির দুঃখজনক পথের পথিক হতে হয়েছে, বাধ্য হয়ে। নদীর স্রোত তখন দক্ষিণদিকে প্রবলতর হয় এবং ষোড়শ/সপ্তদশ শতাব্দীতেই ক্রমশঃ হুগলী বন্দরের উন্নতি ঘটে। কিন্তু বোধ হয় গঙ্গার তীরবর্তী এবং সপ্তগ্রামের কাছাকাছি এই সম্পূর্ণ অঞ্চলটি যথা হুগলী এবং গাংপুর, পাণ্ডুয়া, মগরা প্রভৃতি একই উপকূল রেখায় স্থানীয় ব্যবসায় এবং বাণিজ্যের জন্য কর্মমুখর ছিলই। এই হুগলীকে (বন্দরকে) তার প্রাচীন অবস্থায় কেউ কেউ গঙ্গে বন্দর বলে অনুমান করেছেন। টলেমি 'গঙ্গে' এবং তামলিটেস উভয় স্থানেরই উল্লেখ করেছিলেন।

সুতরাং এই সব ইতিহাসবেত্তাদের মতে তাম্রলিপ্ত গঙ্গে থেকে স্বতন্ত্র। এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। তবে প্লিনীর বর্ণনা অনুযায়ী গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ীদের রাজধানী পার্থালিসকে বর্ধমান, পূর্বস্থলী এবং আরও দক্ষিণে পাণ্ডুয়া প্রভৃতি গাঙ্গেয় উপত্যকার নদীর তীরবর্তী স্থানগুলির মধ্যে স্থাপন করলে, সপ্তগ্রাম বা হুগলীকে 'গঙ্গে' বন্দরের সঙ্গে অভিন্ন না মনে করার কোন কারণ নেই।

টলেমি বর্ণিত গঙ্গার পাঁচটি মুখের প্রথম ও দ্বিতীয় মুখই সরস্বতী এবং ভাগীরথীর (গঙ্গার) সাগরের সঙ্গম এবং এই দুইটি মুখের সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে। এই দুটি মুখের মধ্যেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতগুলি নগরের অস্তিত্ব টলেমির বিবরণ থেকে পাওয়া যায়।[১৮] সুতরাং গঙ্গা নামের সঙ্গে সংপৃক্ত কোন নগর অথবা বন্দর এই সরস্বতী অথবা ভাগীরথী (গঙ্গা) নদীর উপরই অবস্থিত ছিল, মনে করা অন্যায় নয়।

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বিখ্যাত বৈদেশিক পর্যটক ইবন বতুতা বাংলাদেশ ভ্রমণের সময়ে সপ্তগ্রাম বন্দরে অবতরণ করেছিলেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে যেখানে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের সমাবেশ হয়, সাতগাঁ তার কাছেই অবস্থিত। সাতগাঁ তখন সমুদ্রকূল থেকে বেশি দূরে ছিল না এবং সমুদ্রগামী বড় বড় বাণিজ্য পোত তখন সাঁতগা পর্যন্ত সহজেই যাতায়াত করতো (পশ্চিমবঙ্গের

সংস্কৃতি ২য় খণ্ড—বিনয় ঘোষ)। এই বিষয়টির বিশদ বিবরণের জন্য History of Bengal (Dacca University Publicatiob) Part II ১৮০ পৃঃ (Bengal as seen by Ibn Batuta) দ্রষ্টব্য।

বিখ্যাত আফ্রিকান পরিব্রাজক ইবন বতুতা তাঁর ভারত ভ্রমণের (খৃষ্টীয় ১৩৩৩-১৩৪৭) বৃত্তান্তে বঙ্গদেশের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন। তখন দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে সাতগাঁ বা সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির যুগ। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন যে গঙ্গা এবং যমুনার সঙ্গমস্থলে যেখানে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের সমাবেশ হয় (অর্থাৎ ত্রিবেণী), সাতগাঁ তার কাছেই অবস্থিত। সন্দেহ নেই, তিনি সাতগাঁ বা সপ্তগ্রাম বন্দরেই এসে নেমেছিলেন। সুতরাং তাঁর বর্ণিত সুদকাওয়ান বা সাতিগা কখনও চাটিগাঁ বা চট্টগ্রাম হতে পারে না।[১৯]

'পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সীর' নাবিক গ্রন্থকারও গঙ্গা নামে একটি নদীর উপর 'গঙ্গা' বা 'গঙ্গে' নামে একটি নগর ও বন্দরের কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেই অথবা অন্য অজ্ঞাত বিদেশী নাবিকের আকস্মিক দর্শনেও তাঁর মনের মধ্যে অজানা দেশ ও তার উপকূলভূমির বিশেষ বিন্দুতে বিশেষ বন্দরের নামে যে ভ্রান্তি হয় নি, সেই ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন পরবর্তীকালের এবং আধুনিক যুগের দেশী ও বিদেশী ভারততত্ত্ববিদ গবেষকেরা—অনেক সময়ে জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে।

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে বিনয় ঘোষ 'গঙ্গে' বা 'গঙ্গা' বন্দরের স্থান নির্ণয়ে সাগর দ্বীপের স্বপক্ষে প্রথমে অভিমত প্রকাশ করলেও (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—১ম খণ্ড), পরে এই বিষয়ে দ্বিধা এবং সংশয়ে জড়িত হয়ে, শেষ পর্যন্ত তাঁর ধারণাটি পরিবর্তন করেছিলেন, অথবা যে কোন কারণেই হোক করতে, বাধ্য হয়েছিলেন (পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি—৩য় খণ্ড—সাগরদ্বীপ দ্রষ্টব্য)। সাগর দ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস থাকার সম্ভাবনা প্রবল হলেও, হয়তো কোন ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, অথবা জাতিগত কারণের জন্য তাঁর আগের মতটি তিনি সংশোধন করাই শ্রেয় বিবেচনা করেছিলেন।

টলেমির মানচিত্রে বঙ্গদেশের তৎকালীন ভৌগোলিক চিত্রটি ভূতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে কতখানি বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রতিফলিত হয়েছে—এই বিষয়টি সম্বন্ধে কিছু আলোচনার আগে, 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থকারের প্রতিবেদনের আলোকে প্রকৃত অবস্থাটি নিরূপণ করায় সচেষ্ট হওয়া উচিত। ভারতের উপকূল বাণিজ্যে নিযুক্ত অর্ণব পোতগুলির বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় এই গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদের একস্থানে পাওয়া যায় "··· but those which make the voyages to the chryse and to the Ganges are called Colandia, and are very large ···· " অর্থাৎ এর মূল ভাবার্থ হচ্ছে—সুবর্ণভূমি (বর্তমান ব্রহ্মদেশ) এবং গঙ্গারাষ্ট্রে বা দেশে যে পোতগুলি যায় সেগুলি বেশ বৃহদাকার এবং সেগুলিকে কোলান্দিয়া বলে।

সুতরাং ভালোভাবেই এই থেকে উপলব্ধি করতে পারা যায় যে 'গঙ্গা' বলতে এখানে একটি দেশ অথবা সেই দেশের বিশেষ অঞ্চলকে বুঝিয়েছে ; সঙ্গে সঙ্গে একটি নদী

বিশেষকেও বুঝিয়েছে এবং ঐ দেশ অথবা ঐ অঞ্চলের ঐ নদীর উপর একই নামের একটি বন্দরকেও বুঝিয়েছে। গ্রীক ও লাতিন লেখকদের বর্ণনায় যে দেশকে গঙ্গারিডি বলে জানা যায়, এ সেই একই দেশ। মেগাস্থিনিস প্রমুখ গ্রীক বিবরণকারীরা সেই সময়ে গঙ্গারিডি বা গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ীদের রাজধানীর একটি অন্য নাম উল্লেখ করেছেন। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে গ্রীক বর্ণিত সেই রাজধানী নগরীটি নিঃসন্দেহে একটি বন্দরও ছিল। সে নগরকে 'গঙ্গে' বলা হয় নি।

পুনরায় অজ্ঞাতনামা নাবিক গ্রন্থকারের বিবরণে ফিরে এলে দেখা যায় যে ইংরেজি অনুবাদের এক স্থানে আছে—"On its bank is a market town which has the same name as the river Ganges," অর্থাৎ এর তীরে আছে একটি হাটপত্তন যার নাম নদীর নামের সঙ্গে অভিন্ন। এর থেকে 'গঙ্গে' বন্দরকে কি বর্তমান সাগর মোহনায় অবস্থিত সাগর দ্বীপ অথবা চন্দ্রকেতু গড় বলে কল্পনা করা যায়? না। এই (গঙ্গে) বন্দর আদি ও অকৃত্রিম গঙ্গা নামক রাজ্যে (গঙ্গারিডি) গাঙ্গেয় উপত্যকাভূমিতে ভাগীরথী অথবা সরস্বতী খাতে প্রবাহিত গঙ্গা নদীর উপর (সমুদ্র থেকে অল্প দূরে), এবং এই কারণে বিদেশী কর্তৃক 'গঙ্গে' বা 'গঙ্গা' নামে অভিহিত।

কারও মতে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণে "বঙ্গ" এবং "গঙ্গে" একার্থক।[২৩] এর থেকে অনুমান করা দুঃসাধ্য যে গঙ্গারিডি দেশ বঙ্গ-নামধারী ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিনা। এই অবস্থানের কল্পনা গ্রীক এবং রোমান লেখকদের বিবরণের পরিপন্থী এবং টলেমির বিবরণে উল্লিখিত গঙ্গারিডির সীমা বর্ণনার বিপরীত। খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে গ্রীক বর্ণিত গঙ্গারিডি ছিল প্রাসীর পূর্বদিকে অর্থাৎ প্রায় সমগ্র গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে, গঙ্গার দুই তীর আলিঙ্গন করে। খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে চৈনিক সূত্রে সেই রাজ্য বঙ্গের সঙ্গে সমার্থক অর্থাৎ সমবঙ্গেও নয়, দক্ষিণপূর্ব বঙ্গে। এবং খৃষ্টীয় প্রথম / দ্বিতীয় শতাব্দীতে যথাক্রমে পেরিপ্লাস গ্রন্থকারের এবং টলেমির সাক্ষ্যে সেই রাজ্য গঙ্গা নদীর মোহনার নিকটবর্তী ভূখণ্ডে!

এই তিন পর্যায়ের বর্ণনার মধ্যে অসঙ্গতি যথেষ্ট। প্রধান অসঙ্গতি এই 'বঙ্গ'কে নিয়ে, যদি না এই 'বঙ্গ' শব্দের তাৎপর্য অন্য রকম হয়, অর্থাৎ সম্পূর্ণ গাঙ্গেয় বঙ্গভূমি বোঝায়। প্রাচীন গাঙ্গেয় বন্দর তাম্রলিপ্তকে বাদ দিয়ে কোন ভূখণ্ডই গঙ্গারিডি বলে বিবেচিত হতে পারে না, অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই!

তাম্রলিপ্ত সমুদ্রের খাড়িতে অবস্থিত ছিল, এবং তার দক্ষিণপ্রান্তে ছিল কয়েকটি দ্বীপের সমষ্টি। সেই দ্বীপ বর্তমান সাগর মোহনায় অবস্থিত এক বৃহত্তর দ্বীপের অংশ বিশেষ, এবং প্লিনী কর্তৃক মদকলিঙ্গীদের দ্বারা অধ্যুষিত বলে বর্ণিত। সেই বিশাল দ্বীপ বহুদূর বিস্তৃত ছিল এবং এই দ্বীপেই এক সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজত্ব করতেন। এই দ্বীপ পরবর্তী যুগে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল।

গঙ্গা নদীরই বিপরীত অর্থাৎ পূর্বদিকে (নাবিকের ডান দিকে) একটি দ্বীপের

কথা বিবৃত হয়েছে, অজ্ঞাতনামা নাবিকের ভাষ্যে। নাবিক এই দ্বীপকে Chryse বলে বিভ্রান্ত হলেও, এই দ্বীপটি হয়তো আসলে সেই দ্বীপ যা গঙ্গারিডির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং পরে অগাধ বারিধির নীলাম্বুতে নিমজ্জিত হয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে ছিল। এই বিরাট দ্বীপ যা তৎকালীন গঙ্গাসাগর বলে কল্পনা করা হয়েছে তার নাম ছিল শাকদ্বীপ যেখানে বাঙ্গালী কৈবর্তদের আধিপত্য ছিল। "ইহার (তমলুকের) দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে ব্রহ্মদেশের পশ্চিম ও বর্তমান আন্দামান দ্বীপের উত্তরে কোকো ও প্রোফিস দ্বীপসহ বর্তমান চব্বিশ পরগণা উৎখাত হইয়া গিয়াছে।"[২১]

পৌরাণিক ভারতের নাম ছিল জম্বুদ্বীপ। এই জম্বু দ্বীপের দক্ষিণ পূর্বে বঙ্গোপসাগরের ব্যবধান্তে মালয়, শ্যাম, ইন্দোচীন, দক্ষিণ চীন প্রভৃতির সমন্বয়ে এক বিরাট দ্বীপের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে 'The Geography of Puranas' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৪০ দ্রষ্টব্য)।

এই দেশকেই বোধ হয় অতি প্রাচীনকালে জলপ্লাবমান নৌপ্লাবোত্তর দেশ বলতো! দ্বীপসহ এই ভূখণ্ডটি তথাকথিত গঙ্গারাষ্ট্রের দক্ষিণতম অংশ বলে প্রতীয়মান হয়, এবং টলেমি একেই সাগর মোহনার গঙ্গারিডি রাজ্য বলে বর্ণনা করেছিলেন এবং তাম্রলিপ্ত বা উত্তরে সরস্বতী—দামোদরের গাঙ্গেয় অঞ্চলে কোন স্থানকে "গঙ্গে" বলে অভিহিত করেছিলেন।

সুতরাং এই সব দিক থেকে বিবেচনা করে লক্ষ্য করা যায় যে অখ্যাতনামা নাবিক কর্তৃক বর্ণিত 'গঙ্গে' বন্দর তাম্রলিপ্ত অথবা গঙ্গা ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে সাগর উপকূলের নিকট কোন স্থান হওয়াই সম্ভব। তাম্রলিপ্তের পক্ষে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের শক্তিশালী সমর্থন বর্তমান।[২২] সপ্তগ্রাম এবং বিশেষ করে ত্রিবেণীর প্রাচীনত্বের প্রমাণের অভাব নেই।[২৩] তথাপি এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে অধিকতর গবেষণা ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

'পেরিপ্লাস' গ্রন্থকার তাম্রলিপ্তের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেন নি। সুতরাং এই বন্দর গঙ্গারিডি রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু তাম্রলিপ্ত হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নয়। এই স্থানে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

"হাজার হাজার বৎসর পূর্বে তাম্রলিপ্তও খুব সম্ভব একটি দ্বীপরূপে বঙ্গোপসাগরে জেগে উঠেছিল (Vide J. R. A. S. B. Vol V P. 135)। তারপর মূল ভূখণ্ডের সাথে কালক্রমে মিলিত হয়েছে।. সেই সুপ্রাচীনকালে তাম্রলিপ্তের সন্নিকটেই গঙ্গাসাগর তীর্থ প্রতিষ্ঠিত ছিল, কারণ, গঙ্গা এবং সমুদ্রের সঙ্গমস্থলেই নির্দিষ্ট হয়েছিল সাগরতীর্থ।"[২৪]

এই বর্ণনার সঙ্গে কয়েকজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিকের তাম্রলিপ্তের বর্ণনা মিলে যায়। মৌর্যযুগের সূচনায় কালিঙ্গেয়ীর (গঙ্গারিডি-কালিঙ্গেয়ী) রাজধানী ছিল পার্থালিস (আধুনিক বর্ধমান বা পূর্বস্থলী)। পরে, অর্থাৎ অশোকের সময়ে বা তারও কিছু আগে রাজধানী তাম্রলিপ্ততে হওয়া অসম্ভব ছিল না। অবশ্য অশোকের

কোন শিলালিপি বঙ্গদেশে পাওয়া যায় নি, যদিও পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট এবং তাম্রলিপ্তে অশোকের নির্মিত বৌদ্ধস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছিল।[২৫]

সুতরাং অনেক ঐতিহাসিক এবং পণ্ডিত স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করেছিলেন যে সমগ্র বঙ্গদেশ অথবা বঙ্গদেশের কোন কোন অংশ মৌর্যসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বিখ্যাত বিদেশী ভারততত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকের মন্তব্য থেকে মনে হয় যে টলেমি এবং পেরিপ্লাস গ্রন্থকার কর্তৃক বর্ণিত গঙ্গে নগরী তাম্রলিপ্ত ব্যতীত অন্য কিছু নয়। উক্তিটি উদ্ধৃত হচ্ছে :—

"Eastwards the Empire Comprised the whole of Bengal as far as the mouth of the Ganges where Tamralipti, the modern Tamluk was the Principal Port."[২৬]

পরিশেষে টলেমির ভৌগোলিক বৃত্তান্তে এই গঙ্গার মোহনা এবং গঙ্গে বন্দর সম্বন্ধে যে সব উক্তি আছে, সেগুলির ঐতিহাসিক মূল্যায়ন সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত আবশ্যক। টলেমি তাঁর বিবরণে বলেছিলেন যে গঙ্গার মোহনা জুড়েই গঙ্গারিডিদের বাস এবং তাঁদের রাজা গঙ্গে নামক নগর / বন্দরে বাস করেন। টলেমি তাঁর ইণ্ডিয়া ইণ্ট্রা গাঙ্গেম অর্থাৎ আন্তর্গাঙ্গেয় ভারত নামক মানচিত্রে, এই গঙ্গে বন্দরের উল্লেখ করেছেন। বঙ্গদেশের দক্ষিণপশ্চিম কোণেই এর অবস্থিতি নির্দেশ করেছিলেন তিনি।

আর সেই যুগের অন্য কোন বৈদেশিক বর্ণনাকারী যা করেন নি অথবা করতে পারেন নি, টলেমি গঙ্গার পাঁচটি মোহনা মুখ দেখিয়েছিলেন (পশ্চিমে কেম্বাইসন, পরে মেগা, মাঝখানে কাম্বেরিখন, পরেরটি সিউদোস্তমন এবং শেষে বা পূর্বের মুখ এ্যান্টিবোল)। কোন কোন ঐতিহাসিক এই পাঁচটি প্রধান মুখের বিশ্লেষণ করে সনাক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। টলেমির গঙ্গার পাঁচটি মুখের বর্ণনা যেমনই কাল্পনিক এই মুখগুলিকে সনাক্তকরণের প্রচেষ্টা তেমনই খেয়ালখুশী পূর্ণ এবং উদ্দেশ্যমূলক। উদাহরণস্বরূপ, ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন যে টলেমি এই কুমার নদীর মোহনায় (কাম্বেরিখন) 'গঙ্গে' বন্দরের অবস্থান নির্দেশ করেছিলেন!

টলেমির মানচিত্রটি লক্ষ্য করলে মনে হবে যে তিনি শুধু উপবঙ্গ নয়, সমগ্র বঙ্গদেশের (পশ্চিমবঙ্গ সহ) নিম্নভাগকেই গঙ্গারিডি বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু গঙ্গারিডি যদি শুধুমাত্র দক্ষিণবঙ্গেই সীমাবদ্ধ থাকতো, তাহলে মেগাস্থিনিস প্রমুখ গ্রীক ও পরবর্তী গ্রীক ও লাতিন লেখকেরা গঙ্গারিডিকে প্রাসীর পূর্বদিকে অবস্থিত,[২৭] বলতেন না। কারণ, দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমে ছিল উৎকল (ওড্র) ও কলিঙ্গ, প্রাসী নয়। সুতরাং গঙ্গারিডি বলতে তাঁরা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ (সাগর মোহনা পর্যন্ত) এবং সম্ভবতঃ পুণ্ড্র এবং উপবঙ্গসহ বঙ্গের কোন কোন অংশকে বুঝিয়েছিলেন। '......their territory could scarecly have been restricted to the marshy jungles at the mouth of the river now known as the Sunderbans but must have comprised a considerable portion of the Province of Bengal. This is the view taken by St. Martin

(Ancient India as described by Ptolemy—J. W. McCrindle P. 174)

একাদশ শতাব্দীর আগে গঙ্গার পূর্বমুখী প্রবাহটির কোন হদিশই পাওয়া যায় না। (বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়)। সেই কারণে টলেমির গঙ্গার পাঁচটি মোহনার বর্ণনা ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মনে যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। যা আগেই বলা হয়েছে, অনেক ঐতিহাসিক. পুরাতত্ত্ববিদ, ও প্রত্নতাত্ত্বিক টলেমির বর্ণনার রূপরেখার সঙ্গে কল্পনার রং দিয়ে, গঙ্গার মোহনাকে সরস্বতী এবং ভাগীরথীর সাগরসঙ্গম থেকে আরম্ভ করে সুদূর বঙ্গের (পূর্ববঙ্গের !) দক্ষিণে নিয়ে গেছেন। অথচ তখন ভাগীরথীই গঙ্গার প্রধান খাত ছিল এবং তখনও হয়তো পদ্মার স্বতন্ত্র স্রোত প্রবাহিত হয় নি !

টলেমি নিজে নিম্ন গঙ্গার উপত্যকায় গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে স্থানগুলি পরিদর্শনও করেন নি। এছাড়া টলেমির ভৌগোলিক বৃত্তান্তের দোষগুলির কথা আগেই বিবৃত হয়েছে। (২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

গঙ্গার পাঁচটি মোহনাবিশিষ্ট টলেমির বহির্গাঙ্গেয় (without the Ganges) মানচিত্রটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে দক্ষিণ বঙ্গভূমির ত্রিভুজাকৃতি ভূভাগটি বঙ্গীয় বদ্বীপ (গঙ্গা এবং পদ্মার মধ্যবর্তী ভূভাগ), কখনই নয়। তার কারণ, উক্ত ত্রিভুজের শীর্ষে Talarga নামক স্থানটি 'Aganagora' বা অগ্রদ্বীপ বা কাটোয়ার ঠিক নীচে। এই 'Talarga' হুগলী জিলার ত্রিবেণী হওয়াই সম্ভব (Vide Ancient India as described by Ptolemy—J. W. McCrindle)। সুতরাং টলেমির মানচিত্রের চতুর্থ মুখ ও পঞ্চম মুখ ঢাকার গঙ্গার মুখ অথবা মেঘনার মুখ হওয়া নিছক কল্পনা প্রসূত বলেই মনে হয়।

নির্দেশিকা

১। Classical Accounts of India (Geography of Strabo) P. 281. —Dr. R. C. Majundar।
২। Classical Accounts of India (Periplus Maris Erythraei) P. 308 —Dr. R. C. Majumdar।
৩। বাংলার ইতিহাস — রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪। গঙ্গারিডি—ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ — নরোত্তম হালদার।
৫। পালপূর্ব যুগের বংশানুচরিত (নগরাদি) — ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার।
৬। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (তৃতীয় খণ্ড) —বিনয় ঘোষ।
৭। পালপূর্ব যুগের বংশানুচরিত (পৃঃ ৫৩) —ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার।

৮। History of Bengal, Part II (Dacca University Publication) P. 100.

৯। Classical Accounts of India (Ptolemy) P. 375 —Dr. R. C. Majumdar।

১০। বঙ্গভূমিকা (প্রথম চার খৃষ্ট পর শতাব্দী) — ডঃ সুকুমার সেন।

১১। Classical Accounts of India (Periplus Maris Erythraei) P. 308 Dr. R. C. Majumdar।

১২। গঙ্গারিডি—ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ —শ্রীনরোত্তম হালদার।

১৩। Classical Accounts of India (Pliny) —Dr. R. C. Majumdar।

১৪। বাঙলা ও বাঙালীর ইতিহাস —ধনঞ্জয় দাশমজুমদার।

১৫। হাওড়া ও হুগলীর ইতিহাস —বিধুভূষণ ভট্টাচার্য।

১৬। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (বাঙলার প্রাচীন জনপদ) ১ম খণ্ড — বিনয় ঘোষ।

১৭। হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ় —অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

১৮। 'One of the two Towns which Ptolemy has placed in the land of the Gangaridai is Palaura, situated between the first and the second mouth of the Ganges Vis Kambyson and Mega' "Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal (Pre-Muhammedan epoch)" —Benoy Chandra Sen।

১৯। Indological studies (Part III) P. 66 —Dr. B. C. Law। Ibn Batuta's accounts of Bengal—Translated by —Dr. Harinath De।

২০। Historical Geography of Ancient and Medieval Bengal —Dr. Amitabha Bhattacharja।

২১। বাঙলা ও বাঙালীর ইতিহাস —ধনঞ্জয় দাশমজুমদার।

২২। প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা — পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত।

২৩। হুগলী জেলার ইতিহাস —সুধীরকুমার মিত্র বিদ্যাবিনোদ।

২৪। বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস —যুধিষ্ঠির জানা।

২৫। বিদেশীর চোখে ভারত (হিউ-এন-সাঙ) —সংকলন, প্রেমময় দাশগুপ্ত।

২৬। The Early History of India (Asoka Maurya) —Vincent A. Smith।

২৭। Classical Accounts of India (Pliny) P. 341 Dr. R. C. Majumdar।

গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী

ঋগ্বেদে গঙ্গার উৎস সম্বন্ধে কোথায়ও কিছু লেখা নেই।[১] ঋগ্বেদের কাল থেকে আর্য সভ্যতা ক্রমশঃ পূর্বদিকে বিস্তৃত হতে থাকে। সিন্ধুনদীর অববাহিকাই ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যগোষ্ঠীর এদেশে সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভ্যুদয়ের প্রাথমিক ক্ষেত্র।

সেই কারণে, ঋগ্বেদে আমরা গঙ্গানদীর উল্লেখ পাই না, বললেই হয়। সেই যুগের প্রধান নদী, সিন্ধু ও সরস্বতী। সরস্বতী প্রথমে পশ্চিমগামী। রাজপুতানার অর্বুদ পর্বতে তার উৎপত্তি। দ্বারকার দক্ষিণে প্রভাস তীর্থের নিকট আরব সাগরে তার সমুদ্র সঙ্গম। বেদে এই সাগর সঙ্গমের উল্লেখ আছে। তখন সরস্বতীর মতো বেগবতী প্রকাণ্ড নদী সমগ্র ভারতে আর ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে সরস্বতী পূর্বগামী এবং তারপরে বিনসনা (বর্তমান উদয়পুর, মেবাড় ও রাজপুতানার পশ্চিম প্রান্তভাগের মরুপ্রদেশ) নামক স্থানে তার অবলুপ্তি।[২]

বর্তমানে রাজপুতানার থর মরুভূমি সরস্বতীর সেই শুষ্ক নদীগর্ভ। সাম্প্রতিক-কালে রাজপুতানার মরুভূমি অঞ্চলে ভূগর্ভে জল আবিষ্কারের ফলে কৃষির জন্য সেচ ব্যবস্থা প্রভৃতির উদ্যোগ, একদা বিপুলকায়া, অধুনা বিলুপ্ত প্রাচীন সরস্বতী নদীর কথাই স্মরণ করায়।

আর্যেরা সিন্ধুনদ পার হয়ে গাঙ্গেয় ভূমিতে আসার আগে থেকেই, আর্যদের ইতিহাসের সূচনা। এই ইতিহাসের কিছু আমরা ঋগ্বেদ থেকে পাই। সেই ইতিহাস অনুসারে, আর্যেরা পাঞ্জাবের পূর্বভাগে প্রবাহিত সরস্বতীর দুই কূল অধিকার করে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। আর্য ঋষিরাও সেখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন, এবং অনেক রাজাও এই নদীর তীরে বাস করেছিলেন। এই সরস্বতী সিন্ধু নদেরই এক শাখা ছিল। 'মিলিন্দ পঞ্‌হো' গ্রন্থে সরস্তীকে হিমালয় থেকে নিঃসৃত বলা হয়েছে।

সরস্বতী নদী সম্বন্ধে, বৈদিক আর্যদের দৌর্বল্য ও পক্ষপাতিত্বের কারণ নির্ণয়ে বলা হয়েছে তাঁরা ভারতের বাইরে এক নদীর তীরে বাস করেছিলেন। সেই নদীর উভয় উপকূলই ছিল উর্বর এবং নদীর জল ছিল স্বচ্ছ ও সুপেয়। এই নদীর চারদিকে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে সপ্তসিন্ধু (হপ্ত হিন্দু) প্রবাহিত হতো। এই সপ্তসিন্ধু বিধৌত ভূমিতে, সরস্তীর তীরেই ইরানী ও বৈদিক আর্যদের আবাসভূমি ছিল, এবং এইখানেই ইরানী এবং বৈদিক আর্যদের মনান্তর ও শেষ পর্যন্ত অস্ত্র-সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এর পরেই, বৈদিক আর্যেরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি যে কোন কারণেই হোক পূর্ব নিবাস পরিত্যাগ করে ভারতে প্রবেশ করেন। তাঁরা ক্রমে পঞ্চনদের অববাহিকায় পাঁচটি নদীর সাক্ষাৎ পান (ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, বিপাশা ও শতদ্রু)।

কিন্তু ভারতের বাহিরের সপ্ত সিন্ধুর স্মৃতি তাঁদের মর্মে গাঁথা ছিল। আরও দুটি নদী আবিষ্কারের পরে একটির নাম রাখলেন সিন্ধু এবং অপরটির নাম রাখলেন

সরস্বতী। সুখময় পূর্বস্মৃতিকে জাগরূক রাখতে তাঁরা নতুন নামাঙ্কিত সরস্বতী নদীর উভয় কূলে উপনিবেশ স্থাপন করে, ভারতে নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবর্তন করলেন।[৩] পরবর্তী সময়ে গঙ্গানদীতে যে মহাত্ম্য আরোপ করা হয়েছে সুপ্রাচীন কালে, তার অপেক্ষা বেশী মাহাত্ম্য ও গৌরব সরস্বতীর ছিল তৎকালীন আর্যদের চোখে।

পঞ্চনদ দেশে সরস্বতী (নদীর) অস্তিত্বের কথা আমরা অন্য সূত্রেও জানতে পারি। মহাভারতে আমরা এই সরস্বতী নদী তীরস্থ কাম্যকবনের বিবরণ পাই। সরস্বতী প্রাচীনকালে এক শ্রেষ্ঠ তীর্থ ছিল এবং এই নদীর তীরকে ব্রহ্মা এবং দেবতারা যজ্ঞভূমিরূপে চিহ্নিত করেছিলেন। বস্তুতঃ মহাভারতে বলরামের তীর্থ যাত্রার বিবরণ (শল্যপর্ব) থেকেই সরস্বতীর লুপ্ত হওয়ার কাহিনী জানা যায়।

পূর্বোক্ত পঞ্চনদদেশের সরস্বতী নদীই প্রয়াগে এসে গঙ্গা এবং যমুনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু প্রয়াগ সঙ্গমে সরস্বতী অদৃশ্য—হয়তো গুপ্ত সরস্বতী উত্তর কুরু থেকে প্রয়াগ পর্যন্ত গঙ্গার স্রোতধারার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণরসে ভরপুর হয়েছে। কিন্তু তারপরেই বা সরস্বতী কোথায়? কেউ কেউ মনে করেন, প্রাচীন পশ্চিম-গামিনী সরস্বতী নদীর একটি ধারা পূর্বগামিনী হয়েছিল এবং এরই নাম গঙ্গা (বিশাল বাঙ্গালী—রাধাকমল মুখোপাধ্যায়)।

অনেকে ঘগ্গরকে প্রাচীন সরস্বতী বলে বিশ্বাস করেন। পাতিয়ালার মধ্য দিয়ে পাঞ্জাবের শিবালিক পর্বতশ্রেণীর মধ্যে প্রক্ষতরুর পাদদেশে অবস্থিত এক প্রস্রবণ থেকে সরস্বতীর উৎপত্তি। এই প্রস্রবণের নাম প্রক্ষ প্রস্রবণ। ঋগ্বেদে এই স্থানকে তীর্থস্থান বলা হয়েছে।

ঋগ্বেদ অনুসারে সিন্ধু, সরস্বতী ও সরযূর উপত্যকাতেই ছিল আর্যদের অবস্থান। এই সরস্বতী প্রাচীনতর সরস্বতী নদী মনে হলেও, বোধহয় পঞ্চনদের সরস্বতী। ব্রাহ্মণে এবং মহাভারতে আছে সরস্বতীর তীরেই ঋষিরা বাস করতেন। গঙ্গার সাতটি ধারার একটি ধারা সরস্বতী (পৌরাণিকা ২য় খন্ড)। এই ধারাটিই পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত প্রাচীন সরস্বতীর প্রবাহ কিনা, কে বলতে পারে! কালিদাস 'মেঘদূত' এবং 'রঘুবংশে যে সরস্বতী নদীর কথা উল্লেখ করেছেন, সেই নদী এই প্রাচ্যভারত তথা বঙ্গভূমির সরস্বতী বলেই অনুমান করা যেতে পারে।

সরস্বতীর উপকূলে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদ্ভব, তা সবিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করলো পরের পর্যায়ে। তারপরে আর্যদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হলো গাঙ্গেয় উপত্যকায়। আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি গঙ্গা নদীর অববাহিকা বা সমুদ্রোদ্ভূত হিমালয়ের প্রস্তরখণ্ড, মাটি প্রভৃতির সমন্বয়ে পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট পলিমাটি সমৃদ্ধ, শস্য উৎপাদক উর্বর ভূখণ্ডে পরিণত হয়েছে। রামায়ণে ভগীরথের মর্তে গঙ্গা আনয়নের পৌরাণিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে। রামায়ণ এবং মহাভারত, উভয় মহাকাব্যেই গঙ্গার শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন করা হয়েছিল।

গঙ্গা উৎপন্ন হয়েছে হিমালয়ের বিন্দু সরোবর থেকে।[৪] গঙ্গা আর্য সভ্যতার

কেন্দ্র বিন্দু 'মধ্যদেশের' প্রাণস্বরূপ। গঙ্গাকে মর্তে আনার কাহিনী হয়তো রূপকের আবরণে কোশল রাজ্য তথা অযোধ্যার সূর্য বংশীয় আর্য নরপতিদের দেশের শ্রী ও সমৃদ্ধি বর্ধনের জন্য কিছু পৌর্ত্তিক ব্যবস্থা অবলম্বনের জনহিতকর এবং প্রগতিশীল প্রচেষ্টার অন্তর্গত। দেবভূমির মন্দাকিনী ও অলকানন্দাকে আরাধনা করে খাল কেটে হরিদ্বারের কাছে মর্তের গঙ্গার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছিল—এরই নাম পৌরাণিক রূপককাহিনী, ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন।

'কোশল নৃপতির তুলনা নাই, জগৎজুড়ি যশোগাথা'—এ যশের সৌরভে বর্তমান যুগের কবিও আনন্দিত হলেও, এ যশোগাথা পুরাকালেরই সৃষ্টি। হরিদ্বার থেকে প্রয়াগ অবধি বর্তমান উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত কতগুলি বিশিষ্ট রাজ্য-সমন্বিত আর্যভূমি পবিত্র এবং ফুলে ফলে ও শস্যে, সম্পদে সমৃদ্ধ করেছিল গঙ্গা।

বর্তমান রাজমহল থেকে বঙ্গোপসাগরের মোহানা পর্যন্ত গঙ্গার ধারাটি একটি প্রশস্ত এবং গভীর খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে, সেই যুগের বঙ্গভূমির কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজস্ব বৃদ্ধি এবং ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসারে এই নদীর ভূমিকা অতুলনীয় এবং অনন্য। গঙ্গা বঙ্গদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের প্রধান সহায়করূপে গাঙ্গেয় উপত্যকার নিম্নভাগেও আপন গৌরবে বিরাজমান ছিল। তার পরে কয়েকটি উপনদীর জলদানে বর্ধিত হয়ে স্ফীত কলেবরে পূর্ববাহিনী গঙ্গা বঙ্গভূমির সীমান্তে পুনরায় দক্ষিণাভিমুখী হয়ে সাগর সঙ্গমে অভিসারিকা হয়েছিল।

হিমালয়সুতা গঙ্গা মর্তে এসে সমতল ভূমিকে প্লাবিত করেছিল। জলস্রোতে বাহিত পলিমাটি জলের ধারার সঙ্গে ভারতবর্ষের বুকের উপর ব্যাপ্ত হয়েছিল। বিশাল সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত এবং পরে পর্বতের পাষাণে পরিণত ঊষর এবং উচ্চনীচ প্রান্তরের উপর পলিমাটির প্রলেপ জমিকে প্রাণরস জুগিয়েছিল। গঙ্গার দুই কুলে রচিত হয়েছিল জনপদ—যা এক প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমিরূপেই ভারতের হৃদয় থেকে সগৌরবে উদিত হয়েছিল। ধনধান্যে, শস্যসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েছিল গাঙ্গেয় উপত্যকা, হয়েছিল প্রাণচঞ্চল, কর্মমুখর, মানুষের স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র ক্ষেত্র। গঙ্গানদী 'সর্বতীর্থময়ী'।

জনপদ থেকে নগর, তারপরে মানুষের আরাধ্য দেবতার আবাসভূমি যা তীর্থক্ষেত্র রূপে ভারতবাসীর মন অধিকার করে আছে সেই সুদূর অতীতের ইতিহাসহীন অন্ধকারময় যুগ থেকে। কিন্তু, আজও বেঁচে আছে পবিত্র ও প্রাণদায়িনী গঙ্গার দুই উপকূলের প্রান্তে, ভারতের প্রধান জলপ্রবাহের কেন্দ্রবিন্দুতে সেই প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্পর্শ, যা সজীব করছে মানুষের প্রাণ ও মন, উদ্দীপিত করছে সেই সনাতন জীবনবেদকে। সেই সুদূর অতীত যুগেই এই সুপবিত্র, মহান এবং ঐতিহ্যসম্পন্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় সভ্যতার প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সঞ্চারিত হয়েছিল সেই প্রাণসুধা কুরুক্ষেত্র, হস্তিনাপুর, কাম্পিল্য, প্রয়াগ, বৈশালী, বারাণসী, পাটলিপুত্র, চম্পা, গৌড়, সপ্তগ্রাম, তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত।

এই সভ্যতা এবং সংস্কৃতির বাহনধারা, যা গঙ্গার বিশাল এবং পুণ্যময় রূপের মধ্যে মূর্ত হয়েছিল তা রামায়ণ, মহাভারত এমন কি আগের যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগের অভ্যুদয়ে প্রাসী এবং গঙ্গারিডি পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দুদেশ এবং জাতিই অমৃতসঞ্চারিণী, পুণ্যবাহিনী, কল্লোলিনী জাহ্নবী গঙ্গার কন্যাসদৃশা। সেই প্রাচীনা এবং পূতপ্রবাহিনী স্রোতস্বিনী গঙ্গা ভগীরথের সাধনার এবং কৃতিত্বের শক্তিকে সফল করে গৌড়, পাণ্ডুয়া, তাম্রলিপ্তের মাটিকে চুম্বন করে, (আত্মস্বার্থবর্জিত রাজর্ষি কোশল নৃপতি ভগীরথের প্রজাহিত কামনা এবং রাজ্য রক্ষার মহৎ প্রচেষ্টার স্বাক্ষর বহন করে), পূর্বসাগরে মিলিত হয়েছে।

আর্য বিজয়ের অনেক আগেই বাঙ্গালী সভ্য এবং স্বাধীন। এই পূতবারি মন্দাকিনীর পীযূষ ধারায় সমৃদ্ধ ভাগীরথী গঙ্গার মতো মাতৃস্বরূপা প্রাণদায়িনী নদীর কল্যাণেই সুপ্রাচীন যুগে বাঙ্গালীর শক্তি ও সম্পদ সঞ্চিত হয়েছিল। তারপরে গঙ্গা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে মধ্য ও পূর্ববাংলার প্রধান ভূখণ্ডটি গঠনে সহায়ক হয়ে নদীমাতৃকা বঙ্গের গরিষ্ঠ অঞ্চলকে সৃষ্টি করেছে।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুযায়ী গাঙ্গেয় উপত্যকার পূর্বভাগ অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশ, বিহার, এবং বঙ্গদেশ বিশেষ সমৃদ্ধ এবং এই কারণেই এই অংশে কতগুলি উল্লেখযোগ্য নগরীর সৃষ্টি হয়েছিল। আগেই সেই বিখ্যাত প্রাচীন নগরীগুলির অধিকাংশেরই নাম করা হয়েছে। বারাণসীর কাছে গঙ্গা অতিক্রম না করে প্রাচ্যদেশে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না। সেই কারণে, বিদেশী শত্রু প্রাচ্যদেশে প্রবেশ করতে কুণ্ঠিত হতো।

নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকার সুসভ্য এবং সুশিক্ষিত যোদ্ধৃগণ তাদের সৈন্যসহ বিরাটকায় হস্তিবাহিনীর সাহায্যে শত্রুকে আক্রমণে অভ্যস্ত ছিল। এই বিষয়ে গঙ্গারিডিদের সম্বন্ধে ডিওডোরাসের উক্তি স্মরণীয়। গঙ্গারিডির অধিবাসীরা কোন যুদ্ধে পরাজিত হয়নি—একথা ডিওডোরাস বলেছিলেন।[৫]

পঞ্চনদের মধ্য দিয়ে এসে প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নীলাম্বু যমুনা দোয়াব অঞ্চলে প্রবেশ করার আগে মথুরা নগরীর উপকণ্ঠকে স্পর্শ করে যেতো। প্লিনীর অভিমতে যমুনা নদী মথুরার পাশ দিয়ে এসে পোলিবোথ্রায় (পাটলিপুত্রের নিকট) গঙ্গায় মিলিত হয়েছে। কিন্তু পোলিবোথ্রা অথবা পাটলিপুত্র গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে অবস্থিত ছিল না। অন্য আর একটি বিবরণ অনুসারে পোলিবোথ্রা গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থল থেকে ৪২৫ মাইল নীচে। পালিবোথ্রা (পাটলিপুত্র—বর্তমান পাটনা) যে গঙ্গা নদীর সঙ্গমে ছিল, এই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

মেগাস্থিনিস বর্ণিত এরান্নোবোয়াস ছিল শোন নদী, যমুনা নয়। মেগাস্থিনিস বলেছিলেন যে পালিবোথ্রা গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অন্য একটি বৃহৎ নদীর সঙ্গমে অবস্থিত ছিল। এই দ্বিতীয় নদীটিই যে শোণ নদী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আর্যদের সপ্তসিন্ধু (হপ্ত হেন্দ) কল্পনা আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দক্ষিণ ভারতেও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরভারত, তথা আর্যাবর্তে এবং দক্ষিণভারত, তথা

দাক্ষিণাত্যের সাতটি নদীর মাহাত্ম্যের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এই উপলব্ধির স্বাক্ষর হিন্দুর পূজা-অর্চনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি শ্লোকের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে :

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু॥

সুতরাং আর্যাবর্তে সরস্বতী ও গঙ্গার মতো যমুনাও একটি প্রাচীন, প্রসিদ্ধ ও পবিত্র নদী।

যমুনা নদীকে আমরা প্রয়াগেই গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হতে দেখি। প্রয়াগ সঙ্গমে সরস্বতী অদৃশ্য, কিন্তু গঙ্গা এবং যমুনা প্রকট। এই পুণ্যস্থানকে পণ্ডিতেরা ত্রিবেণী এবং যুক্তবেণী বলে বর্ণনা করেছেন। তিনটি নদী এই স্থানে যুক্ত বা একত্রিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। বস্তুতঃ, এই বিন্দু থেকেই যমুনা এবং সরস্বতী গঙ্গার মধ্যে লীন হয়ে এক প্রাচীন খাতে প্রবাহিত হয়েছে, এবং রাজমহলের নিকট নিম্নাভিমুখী হয়েছে।

সরস্বতী নদী সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'পূর্বে ভাগীরথীর প্রধান জলস্রোত সরস্বতী নদী দিয়াই প্রবাহিত হইত। প্রাচীনকালে পশ্চিমবঙ্গ, গৌড়, বিহার, কাশী, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থান হইতে সমুদ্রে গমন করিবার জন্য সরস্বতী নদীই সহজ ও সরল পথ ছিল। সেইজন্য স্মরণাতীত কাল হইতে এই পথেই সমুদ্র যাত্রা হইত এবং সপ্তগ্রাম সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দরে পরিণত হইয়াছিল'।[৬]

গঙ্গা-ভাগীরথীর শাখা নদীর একটি ছিল সরস্বতী। সরস্বতীর একটি প্রাচীন খাত ভাগীরথীর জল বহন করে রূপনারায়ণ ও দামোদরের ধারায় সমৃদ্ধ হয়ে, তাম্রলিপ্তের নিকট সমুদ্রে মিলিত হতো। এই মুখটিকে ভাগীরথীর দক্ষিণ-পশ্চিম মোহনা বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। কংসাবতী অ-বা কপিশা নদীর সঙ্গম বলে টলেমি এই মোহনাকে 'কেম্বিসন' বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এইখানে সরস্বতী খাতেরই প্রাধান্য ছিল এবং তাম্রলিপ্ত বন্দরের গাঙ্গেয় বন্দররূপে খ্যাতি এই সরস্বতীরই দাক্ষিণ্যে।

হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণী একটি প্রাচীন স্থান, এবং সুদূর অতীতে এক প্রধান বন্দরও ছিল। ত্রিবেণী একটি সঙ্গম বলেও বিখ্যাত। আগে ত্রিবেণী সঙ্গমেই গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী বিযুক্ত হতো এবং স্ব স্ব আকৃতিতে দৃশ্যমান হতো। এই ত্রিধারায় বিভক্ত হয়ে তারা সাগরের উদ্দেশে চলে যেতো। এককালে এর মধ্যে সরস্বতীই ছিল বড় নাব্য নদী এবং সরস্বতী রূপনারায়ণ দামোদর প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে বিশাল নদীতে পরিণত হয়েছিল।[৭]

সরস্বতীর পশ্চিম খাতে ছিল তাম্রলিপ্ত বন্দর। সরস্বতী ক্ষীণকায়া হতে আরম্ভ করলে প্রথমে তাম্রলিপ্ত বন্দর বিনষ্ট হয় এবং নদী প্রবাহও শহর থেকে বেশ দূরে স্থানান্তরিত হয়। গঙ্গার আকস্মিক স্রোত পরিবর্তনের এও এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাম্রলিপ্ত বন্দর অবলুপ্ত হলে, স্বরস্বতীর পূর্বপ্রান্তীয় খাতটি প্রবলতর হয়ে তার উপরে অবস্থিত সপ্তগ্রামের উন্নতি ঘটায় এবং বর্তমানে সাকরাইলের কাছে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়। মনে হয়, ভাগীরথী এইখান থেকে সাগরে যেতো আদি গঙ্গার

খাতে, এবং সরস্বতী যেতো দক্ষিণাভিমুখী বর্তমান সাগরদ্বীপের অভিমুখে। এই সরস্বতীর দ্বিতীয় খাতে প্রথমে জলের ঘাটতি হয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে, ঠিক যে সময় থেকে গাঙ্গেয় বদ্বীপের শীর্ষে পদ্মা শাখায় গঙ্গা ভাগীরথীর প্রবলতর জলস্রোত প্রবাহিত হতে আরম্ভ হয়।

এইভাবে ক্রমশঃ সরস্বতীর খাতে জলস্রোত প্রায় বন্ধ হওয়ায় সপ্তগ্রাম বন্দর কালের গর্ভে বিলীন হয়। কারণ, তখন গতি পরিবর্তনের দ্বারা সরস্বতীর খাতটি অধিকার করে ভাগীরথীর নিজস্ব কলেবর বৃদ্ধি হয় এবং ভাগীরথীর উপর অবস্থিত প্রথমে হুগলী এবং পরে কলিকাতা বন্দর হিসেবে প্রাধান্য লাভ করে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝির মধ্যে জলের অভাবে আদি গঙ্গাও মজে যায়। তখনই এই ভাগীরথীর সঙ্গে সরস্বতীর দক্ষিণমুখী প্রবাহপথটিকে একটি খাল কেটে সংযুক্ত করে এখনকার কাটিগঙ্গা তথা হুগলী নদীর প্রচলন হয় এবং এই স্রোতটিই বর্তমান সাগর দ্বীপের কাছে পূর্ব-সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়। এই দুশ/আড়াইশ বছরেও গঙ্গার সমুদ্র সঙ্গম অনেক দক্ষিণে অপসারিত হয়েছে এবং অনেক ভাঙ্গা গড়াই সংঘটিত হয়েছে।

নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় গঙ্গার সম্ভাব্য প্রাচীনতম পথ সম্বন্ধে সুবিখ্যাত ভারত-তত্ত্ববিদ এবং ঐতিহাসিক ডঃ নীহার রঞ্জন রায় যা বলেছেন, তা সংক্ষেপে এই—'পূর্ণিয়ার দক্ষিণে রাজমহল পার হইয়া গঙ্গা রাজমহল-সাঁওতালভূমি ছোট নাগপুর, মানভূম-ধলভূমের তলদেশ দিয়া সোজা দক্ষিণ বাহিনী হইয়া সমুদ্রে পড়িত। এই প্রবাহই ছিল অজয়, দামোদর, এবং রূপনারায়ণের সঙ্গম। এই তিনটি নদীই তখন নাতিদীর্ঘ। এই প্রবাহের দক্ষিণতম সীমায় তাম্রলিপ্ত বন্দর'।[৮]

সুতরাং ঐতিহাসিক কালের সূচনায় তাম্রলিপ্তই গঙ্গার সাগর সঙ্গমের নিকটতম বন্দর এবং বলাই বাহুল্য গঙ্গারিডির অন্তর্ভুক্ত।

নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় গঙ্গা সরস্বতীর প্রাচীনতম প্রবাহপথের আলোচনায় এবং বিশ্লেষণে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়। সেই যুগে ত্রিবেণী সঙ্গম থেকে সমুদ্রের দূরত্ব বেশী ছিল না এবং এই সমুদ্র ছিল ত্রিবেণীর পূর্বদিকে, যেখানে এককালে সাগর সঙ্গম ও কপিল মুনির আশ্রম ছিল বলে মনে করা হয়। সুপ্রাচীন যুগে ত্রিবেণীর পশ্চিম দিকেও সমুদ্রের দূরত্ব বেশী ছিল না।

গঙ্গা-ভাগীরথী পরে দক্ষিণগামী হয়ে আদি গঙ্গার খাতে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে উপনীত হতো। তখন সমুদ্র অনেক দক্ষিণে সরে এসেছে। সরস্বতী নদী ত্রিবেণী থেকে সপ্তগ্রামকে উপরে রেখে পশ্চিমদক্ষিণ মুখে আদমজুড়, আমতা, তমলুক প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতো। তাম্রলিপ্ত বর্জিত হলে দেশী ও বিদেশী বাণিজ্য পোতগুলি দেশ বিদেশের রত্নভাণ্ডার সপ্তগ্রামে বহন করে আনতো।

সেই সময়ে অর্থাৎ তমলুকের পথ ও খাড়ি জলশূন্য হলে, সরস্বতীর পূর্বদিকের স্রোতটি সপ্তগ্রামকে বিধৌত করে সাকরাইলের কাছে গঙ্গায় মিলিত হয়ে, ক্ষীণভাবে

সাগরের দিকে চলে যেতো। এ'কথা আগেই বলা হয়েছে। এদিক থেকেও ত্রিবেণী থেকে সমুদ্রের দূরত্ব অকিঞ্চিৎকর না হলেও খুব বেশী নয়।

ত্রিবেণী থেকে মুক্ত হয়ে যমুনার গতি ছিল উপবঙ্গের দিকে। সেখানেও অনতি দূরে সমুদ্র ছিল তখন, যাকে টলেমির মানচিত্রে গঙ্গার তৃতীয় মুখ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বিষয়ে আগেই আলোকপাত হয়েছে।

ষোড়শ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীতে নিম্নবঙ্গে গঙ্গা-ভাগীরথীর নিজস্ব প্রবাহ পথটি প্রাধান্য লাভ করার সময়ে অবশ্য মূল গঙ্গার জলরাশি নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে পদ্মার শাখাতে সঞ্চালিত হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই পদ্মা প্রবলতর। গঙ্গা-ভাগীরথী খাতও অনেক দক্ষিণে সরে গিয়েছে। এই কাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গে অনেক নদীতেই জলের অভাব হয়েছে। তখনও রূপনারায়ণ, দামোদর পত্রঘাটার জল গঙ্গার স্রোতে মিলিত হয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গে নদী উত্তর ও পূর্ববাহিনী এবং গৌড় তখনও গঙ্গার পশ্চিমকূলে।[৯]

গঙ্গাকে বাদ দিলে ত্রিবেণী সঙ্গমের পরে যমুনাকে আমরা পাই বঙ্গে সরস্বতীকে পাই রাঢ় দেশে। প্রয়াগ থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত এই দুই অতি প্রাচীন নদী গুপ্ত অথবা লুপ্ত। কিন্তু এদের লুপ্ত অস্তিত্ব গঙ্গার পূতধারার মধ্যেই মানুষের মনে জাগরিত ছিল। এইজন্যই ত্রিবেণীর মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। বস্তুতঃ, বন্দর ও তীর্থ হিসেবে ত্রিবেণীর বৈশিষ্ট্য শুধু গঙ্গার গতিপথে অবস্থিত হওয়ার জন্যই নয়, গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতীর সঙ্গমে অবস্থিত হওয়ার কারণেও বটে।

এই ত্রিবেণীর পথেই গৌড়, চম্পা, পাটলিপুত্র হয়ে প্রয়াগ পর্যন্ত জলযান চলাচল করতো। ত্রিবেণীর সাগর সঙ্গম ছাড়াও, দামোদর নদের নিম্নাভিমুখী প্রবাহও ত্রিবেণী থেকে দূরে ছিল না। সিংহলীয় প্রাচীন পালি গ্রন্থ 'মহাবংশ' এবং 'দীপবংশ' অনুসারে খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে ত্রিবেণীর নিকট পাণ্ডুয়াতে পাণ্ডুশাক্য রাজার রাজধানী ছিল বলে জানা যায়।[১০] 'খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে সিংহবংশ ব্যতীত শাক্যবংশও রাঢ়ে রাজত্ব করিতেন' (গৌড়ের ইতিহাস—রজনীকান্ত চক্রবর্তী)।

সুধীরকুমার মিত্র বিদ্যাবিনোদ তাঁর হুগলী জেলার ইতিহাস গ্রন্থে ত্রিবেণী সম্পর্কে বলেছেন যে প্রাচীনকালে ত্রিবেণী ভারতের একটি প্রধান বন্দর এবং হিন্দু-দিগের একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ ছিল। বিভিন্ন গ্রন্থকারগণ ত্রিবেণীকে ত্রিপানি, তারবানি, ত্রিভেণী, তিরপুণী ত্রিপিনা প্রভৃতি বহুনামে বর্ণনা করেছেন। তিনি রেভারেণ্ড লং সাহেবের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। 'The Portugese, Ptolemy and the natives now call it Tripina but incorrectly.' এই উদ্ধৃতিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। টলেমির মানচিত্রে (India beyond the Ganges) তালার্গা (Talarga) নামক গঙ্গার পূর্ব উপকূলস্থ স্থানটি অগ্রদ্বীপের নিম্নে ত্রিবেণী বলে ধারণা হয়। (Ancient India as discribed by Ptolemy—J. W. McCrindle, P. 216)

হুগলী জেলার ত্রিবেণীকে অনেকে একটি প্রাচীন বন্দর বলেছেন। তাছাড়া,

মুক্তবেণী ত্রিবেণীর স্থান মাহাত্ম্যের খ্যাতি তো আছেই। এখানেই গঙ্গা-ভাগীরথীর জলধারা তিনটি স্রোতে বিভক্ত হয়ে তিনদিকে প্রবাহিত হতো। এই তিনটি প্রবাহ ছিল পশ্চিমমুখী সরস্বতী, পূর্বমুখী যমুনা এবং দক্ষিণমুখী গঙ্গা।··

কালিদাসের রঘুবংশে সরস্বতী এবং ভাগীরথীর সঙ্গমে ত্রিবেণীর উল্লেখ আছে। ত্রিবেণীর প্রাচীনত্ব স্বাভাবিকভাবে সপ্তগ্রামের প্রাচীনত্বও প্রতিপন্ন করে। এই বিষয়ে সঠিক কোন 'পাথুরে প্রমাণ' পাওয়া যায় নি এখনও। তার অন্যতম কারণ জনবসতির জন্য সপ্তগ্রামের সম্ভাব্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমন্বিত স্থানগুলি খনন করা যায় নি। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে সপ্তগ্রামে পরম ভট্টারক শ্রীশ্রীরূপনারায়ণ সিংহ রাজত্ব করতেন বলে জানা যায়।[১২] এর অনেক পরে সপ্তগ্রাম মুসলমান শাসন কর্তাদের অধীনে যায়। সুতরাং সপ্তগ্রামকে নিছক মধ্যযুগীয় এক রাজধানী শহর ও বন্দর বলে অনুমান করা ইতিহাসগতভাবে সঙ্গত নয়।

সপ্তগ্রাম, এই নামটির পশ্চাদপট অনুসন্ধান করলে জানা যায়, প্রিয়ব্রত নামে এক রাজার সাতপুত্র—অগ্নিদ্র, মেধাতিথি, বপুষ্মান, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিমান, সবন ও ভব্য গৃহস্থাশ্রম বর্জন করে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে তপস্যায় রত হয়েছিলেন। পবিত্র ত্রিবেণীই এই সাধনভূমি ছিল, মনে করা অসঙ্গত নয়। পৌরাণিক বলিরাজার পুত্র সুহ্ম যখন এই অঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তিনি সমুদ্রতীরের নিকটবর্তী পুণ্যতীর্থ ত্রিবেণী সঙ্গমের সন্নিকটে সাত জন ঋষির পাদস্পর্শে ধন্য স্থানকে সপ্তগ্রাম বলে অভিহিত করেন। হয়তো সুহ্ম দেশের রাজধানী গঙ্গার শাখানদী সরস্বতীর সলিল বিধৌত সপ্তগ্রামেই স্থাপন করেছিলেন তিনি।

ত্রিবেণীর কাছে এক সময়ে সাগর সঙ্গম ছিল, এখানে কপিল মুনির আশ্রম ছিল বলে অনেকে মনে করেন। বস্তুতঃ, গঙ্গা-ভাগীরথী—সঙ্গম, গৌড়, মুর্শিদাবাদ, ত্রিবেণী প্রভৃতি থেকে নামতে নামতে আজকের অবস্থায় এসেছে। একটি প্রাচীন মানচিত্রে (Ancient India as described by Megasthenes and Arrian গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট) গঙ্গার সমুদ্র মুখের তাম্রলিপ্ত বন্দরের উপরেই, অর্থাৎ সেই একই নদী খাতের উপর দিকে 'গঙ্গে' বন্দরকে দেখানো হয়েছে। এই স্থানটি ভৌগোলিক-ভাবে ত্রিবেণী সঙ্গমের নিকট প্রাচীন সপ্তগ্রাম ছাড়া আর কিছুই নয়!

সেই কারণেই, অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে নীচে তাম্রলিপ্ত বন্দরের উপর দিকে সরস্বতী নদীর উপর সপ্তগ্রাম একটি প্রাচীন বন্দর ছিল, যে স্থান সমুদ্র থেকে অল্পই দূরে ছিল। অনেক ঐতিহাসিক এবং পণ্ডিত যে সপ্তগ্রামকেই সেই গঙ্গে বন্দর বলে অভিহিত করেছেন, তা অত্যুক্তি বলে মনে হয় না। অন্যথায়, আমরা Rev. Long'এর উক্তিটি কিভাবে গ্রহণ করবো—'Many years ago Satgao, the royal emporium of Bengal from the time of Pliny down to the arrival of the Portugese in this country has now scarcely a memorial of its greatness left.'[১৩]

গঙ্গাকে এক গ্রীক সাক্ষ্যে ভীষণ প্রশস্ত নদী বলা হয়েছে (32 stadia

broad)।[১৪] অর্থাৎ চওড়ায় চার মাইল। এই গঙ্গা নিশ্চয়ই নিম্নবঙ্গে গঙ্গার পূর্ব-বাহিনী স্রোত পদ্মা নয় (দু হাজার বছর আগে যখন সমুদ্র গৌড় অথবা রাজমহলের কাছাকাছি তখন পদ্মার অস্তিত্ব ছিল কিনা সন্দেহ !)। নিম্নবঙ্গে মুক্তবেণী ত্রিবেণী তীর্থ থেকে গঙ্গার প্রধান খাত ছিল সরস্বতী, এবং তার উপর ছিল যমুনা এবং মূল গঙ্গা স্রোত যা ভাগীরথী নামে খ্যাত। এই শেষোক্ত স্রোতটিই ব্রিটিশ যুগে হুগলী নদী নামে অভিহিত হয়েছিল। মহাভারতের মধ্যে 'দক্ষিণ প্রয়াগ' বলে বর্ণিত এক তীর্থস্থানের উল্লেখ আছে। এই তীর্থক্ষেত্রটি মুক্তবেণী (গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর দ্বিতীয় তথা সমুদ্রের নিকটবর্তী সঙ্গম) ত্রিবেণী বলে অনুমিত হয়।

সুতরাং গাঙ্গেয় উপত্যকার উপর ভাগের মতোই নিম্নভাগেও গঙ্গা ছিল বিশাল, দুকূল যার চর্মচক্ষে দৃশ্যমান হতো না। রাজমহল পাহাড়ের পাশ থেকে বেরিয়ে উত্তর বঙ্গের মধ্যে দিয়ে আসার সময়েই গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী হতে শুরু করে এবং প্রবল স্রোতে প্রবাহিত হয়ে অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ প্রভৃতি ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে উত্থিত নদীর জলরাশির দ্বারা স্ফীত হয়ে নিম্নবঙ্গে বিরাট আকার ধারণ করে। সেই সময়ে ত্রিবেণী সঙ্গমে গঙ্গা ত্রিধা বিভক্ত না হলে, নিম্ন পশ্চিমবঙ্গের ভূভাগ গঠনে, অর্থাৎ, হুগলীর দক্ষিণভাগ, হাওড়া, কলিকাতা, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি স্থানের ভৌগোলিক আকৃতি হয়তো ভিন্ন রকম হতো।

এই পুরাকালে অর্থাৎ সাগর সঙ্গম যখন অনেক উত্তরে, তখন গঙ্গা ভাগীরথীর পূর্ব-দক্ষিণ অংশ কতগুলি দ্বীপের সমষ্টিতে এক বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড ছিল। তখন পদ্মার একটি ক্ষীণ স্রোত থাকলেও, নদী হিসেবে সেই প্রবাহের কোন প্রাধান্য ছিল না। এই অবস্থা প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে খৃষ্টীয় শতাব্দীর বেশ কয়েক 'শ বছর অবধি চলে।

এইখানে পুনরায় স্মরণ করতে হবে যে কাশ্মীরের রাজকবি কহ্লণের রাজতরঙ্গিণী (চতুর্থ তরঙ্গ) অনুযায়ী ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে গৌড়ের কাছে সমুদ্র দেখেছিলেন। কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্মার গৌড় বিজয়ের স্মৃতিতে তাঁর সভাকবি বাকপতিরাজ রচিত 'গৌড় বহো' কাব্যে (খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী) গৌড়বাসীদিগকে সমুদ্রতীরবাসী (গৌড়ান সমুদ্রাশ্রয়ান্) বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ষ্ট্রাবো, প্লিনী প্রভৃতি বিদেশী লেখকেরা যে সাগরাভিমুখী গঙ্গার একটি মূল স্রোতের কথা বলেছেন তা ভাগীরথীরই স্রোত—অন্য কোন জল-প্রবাহেরই নয়। এই গঙ্গা-ভাগীরথীই তার পশ্চিম ও পূর্বতীরে ভূভাগ গঠন করে চলেছে হিমালয়ের প্রস্তর খণ্ড, মাটি, বালি প্রভৃতি দিয়ে। এই স্থল গঠনের ফলেই ক্রমশঃ উদ্ভূত হয়েছে রাঢ়দেশের কিছু অংশ যার মধ্যে হুগলীর দক্ষিণ অংশ, হাওড়া এবং গঙ্গার পূর্বতীরে কলিকাতা, চব্বিশ পরগণা (সুন্দরবনসহ) পড়ে। (ভাগীরথী) গঙ্গার পূর্বতীরের পূর্বদক্ষিণ অংশের ভূমিকেই উপবঙ্গ এবং গঙ্গা ও পদ্মার মধ্যস্থিত ভূভাগকে বঙ্গীয় বদ্বীপ বলা হয়েছে। কিন্তু পলিমাটিতে গঠিত নদীয়া, (কিছু অংশ) মুর্শিদাবাদ, যশোহর, খুলনা, (কোন কোন অংশ) চব্বিশ পরগণা, কলিকাতা প্রভৃতি

ভূভাগকেও রাঢ়ের অন্তর্গত বলা যায়। এর মধ্যে যশোহর, খুলনা বাদে প্রায় অন্য সমস্ত অঞ্চলই বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত।

এই প্রসঙ্গে গঙ্গা ভাগীরথীর সাগর যাত্রার বর্ণনায় গ্রীক ভৌগোলিক স্ট্রাবোর উক্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

'The whole of India is traversed by rivers. Some of these flow together into the largest rivers, the Indus and the Ganges, where as others empty into the sea by their own mouths.·· ·Now the Ganges, which is the largest of the rivers in India, flows down from the mountainous country, and when it reaches the plains bend towards the east and flows past Palibothora, a very large city, and then flows on towards the sea in that region and empties by a single outlet ·····.'[১৪]

এই বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে রোমান ঐতিহাসিক প্লিনীর গঙ্গা নদীর সাগর সঙ্গমের বিবরণটি স্মরণীয় :—

"······Whence it flows out with a gentle current, being at the narrowest eight miles, and on the average a hundred stadia in breadth, and never of less depth than twenty paces (one hundred feet) in the final part of its course, which is through the country of the Gangarides···· "

গঙ্গা নদীর বিশালত্ব সম্বন্ধে এই বর্ণনাটি কিছু মাত্রায় অতিরঞ্জিত। যাই হোক, প্লিনীর এই বিবরণের সঙ্গে তাঁর অন্য দুটি মন্তব্যের সমন্বয় করা যেতে পারে।

১) The tribes called Calingae are nearest to the sea and higher up are the Mandai, and the Malli in whose country is Mount Mallus, the boundary of all that district being the Ganges.
২) There is a very large island in the Ganges which is inhabited by a single tribe called Modgalingae.[১৫]

প্রথম মন্তব্যটি পরিষ্কারভাবে প্রতিপন্ন করে যে (ক) গঙ্গার সঙ্গম তখন ছিল খানিকটা উত্তরে এবং রাঢ়দেশের দক্ষিণ পশ্চিম ভূভাগ সমুদ্রের নিকটবর্তী কলিঙ্গ (উৎকল) দেশের সন্নিহিত, (খ) খানিকটা উপরে মল্ল ও মান্ডারীদের দেশ যেখানে বর্তমান ভাগলপুরের অন্তর্গত মন্দার পর্বত বলে চিহ্নিত প্রাচীন মল্লস পর্বত অবস্থিত ছিল। (গ) গঙ্গারিডিদের দেশের মধ্যে গঙ্গার শেষ অংশ প্রবাহিত বলতে উত্তর কলিঙ্গের সমীপবর্তী গঙ্গা-ভাগীরথী বুঝিয়েছে—যার দক্ষিণ পশ্চিমে সমুদ্রের উপকূলের নিকট ছিল তাম্রলিপ্ত বন্দর (প্লিনী Taluctaeদের কথা বলেছেন)।

দ্বিতীয় মন্তব্যটি গঙ্গার মোহনার নিকট একটি বেশ বৃহৎ দ্বীপের অস্তিত্বের কথা প্রমাণিত করে, যে দ্বীপে মদকলিঙ্গজাতি বাস করতো। এটি বর্তমান দক্ষিণ পশ্চিম

সুন্দরবনের তৎকালীন উত্তরাংশ হতে পারে, অথবা তৎকালীন তাম্রলিপ্তের দক্ষিণেও হতে পারে। এক সময়ে এইসব অঞ্চলে মলঙ্গী জাতি বাস করতো বলে জানা যায়, যাদের নুন তৈরী করা অথবা মাছ ধরা পেশা ছিল। প্রাচীন বিবরণ অনুযায়ী তাম্রলিপ্তের নিকট একটি সমুদ্রের খাড়ি ছিল। এই সমুদ্রের খাড়ির কাছে উপযুক্ত দ্বীপ অবস্থিত ছিল এমন কথা চিন্তা করা অসঙ্গত নয়। এই দ্বীপটিই যে বর্তমান সাগর-দ্বীপের চেয়ে প্রাচীনতর, এমন অনুমান করাও অসঙ্গত নয়, কারণ, ভূগঠনের প্রক্রিয়ায় এখন আর এই দ্বীপের অস্তিত্ব নেই।

একই সঙ্গে আমরা গ্রীক ঐতিহাসিক ডিওডোরাসের গঙ্গার সাগরমুখী প্রবাহের বর্ণনাটি স্মরণ করবো :—

"Now this river, which is 30 stadia broad, flows from north to south, and empties its water into the ocean forming the eastern boundary of the Gangaridai, a nation which possess the greatest number of elephants and the largest in size .... "[১৬]

এখানে যে অতি প্রশস্ত নদীটির উল্লেখ করা হয়েছে, তা মনে হয় নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকার মূল আদি প্রবাহ গঙ্গা-ভাগীরথী, যা একটি মুখেই সমুদ্রে জল নিঃশেষ করেছে, এবং গঙ্গারিডির পূর্বদিকে সীমা নির্ধারিণ করে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে, এই কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে ডিওডোরাসের এই নদীর বর্ণনাটি মেগাস্থিনিসের অধুনা অবলুপ্ত গ্রন্থ 'Indika' থেকে গৃহীত হয়েছে যদিও এই তথ্যের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছেন।[১৭]

তৎকালীন গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রবাহের কথা চিন্তা করলে, বুঝা যায় যে, ডিওডোরাসের এই বিবরণটি নিম্ন উপত্যকায় গঙ্গার পাঁচটি সাগর মুখের বর্ণনার কিছুটা অসারত্ব প্রতিপন্ন করেছে। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে Mega অর্থাৎ Great Mouth আখ্যাটির যাথার্থ্য প্রমাণ করেছে।

টলেমি বর্ণিত গঙ্গার প্রথম মুখটি তাম্রলিপ্ত বন্দরের সন্নিহিত সরস্বতী নদীর মোহনা মুখ বলেই অনুমিত হয়। দুই আড়াই হাজার বছর আগে নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় ছিল গঙ্গার একটি মূলধারা যেটি পশ্চিম থেকে ক্রমশঃ পূর্বদিকে সরে এসেছে। অবশ্য গঙ্গা-ভাগীরথীর শাখা সরস্বতী যতদিন প্রবল ছিল, অর্থাৎ সপ্তগ্রামের অবনতি পর্যন্ত, ততদিন বিদেশীরা একেই হয়তো গঙ্গা বলে মনে করেছেন। ভাগীরথীর দক্ষিণমুখী স্রোতকেও গঙ্গা বলে বিবেচনা করেছেন।

ডিওডোরাসের উক্তি থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে গঙ্গারিডি বলতে রাঢ় বঙ্গ অথবা পশ্চিমবঙ্গের কথাই বলা হয়েছে। কারণ, নিম্ন উপত্যকায় গঙ্গার অন্য কোন শাখাই সেই যুগে এত বিরাট ছিল না এবং অন্য কোন ভূভাগও এত সংগঠিত ছিল না। একমাত্র সরস্বতী নদীই তার ব্যতিক্রম। কিন্তু সেই প্রাচীন যুগে গঙ্গা ও সরস্বতী ছিল একাত্ম, সেইজন্য ভুলেও কোন বিদেশী লেখক সরস্বতীর নাম করেন নি। এটা খুবই সম্ভব যে তমলুক বন্দরের অবলুপ্তির পরে সরস্বতী প্রবাহের নাম অধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ

করেছিল, যতদিন না নদীস্রোত শুষ্ক হয়ে যায়, ততোদিন পর্যন্ত। এইভাবে পদ্মা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে চতুর্দর্শ/পঞ্চদশ শতাব্দীর পর থেকে এবং গঙ্গার বৃহত্তর স্রোতকে অর্থাৎ পলি প্রস্তর যুক্ত জলবন্যাকে সমুদ্র পথে বহন করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের বিচ্ছিন্ন ভূভাগকে স্থানে স্থানে সুদৃঢ় করেছে। এটা হয়েছে গঙ্গার গতি পরিবর্তনের পরে যখন থেকে ভাগীরথীর স্রোত শীর্ণতর হতে আরম্ভ করেছে।

গঙ্গা-ভাগীরথী, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র বা অন্য নদীর তুলনায় নিম্ন বাংলায় অনেক আগে থেকেই নতুন ভূভাগ গঠন করেছে। বিদেশী লেখকেরা গ্রীক ও লাতিন ভাষায় যখন গঙ্গারিডি ও প্রাসীর কথা বিবৃত করে গেছেন, তখন অর্থাৎ ভারতে আলেকজাণ্ডারের অভিযানোত্তর যুগে আমাদের গঙ্গারিডির চিহ্নিত করণে, এই অবস্থার কথা মনে রাখতে হবে। কারণ, 'এ কথা অনস্বীকার্য যে মোটামুটিভাবে পুণ্ড্র বরেন্দ্রী এবং রাঢ় তাম্রলিপ্ত অঞ্চলই বাংলাদেশের প্রাচীনতর পলিভূমি।'[১৮] ভূতত্ত্ববিদগণও এই কথাই স্বীকার করেন (ভূতাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিমবাংলা—সঙ্কর্ষণ রায়, দ্রষ্টব্য)।

মৎস্য পুরাণে (পরিচ্ছেদ ১২১) এই কথা বিবৃত আছে যে গঙ্গা কুরু ভারত, পাঞ্চাল, কৌশিক, মগধ, ব্রহ্মোত্তর, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত দেশের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ সাগরে মিলিত হয়েছে। কিন্তু বঙ্গের নাম থাকলেও, নদীর দক্ষিণপূর্বের গতিপথে পশ্চিমের তাম্রলিপ্তের মতো সীমানা নির্দেশক অথবা পথ নির্দেশক কোন চিহ্নের অস্তিত্বের কথা জানা যায় না। সুতরাং এই নির্দেশক চিহ্নের অনুপস্থিতিতে বা অভাবে গঙ্গার দক্ষিণপূর্ব অভিমুখী পদ্মা শাখার প্রাচীনকালে অস্তিত্বের খ্যাতি বা প্রাধান্যের উপর জোর দেওয়া সম্ভব নয়। (The Ganges Delta—Kanan Gopal Bagchi.)

বাংলার সামগ্রিক সভ্যতার বিকাশে হিমালয়ের 'অনুন্নত উপত্যকাগুলি এবং তরঙ্গিত বঙ্গোপসাগর' প্রভৃতির প্রভাব বিশ্লেষণে, এক খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদের নিম্নলিখিত উক্তিটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঃ—

'এই সমগ্র ভূভাগের মধ্যে পশ্চিমের শৈলাঞ্চল ও প্রাচীন পাললিক ভূমি গঠনের গুরুত্বই বারংবার অনুভূত হয়। রাজমহল শৈলমালার সমীপে প্রান্তভূমির ইতিহাস যে সুপ্রাচীন তা সন্দেহাতীত। রাজমহলের সমুন্নত পাহাড় এবং সদাপ্রবাহিত গঙ্গার মধ্যবর্তী অঞ্চল স্বভাবতঃই এক ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের উপযোগী। ...গাঙ্গেয় 'ব' দ্বীপ যা আপাতঃ দৃষ্টিতে নবীন তারও ইতিহাস রহস্যময়।'...[১৯]

সুতরাং এ'কথা নিঃসন্দেহে সত্য এবং প্রায় স্বতঃপ্রমাণিত যে আলেকজান্ডারের অধীনে গ্রীক আক্রমণের কালে (৩২৬ খৃঃ পূঃ) বঙ্গদেশের পুরাভূমি, যথা, পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ় প্রাথমিকভাবেই গঙ্গারিডির অন্তর্গত ছিল এবং তৎকালীন গাঙ্গেয় বন্দর তাম্রলিপ্ত সেই জাতির এবং দেশের মেরুদন্ড ও প্রধান বন্দর ছিল।

এই বিষয়ে চূড়ান্ত বিবেচনায় একটি অপরিবর্তনীয় সত্য এই মন্তব্যের মধ্যে নিহিত আছে—'পূর্ব-বাঙলা একান্তই নবভূমি এবং এই নবভূমি পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র এবং সুরমা মেঘনার সৃষ্টি।'[২০] এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম, পার্বত্য ত্রিপুরা, কাছাড়ের

উত্তরাংশ, শ্রীহট্টের পূর্বাঞ্চল, ঢাকা ও মৈমনসিং জেলার বনময় ও গৈরিক পার্বত্যভূমি সমন্বিত স্থানগুলি পূর্ব বাঙলার পুরাভূমির অন্তর্ভুক্ত।[২১] এবিষয়ে আগে বহুলভাবে আলোচনা হয়েছে। পদ্মার প্রবাহের দ্বারা ভূ-সৃষ্টির প্রক্রিয়া অনেক পরের ব্যাপার।

এখন বঙ্গদেশে গঙ্গানদীর গতিপথ সম্বন্ধে কিছু অতিরিক্ত আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। গঙ্গার প্রাচীনতম পথ, যা বোধ হয় আলেকজাণ্ডারের সময় আগত বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় তা ছিল দক্ষিণবাহিনী। রাজমহল, সাঁওতাল পরগণা-ছোটনাগপুর-ধলভূম-মানভূমের তলা দিয়ে অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণের সঙ্গমগুলি অতিক্রম করে সাগরে পড়তো। এই পথেও যে গঙ্গা শেষপ্রান্তে এখনকার শুষ্ক, মজে যাওয়া আদি গঙ্গার খাতে বইতো না, এমন মনে করা সঙ্গত নয়। গঙ্গা ভাগীরথীর প্রাচীনতম পথের সাগর সঙ্গমের আগেই তাম্রলিপ্ত বন্দর ছিল বলেই অনেকে অনুমান করেন। তবে তা ছিল নিঃসন্দেহে সরস্বতী শাখার গতিপথ।

বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশপরগণার প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের প্রভাবে যদি মনে করতে হয় যে তথা কথিত আদিগঙ্গার খাতটিও সুপ্রাচীন, তবে এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে সেই সময়ে গঙ্গা-ভাগীরথীর স্রোত দু'ভাগে অথবা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে সমুদ্রে মিশেছিল। এই পরিস্থিতি মেনে নিলে, নিম্ন অঞ্চলে গঙ্গার একটি প্রাচীন খাত যে সরস্বতী, তার অস্তিত্বকে সমন্বয় করে নেওয়া যায়।

এ'কথা আগেই কয়েকবার বলা হয়েছে যে অনেকেই তাম্রলিপ্ত বন্দর সরস্বতী নদীর পশ্চিম খাতে সমুদ্রের খাড়িতে অবস্থিত ছিল বলে মনে করেন। সরস্বতীর পূর্ব-দিকের খাতটিও প্রাচীন বলেই মনে হয়, এবং এইখানেই ছিল সপ্তগ্রাম বন্দরনগরী। এই খাতটি দক্ষিণে গিয়ে সাকরাইলের কাছে গঙ্গা-ভাগীরথীর মূল খাতের সঙ্গে মিলিত হতো। এখান থেকে স্বতন্ত্রভাবে সাগরের অভিমুখে প্রবাহিত হতো।

বেতড়ের কাছ থেকে পূব দিকে আদিগঙ্গার স্রোতটি সাগর সঙ্গমে যেতো।'...এই খাতের দুই পাশ দিয়ে পুরাকীর্তির যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে গুপ্তযুগ অবধি এবং কিছু পরিমাণ গুপ্তোত্তর কালেও সমুদ্রগামিনী গঙ্গার এক প্রধান ধারা ছিল আদিগঙ্গা।'[২২]

আদিগঙ্গা মজে যাবার পরে, বেতড়ের কাছ থেকে একটি খাল কেটে দক্ষিণাভিমুখী করা হয়। অনেকে এটিকে সরস্বতীর পূর্বদিকের স্রোত বলে গণনা করেন। এই স্রোতের সাগর মোহনাতেই বর্তমান সাগরদ্বীপ যার উদ্ভব আগে থেকে হলেও, গঙ্গারিডির যুগে তার অবস্থিতি একই স্থানে ছিল কিনা তা অত্যন্ত সংশয়পূর্ণ। এট কারণে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার ও বিনয় ঘোষ উভয়েই সাগর দ্বীপকে 'গঙ্গে' বন্দরের সঙ্গে অভিন্ন ভাবতে শেষ পর্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন।

গঙ্গারিডি বলতে তখন বিশাল গঙ্গা-ভাগীরথী যার হৃদপিণ্ড, সেই পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত সমন্বিত ভূভাগকেই গ্রীকেরা বুঝিয়েছিল। মনে রাখতে হবে যে

রঘুবংশে কালিদাস বর্ণিত বঙ্গ যা গঙ্গার স্রোতের ফাঁকে ফাঁকে অবস্থিত ছিল, তাও ছিল কয়েকটি দ্বীপের সমষ্টি এবং সেই অবস্থাও খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর আগে নয়।

যেহেতু ত্রিবেণীর কাছে এক সময়ে ছিল সাগর-সঙ্গম, তাম্রলিপ্তের কথা বাদ দিলেও ত্রিবেণী-পাণ্ডুয়া-গাংপুর অঞ্চলে কোথায়ও, অথবা সপ্তগ্রামে 'গঙ্গে' বন্দর অবস্থিত থাকা বিচিত্র ছিল না। আদি গঙ্গার খাতে এবং বিদ্যাধরী ইছামতীর সমুদ্র সঙ্গমের দিকের প্রত্নতত্ত্ব-প্রতিষ্ঠিত বন্দর/বন্দর-শহরগুলি বঙ্গ/সমবঙ্গের অন্তর্গত ছিল। দ্বীপ সৃষ্টি এবং ভূখণ্ড সম্প্রসারণের দ্বারা সমুদ্র যতো নীচে চলে গিয়েছে, এই স্থানগুলিও প্রাচীনকালে সাময়িকভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু এই অঞ্চলের কোন বন্দর সেই বিদেশী নাবিক বর্ণিত গঙ্গার উপরে এবং সমুদ্রের কাছেই অবস্থিত 'গঙ্গে' বন্দর বলে অনুমান করা কষ্টকল্পিত বলে মনে হয়। অন্যপক্ষে ভৌগোলিক সংগঠন এবং নদীর অবস্থানের দিক দিয়ে বিচার করলে ভাগীরথী ও সরস্বতী সঙ্গমের কাছেই গঙ্গে বন্দরের অবস্থিতি স্বীকার করা সহজসাধ্য হয়।

গঙ্গারিডি দেশ ছিল আরও খানিকটা পশ্চিম দিকে গঙ্গার দুই তীরকেই আলিঙ্গন করে। বর্তমান খুলনা ও চব্বিশপরগণার প্রাচীন অঞ্চলগুলি গঙ্গারিডির মধ্যে ছিল হয়তো, কিন্তু গঙ্গারিডির রাজকীয় নগর ও বন্দর এই বিচ্ছিন্ন ভূভাগে যে অবস্থিত ছিল সেই দুই থেকে আড়াই হাজার বছর আগে, এমন মনে করা যায় না। দু হাজার বছর আগে গাঙ্গেয় বদ্বীপের বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডে গঙ্গারিডি দেশের/জাতির অবস্থানকে ইতিহাসগতভাবে গ্রহণ করা কঠিন।

গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী—এই তিনটি নদীর অন্তিম গতিপথের বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত বর্ণনাটি অতিশয় প্রাঞ্জল এবং উল্লেখযোগ্য :—

'গঙ্গার ভাঙ্গা-গড়ার তালে তালে বাংলার গাঙ্গেয় সভ্যতার উত্থান পতন হয়েছে। গঙ্গা এক সময়ে ত্রিবেণীর কাছে এসে তিনটি ধারায় ভাগ হয়ে যেতো। সরস্বতীর ধারা দক্ষিণ-পশ্চিমে সাতগাঁয়ের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতো। যমুনার ধারা দক্ষিণ-পূর্বে বয়ে যেত এবং ভাগীরথীর ধারা দক্ষিণে হুগলী ও আদি-গঙ্গার প্রবাহপথে কলিকাতা, কালিঘাট, গড়িয়া, বারুইপুর মগরার পাশ দিয়ে গিয়ে সমুদ্রের খাড়িতে পড়তো। সরস্বতীর ধারা এক সময়ে তমলুকের কাছে কোন খাড়িতে গিয়ে পড়তো এবং শুধু দামোদর ও রূপনারায়ণ নয়, অন্যান্য অজস্র ছোট ছোট নদীর জলধারা মিশতো তার সঙ্গে। তমলুকের মতো সাতগাঁয়ে বাণিজ্য তরী চলাচলের পথে কোন বাধা ছিল না। চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত একাধিক বিদেশী পর্যটক, যারা বাংলাদেশে জলপথে সাতগাঁয়ের বন্দরে এসেছেন, তাঁরা সকলেই বলেছেন যে সমুদ্রকূল থেকে সপ্তগ্রামের দূরত্ব বেশী নয়। এ কথা বলার তাৎপর্য হলো এই যে সরস্বতীর দক্ষিণ-পশ্চিম মুখী ধারা দামোদর রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদী প্রবাহের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভাগীরথীর দক্ষিণাভিমুখী সম্মিলিত ধারায় বয়ে গিয়ে গঙ্গা সাগরে পড়তো'।[২৩]

এই গঙ্গা (ভাগীরথী), সরস্বতী এবং যমুনা নদীর বিস্তীর্ণ অববাহিকাতেই ছিল বিদেশী বর্ণিত গঙ্গারিডি।

নির্দেশিকা

১। গঙ্গার কথা — বীরেন্দ্রনাথ সরকার।
২। সরস্বতা — অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।
৩। সরস্বতী — অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।
৪। গঙ্গার কথা — বীরেন্দ্রনাথ সরকার।
৫। Ancient India as described by Megasthenes and Arrian --J. W. McCrindle।
৬। হুগলী জেলার ইতিহাস -- সুধীরকুমার মিত্র।
৭। বাংলার সামাজিক ইতিহাস — ডঃ অতুল সুর।
৮। বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) —ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।
৯। বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।
১০। হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস বিধুভূষণ ভট্টাচার্য।
১১। 'Indological Studies Part IV Page 76 (India as known to the early Greeks) —Dr. B. C. Law
১২। Indological Studies Part III (Some Ancient sites of Bengal) —Dr. B. C. Law.
১৩। হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ় —অম্বিকাচরণ গুপ্ত।
১৪। Classical Accounts of India (Geography of strabo) P. 249. —Dr. R. C. Majumdar.
১৫। Classical Accounts of India (Pliny) P. 341 —Dr. R. C Majumdar.
১৬। Classical Accounts of India (Diodorus Siculus) P. 233. —Dr. R. C. Majumdar.
১৭। Classical Accounts of India. P. P. 461-473. —Dr. R. C. Majumdar.
১৮। বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) —ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।
১৯। প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা —পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত।
২০। বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) —ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।
২১। ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
২২। গঙ্গা যুগে যুগে (আনন্দবাজার পত্রিকা—গঙ্গা সম্বন্ধে ক্রোড়পত্র—২৭শে জুন, ১৯৮৭) —ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
২৩। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, (২য় খণ্ড) —বিনয় ঘোষ।

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার তালিকা

বাংলা এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষা

গুপ্ত, অম্বিকাচরণ—হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়।

গুহ, রজনীকান্ত—মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ (অনুবাদ)।

গোস্বামী, কুঞ্জগোবিন্দ—প্রাগৈতিহাসিক মোহন-জো-দাড়ো।

ঘোষ, ঈশানচন্দ্র—জাতক কাহিনী।

ঘোষ, বিনয়—পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম—৩য় খণ্ড)।

ঘোষ, শৈলেন্দ্রকুমার—গৌড় কাহিনী।

চক্রবর্ত্তী, উৎপল—বিলুপ্ত রাজধানী।

চক্রবর্ত্তী, রজনীকান্ত—গৌড়ের ইতিহাস।

চক্রবর্ত্তী, সুবোধ—রম্যাণি বীক্ষ্য (ভাগীরথী পর্ব)।

চট্টোপাধ্যায়, অমূল্যকুমার—প্রাচীন বাঙলা ও বাঙালীর পরিচয়।

চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র—দেবায়তন ও ভারত-সভ্যতা।

চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুনীতিকুমার—বাংলা ও বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা।

চন্দ, রমাপ্রসাদ—গৌড়রাজমালা।

চৌধুরী, ডঃ অশ্বিনী—রাঢ়ভূমির সংস্কৃতি-শিবি ও চেতরাজ্য-ধর্মপূজার উৎস।

চৌধুরী, দুলাল—বাংলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি।

জানা, যুধিষ্ঠির—বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস।

তর্করত্ন, পঞ্চানন—বায়ু পুরাণ, মৎস্য পুরাণ (অনুবাদ)।

দত্ত, বিশাখ—মুদ্রারাক্ষস।

দত্ত, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ—বাংলার ইতিহাস।

দাশ, দেবেশ—বৃহত্তর বাঙ্গালী।

দাশগুপ্ত, পরেশচন্দ্র—প্রাগৈতিহাসিক বাংলা।

—প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া।

দাশগুপ্ত, প্রেমময়—বিদেশীর চোখে দেখা ভারত (ফা-হিয়েন)।

—বিদেশীর চোখে দেখা ভারত (হিউ-এন-সাঙ)।

দাশমজুমদার, ধনঞ্জয়—বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাস (২য়খণ্ড)।

—বঙ্গের অনন্ত সামন্তচক্র ও ইসলাম রাষ্ট্রের ইতিহাস।

দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন—বাংলা ভাষার অভিধান (২য় খণ্ড)।

দাস, সুকুমার—উত্তর বঙ্গের ইতিহাস।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—ভারতকোষ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলকুমার—পৌরাণিকা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অসিতকুমার—বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত।

বন্দোপাধ্যায়, রাখালদাস—বাংলার ইতিহাস (প্রথম ভাগ)।

বসু, নগেন্দ্রনাথ—বর্ধমানের ইতিকথা (প্রাচীন ও আধুনিক)।
—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ খণ্ড)।
বসু, যোগেশচন্দ্র—মেদিনীপুরের ইতিহাস।
বিদ্যাভূষণ, অমূল্যচরণ—সরস্বতী।
বিদ্যারত্ন, কালীপ্রসন্ন—বিষ্ণুপুরাণ (অনুবাদ)।
ভট্টাচার্য, কপিল—বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা।
ভট্টাচার্য, তরুণদেব—বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর।
ভট্টাচার্য, ডঃ নরেন্দ্রনাথ—প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষ।
ভট্টাচার্য, বিধুভুষণ—হুগলী ও হাওড়া জেলার ইতিহাস।
ভট্টাচার্য, লালমোহন—সম্বন্ধ নির্ণয় (বিশেষ কাণ্ড)।
ভট্টাচার্য, সঞ্জয়—অজানা বঙ্গকে জানো।
ভৌমিক, ডঃ সুহৃদকুমার—বাঙ্গালীর জাতিতত্ত্ব ও কৃষিজীবি সম্প্রদায়।
মজুমদার, কমল—বাঙ্গালীর ইতিহাস।
—উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিহাস।
—দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত।
মজুমদার, ডঃ রমেশচন্দ্র—বাংলাদেশের ইতিহাস।
মিত্র, ডঃ অমলেন্দু—রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর।
মিত্র, গৌরীহর—বীরভূমের ইতিহাস।
মিত্র, সতীশচন্দ্র—যশোহর খুলনার ইতিহাস।
মিত্র, ডঃ সনৎকুমার—পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা।
মিত্র, সুধীরকুমার মিত্র বিদ্যাবিনোদ—হুগলী জেলার ইতিহাস।
মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার—নব বিজ্ঞান ভারতী (ভৌগোলিক)।
মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল—বাঙলা ও বাঙালী।
—বিশাল বাঙ্গালী।
মৈতে, দিলীপকুমার—চন্দ্রকেতু গড়।
রায়, ডঃ নীহাররঞ্জন—বাংলার নদনদী (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়)।
—বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)।
রায়চৌধুরী, প্রসিত—বঙ্গ সংস্কৃতির কথা।
লাহিড়ী, দুর্গাদাস—বাংলার সামাজিক ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)।
হালদার, গোপাল—বাংলাভাষা ও বাঙালীর সাহিত্য।
হালদার, নরোত্তম—গঙ্গারিডি—ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ।
শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ—প্রাচীন বাংলার গৌরব।
সমাজদার, সুভাষ—বাণিজ্যে বাঙ্গালী, একাল ও সেকাল।
সরকার, ডঃ দীনেশচন্দ্র—পালপূর্ব যুগের বংশানুচরিত।
—সামাজিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ।

সরকার, বীরেন্দ্রনাথ—গঙ্গার কথা।
সরকার, হিমাংশুভূষণ—হিন্দুযুগে দ্বীপময় ভারতের সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক পটভূমিকা।
সরস্বতী, সেবানন্দ—তমলুকের ইতিহাস।
সেন, ডঃ দীনেশচন্দ্র—বৃহৎ বঙ্গ (প্রথম খণ্ড)।
সেন, ডঃ সুকুমার - প্রাচীন বাঙলা ও বাঙালী।
—বঙ্গভূমিকা।
সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গ গোপাল—প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয়।
সেনশাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন—চিন্ময় বঙ্গ।
সুর, ডঃ অতুল - বাঙলা ও বাঙালী।
—বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়।
—বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন।
—বাঙলার সামাজিক ইতিহাস।
স্বামী, শংকরানন্দ—বঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার বিস্তার।

ইংরাজী

Bagchi, Kanan Gopal—The Ganges Delta.
Bagchi, Dr. P. C.—(Translation)—Pre Aryan and Pre Dravidian in India (S. Levi)
Banerjee, Rakhal Das—History of Orissa.
—Prehistoric India.
Bhattacharjee, Dr. Amitabha—Historical Geography of Ancient and Early Mediaeval Bengal.
Bose, S. C.—Geography of West Bengal.
Bysack, Dr. R. G.—The Early History of North Eastern India.
Chanda, Rama Prosad—Indo Aryan Races.
Cunningham, Alexander—The Ancient Geography of India.
Dacca University Publication—History of Bengal, Part II.
Datta, Dr. Bhupendra Nath—Studies in Indian Polity.
De, Dr. Harinath—Ibn Batuta's Account of Bengal. (Translation)
Dey, Nandalal—The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India.
Diwakar, R. R.—Bihar through the Ages.
Gokhale, B. H.—Asoke Maurya.
Hunter, W. W.—Orissa.
—Annals of Rural Bengal.
—Statistical Accounts of Bengal.

Law, Dr. B. C.—Historical Geography of Ancient India.
—Tribes in Ancient India.
—Indological Studies (Part I, III and IV).

McCrindle, J. W.—Ancient India as described in classical Literature.
—Ancient India as described by Megasthenes and Arrian.
—Ancient India as described by Ptolemy.
—Invasion of India by Alexander the great as described by Arrian, Quintus Curtius Rufus, Diodorus, Plutarch and Justin.

Majumdar, Dr. R. C.—Classical Accounts of India.
—History of Ancient Bengal.
—The History and culture of Indian People (Edited from Bharatiya Vidya Bhavan).

Majumdar, S. C.—Rivers of Bengal Delta.

Monahan, F. J.—The Early History of Bengal.

Mukherjee, Dr. Radha Kumud—Changing Face of Bengal.
—The Fundamental Unity of India.
—History of Indian Shipping.
—Indian Shipping.

Narasia, P. Lakshmi—The Encyclopaedia of Bengal.
—Behar and Orissa (compilation)

Paul, Promode Lal—The Early History of Bengal

Pargitar, F. E.—Ancient Historical Tradition.

Pillai, Kanak Sabhai—Tamil Eighteen Hundred Years Ago.

Raghavan, M. D.—India in Ceylonese History, Society and Culture.

Rapson, E. J.—Cambridge History of India Vol. I.

Roy, Dr. T. N.—The Ganges civilisations Introduction.

Rhys Davids, T. N.—Buddhist India.

Roy Chowdhury, Dr. H. C.—Political History of Ancient India.

Schoff, W. H.—Periplus of the Erythrean Sea. (Translation)

Sen, Benoy Chanda—Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal (Pre Muhammedan Epochs).

Shah, T. L.—Ancient India BC 900—AD 1000 Vol. I.

Sircar, Dr. D. C.—Geography of Ancient and Medieval India.

Smith, A. Vincent—The Early History of India.

Sur, Dr. A. K.—History and Culture of Bengal.

Wilhelm, Griger—Mahavamsa, or the great chronicle of Ceylon (Translation).